বাংলাপিডিএফ
৩৫-৩৬ দুই খণ্ড একত্রে
দস্যু বনহুর
সুন্দরবনের অন্তরালে
ঢাকায় দস্যু বনহুর
রোমেনা আফাজ
রনি

সুন্দরবনের অন্তরালে-৩৫
ঢাকায় দস্যু বনহুর-৩৬

দুই খণ্ড একত্রে

রোমেনা আফাজ

পরিবেশক

সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

বাদল ব্রাদার্স
৩৮/৪ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

বনহুর সখিনার হাত ধরে দ্রুত এগুতে থাকে। সোজা পথ ধরে না এগিয়ে ঝোপঝাড় আর জঙ্গল পথ ধরে এগোয় বনহুর সামনের দিকে। বনহুরের সঙ্গে চলতে সখিনার পা দু'খানা যেন মুচড়ে ভেঙ্গে যাচ্ছিলো, তবু এগুতে হবে—বাঁচতে হবে শয়তান মাতব্বর মালিকের কাছ থেকে। অবশ্য এ লোকটাও তার কাছে সম্পূর্ণ নতুন, বনহুরকে সে-তো পূর্বে কোনোদিন দেখেনি বা ওর সঙ্গে তেমন করে পরিচয়ও নেই। অপরিচিত একজনের সঙ্গে কোথায় চলেছে—তাকে নিয়ে কোথায়ই বা যাচ্ছে কে জানে!

ভিতরে ভিতরে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিলো সখিনা, যদিও আলম ভাই বলেছে তাকে রক্ষার জন্যই সে এখন ওকে নিয়ে চলেছে, কিন্তু একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারছে না সখিনা। দুর্বল মনটা তার দুশ্চিন্তায় ভরে উঠছে বার বার, চলতে চলতে হঠাৎ বলে উঠে—আমারে লইয়া কই যাইবা আলম ভাই?

বললো বনহুর—মাতব্বরের বাড়ি।

সেহানে আমারে নিয়া কি করবা? ভয়-বিহ্বল কণ্ঠে বললো সখিনা। সে বেশ হাঁপিয়ে পড়েছিলো।

বনহুর বললো—সখিনা, তুমি এখন মাতব্বরের বাড়ি থাকবে। কারণ এখন মাতব্বরের বাড়ি তোমার জন্য একমাত্র নিরাপদ স্থান।

আমি ঠিক বুঝতে পারত্যাছি না আলম বাই, যে লোক আমারে আজরাইলের মতন ছিনাইয়া লইবার চায় সে বাড়িতে থাকতি কও?

শোন সখিনা, মাতব্বর অত্যন্ত শয়তান, সুচতুর আর ভয়ঙ্কর লোক—গ্রামে যেখানেই তুমি লুকিয়ে থাকো না কেন, সে তোমাকে খুঁজে বের করবেই। তাছাড়া আমি বেশ বুঝে নিয়েছি, এ গ্রামের সবাই তাকে যমের মত ভয় করে। তুমি যার বাড়িতেই আশ্রয় নেবে সে নিজেই গিয়ে সংবাদ দেবে ঐ লম্পট বাদমাইশটাকে।

দেহো দেহি তুমি ঐ বাড়িতেই আমারে থাকতি কও? যেহানে বাঘের ভয় সেহানেই রাইত অয়, তাই অইছে আমার।

হাসলো বনহুর, ভয় পাওয়া সখিনার স্বাভাবিক। যে যমদূত তার উপর হামলা চালিয়েছিলো এখন কিনা সেই যমের বাড়িতেই তাকে আশ্রয় নিতে হবে—ব্যাপারটা সত্যি ভয়াতুর। সখিনাকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে চলতে হবে, হঠাৎ যদি এতোটুকু ভুল করে বসে তাহলেই তার সর্বনাশ হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বনহুর সখিনাকে বললো—দেখো সখিনা, তোমাকে মাতব্বরের বাড়ি আমার বোন হিসেবে থাকতে হবে। ওখানে তুমি আপাততঃ কাজ করবে এবং ঝি হিসেবেই থাকবে, বুঝলে? কিন্তু মনে রেখো, মাতব্বর আরফান যেন কোনো সময় তোমার মুখ দেখতে না পায়, কারণ তোমাকে সেখানে আত্মগোপন করে থাকতে হবে। সখিনা, আমি ফিরে না আসা অবধি তুমি তোমার বাপজানের ওখানেও যাবে না বা কাউকে জানতে দেবে না তুমি এ বাড়িতে আছো। আচ্ছা সখিনা, তুমি কি এ বাড়িতে কোনোদিন এসেছো?

না, আমি আই নাই। এতোদূর আইমু কেমন কইরা?

আচ্ছা, তোমাকে এ বাড়ির কেউ দেখেছে?

মাতব্বর সাহেব আর অছিমুদ্দিন দ্যাখছে, তাছাড়া আর কেউ আমারে দেহে নাই।

বাঃ তাহলে তো চিন্তাই নেই। মাতব্বর আর অছিমুদ্দিনের চোখ থেকে নিজকে লুকিয়ে রাখবে। পারবে তো সখিনা নিজকে গোপন রাখতে?

সখিনা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে, এ লোকটা কেন তাকে ঐ বাড়িতে রাখতে চায়। সব বাড়িতেই সে তার জন্য হানা দিয়ে অন্বেষণ করে ফিরবে, শুধু করবে না নিজের বাড়িতে, এবং সে কারণেই আলম তাকে এ বাড়িতে নিয়ে চলেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা আরফান মাতব্বরের বাড়ির অনতিদূরে এসে পৌঁছে যায়। গ্রামের যে প্রান্তে মাতব্বর আরফানের বাড়ি, ঠিক তার বিপরীত প্রান্তে তার কারবারের গুদাম। এখানে তার ব্যবসা চলে—নারকেলের ব্যবসা। খুলনা অঞ্চল থেকে নারকেল বোঝাই হয়ে তার ষ্টিমার ঢাকা যায়, সেখানে নারকেল বিক্রির অজুহাত দিয়ে অপেক্ষা করে বেশ কিছুদিন। অনেক লোক তার ষ্টিমারে আসা-যাওয়া করে, মাল চালান ব্যাপার নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে, আরফান মালিকের ষ্টিমারের মাল কোনোদিন ফুরোয় না—কিছুটা কমে যায় বটে।

একদিন দেখা যায় ষ্টিমার ফিরে চলেছে অথচ নারকেলের স্তূপ তেমনি রয়েছে, হয়তো বা বিক্রয় হয়েছে কিছুটা কিংবা হয়নি।

পৃথিবীতে সবাই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত, কেউ কারো দিকে ফিরে তাকাবার সময় নেয়। সদরঘাটেও তেমনি আরফান মালিকের ষ্টিমার বোঝাই নারকেল আসে, বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করে আবার ফিরে যায়। লোকে মনে করে নারকেলে পরতা পড়েনি তাই বিক্রি না করে আবার নিয়ে চলেছে, নতুন মালের সঙ্গে মিলিয়ে চালিয়ে নেবে।

অবশ্য এ কথাটাও বেশিক্ষণ কারো তলিয়ে ভারবার সময় নেই। হয়তো বা শমসের আলী তার বড় নারকেল বোঝাই নৌকায় বসে একটু ভাবতে চেষ্টা করেছে। বার বার ঐ মালিকের ষ্টিমারখানা নারকেল বোঝাই হয়ে আসে, আবার নারকেল সব বিক্রি না করেই ফিরে যায়.....কিন্তু এ নিয়ে গভীরভাবে মাথা ঘামাবার সময় নেই তার, নিজের ব্যবসা নিয়ে সে ব্যস্ত। শুধু শমসের আলীই নয়, মালিকের ষ্টিমার নিয়ে অনেকের মনেই প্রশ্ন জেগেছে, সবাই ভেবেছে কিন্তু বেশিক্ষণ এ নিয়ে চিন্তা করার সময় কারো নেই।

'মালিক' ষ্টিমার বড় কারবারী লোকের ব্যবসায়ী ষ্টিমার। আর সব যারা খুলনা অঞ্চল থেকে নারকেল ব্যবসায়ী আসে তারা বড় বড় নৌকা করেই মাল নিয়ে আসে, মাল বিক্রি শেষে ফিরে যায়।

আরফান ব্যবসায়ী ছাড়াও আরও দু'একজন ব্যবসায়ীর লঞ্চ বা ষ্টিমার আছে, এ সব ষ্টিমারেও নারকেল বা ডাব বোঝাই হয়ে আসে।

বনহুর আর সখিনা আরফানের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো, মুখোভাব করুণ বিষণ্ন, তৈলবিহীন রুক্ষচুল, ক'দিন দাড়ি-গোঁফ কাটেনি সে, কাজেই খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফে মুখ ভরে উঠেছে বনহুরের। চোখ দুটোতে অসহায় ব্যথাভরা চাহনি, ডাকলো সে—কেউ বাড়ি আছেন? শুনছেন, কেউ বাড়ি আছেন?

একটা লোক বেরিয়ে এলো, চাকর হবে বোধ হয়। বনহুর আর তার সঙ্গের মেয়েটাকে লক্ষ্য করে বললো—কি চাও? ভিক্ষা চাও নিকিন?

বনহুর করুণ চোখে তাকালো চাকরটার দিকে, হাত জুড়ে বললো—তোমাদের কাজের লোক লাগবে?

খেঁকিয়ে উঠলো চাকরটা—না না, আমাগো কাজের লোক লাগবো না। তোমরা যাও দেহি।

বনহুর পাশে ঘোমটায় ঢাকা সখিনার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে পুনরায় বলে—তোমাদের বিবি সাহেবকে বলো—যদি কাজের লোক নেন?

কইলাম তো লাগবে না, এবার যাও........

এমন সময় বেড়ার আড়াল থেকে শোনা যায় নারীর কণ্ঠ—লোকডা কি কয় রে ছলিম?

ছলিম এবার সুর নরম করে বলে—আম্মাজান, এই লোকডা মাইয়্যা মানুষ আনছে, রাখোন চায়।

মাইয়্যা মানুষ, কই দেহি? ভিতরে আইতে কও।

ছলিম এবার বললো—আইসো, মাইয়াড়া ভিতরে আইসো, আম্মাজান দেখবো।

বনহুর সখিনাকে লক্ষ্য করে বললো—বোন যাও। ভিতরে যাও।

সখিনা ঘোমটা আরও টেনে দিয়ে ভিতরে এগিয়ে গেলো।

মাতব্বর বৌ বললো— বাড়ি কনে তোমাগো?

সখিনা বললো—সামগাঁও।

অবশ্য এটাও বনহুরেরই শেখানো কথা, সামগাঁও এ গাঁয়ের পরের গাঁ, তাই সে এ গ্রামের নাম ওকে শিখিয়ে দিয়েছে।

সখিনার কথা শুনে বললো মাতব্বর গৃহিনী—সামগাঁও থেইক্যা আইছো কাম করতি লাইগ্যা?

হাঁ আম্মাজান।

ও মানুষ তোমাগো কে অয়?

সখিনা ঘোমটার আড়াল থেকে বলে—ও মানুষ আমাগো বাই হয়।

তোমাগো সোয়ামী নাই?

মাথা নিচু করে সখিনা, কোনো জবাব দেয় না।

অবশ্য পল্লীনারীদের এটা স্বভাব, বিয়ের কথা শুনলে লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে যায়। সখিনাও তাই কথাটা শুনে কুঁকড়ে গেলো কেঁচোর মত। মাথা নিচু করে দাঁড়ালো।

মাতব্বর বৌ বললো—বুঝছি বিয়া হয়নি তোমাগো, না? তা অমন যোয়ান অইছো বিয়া দ্যায়নি ক্যান?

ছলিম এবার বলে—বালো বিয়া আইলে তো দিবো। বালো বিয়া আহে নাই তাই.....আম্মাজান রাহিবেন না তাড়াই দিমু?

না, তাড়াই দেওয়ার কাম নাই। মানুষ তো কামের লেইগ্যা রাখতে লাগবো।

তা অইলে রাহেন।

মাতব্বর বৌ জিজ্ঞাসা করলো এবার—তোমাগো নাম কি?

সহিনা।

বালোই, সহিনা নামডা বালোই। আচ্ছা কও দেহি তোমাগো কত দেওন লাগবো?

বনহুর এতোক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলো। একটু হকচকিয়ে গেলো, এ কথাটা তো ওকে বলা হয়নি, কি বলতে কি বলে বসবে কে জানে। বনহুরই বলে উঠলো এখন যা হয় দেবেন। তারপর কাজ দেখে মাইনে বাড়িয়ে দেবেন আপনারা।

আচ্ছা তাই অইবো। আইসো সহিনা, অন্দর বাড়িতে আইসো এহন।

সখিনা বললো—বাইজান আবার আইবেন কবে?

বনহুর বললো—সময় হলেই আসবো, কোনো চিন্তা করো না সখিনা।

আচ্ছা।

মাতব্বর বৌ সখিনাকে নিয়ে অন্দর বাড়ির মধ্যে চলে যায়, বনহুর ফিরে যায় যে পথে এসেছিলো সেই পথে!

❑

জমাট অন্ধকারে বড় নৌকাখানা একেবারে মিশে গিয়েছে যেন। নৌকা বোঝাই গোলপাতা, নৌকার সম্মুখে দু'টো লোক লগি হাতে দাঁড়িয়ে, পিছনে হালে বসে একজন মাঝি। পিছনের মাঝিটা বিঁড়ি খাচ্ছিলো, তারই আলোটা অন্ধকারে পিট পিট করে জ্বলছিলো যেন।

সামনের লোক দুটো উদ্বিগ্নভাবে তাকিয়েছিলো সম্মুখে সীমাহীন অন্ধকারের দিকে, মাঝে মাঝে পায়ে আর উরুতে চাপড় মারছিলো ওরা, বোধ হয় মশাগুলো হুল বসিয়ে দিচ্ছিলো অলক্ষ্যে।

পিছন নৌকা থেকে হালের মাঝি বলে উঠে—কিরে, অতো ছট্‌ফট্ করতাছিস্ ক্যান?

আরে কইস না, মশার কামড়ে জানডা গ্যালো যে। সম্মুখে নৌকা থেকে জবাব দেয় একজন।

দ্বিতীয় জন বলে উঠে— এতোক্ষণ আইতেছে না ক্যান? মশা যে গাড়ার সব রক্ত শুইষা নিলো।

আরে লইতে দেও, লইতে দেও, মোটা টেহা পাইবাক্ষণ।

এমন সময় লণ্ঠন হাতে এগিয়ে আসছে কতকগুলো লোক দেখা যায়। শোনা যায় তাদের চাপা কণ্ঠস্বর।

মাঝিদের একজন বলে উঠে—ঐতো আইসা পড়ছে।

অন্য মাঝি বলে—যা হোক এবার তো বাঁচা যাইবো। স্রোতে নাও ভাসাইয়া বইসা রইমু মশা বেটা ক্যামনে কামড়ায় দেইখ্যা নিমু।

পেছন থেকে হালের মাঝি বলে—গান গাইবা না?

কও কি গান গান গাইমু, শেষে জানডা দিমু পুলিশের হাতে.......

ততক্ষণে এসে পড়েছে প্রায় লণ্ঠন-হাতে লোকগুলো। নৌকাখানার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো তারা। সম্মুখস্থ লোকটা মাতব্বর আরফান ঠিক যেন সাক্ষাৎ আজরাইল। তার পিছনে আরও কয়েকজন লোক, তাদের মাঝখানে আট-নয়টা বালক-বালিকা। সবাই কাঁদছে, তবে উচ্চৈস্বরে নয়, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে ওরা। একে নিদ্রা জাগরণে তদুপরি অবিরত ক্রন্দনে ছেলে-মেয়েগুলোর চোখগুলো লাল হয়ে উঠেছে।

এবার নৌকাখানা থেকে মাঝি তিনজন নেমে এলো। সালাম জানিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, সবাই বেশ তটস্থ হয়ে উঠেছে তাদের দেখেই বুঝা

গেলো। এতোক্ষণ মশার কামড় খেয়ে নানারকম কথার ফুলঝুরি আওড়াচ্ছিলো, এই মুহূর্তে সব থেমে গেছে। কণ্ঠ যেন রোধ হয়ে গেছে তাদের।

ধমক দিলো আরফান—কিরে, তোরা ঠাঁই দাঁড়াই রইবি, না মাল উঠাইবি?

আরফানের আর একজন অনুচর বলে উঠলো—ওরা আজ হুস্ হারাইছে মালিক, দেখতাছেন না কেমন টুব্ তাছে।

আরফান সম্মুখস্থ মাঝিটার কান ধরে মোচড় দিলো—কিরে টুব্তাছিস? হুস নাই মাল উঠান লাগবো?

উঠাইতাছি মালিক। কথাটা বলে প্রথম মাঝি একটা ছেলেকে কাঁধে উঠিয়ে নেয় তারপর নৌকায় উঠে যায়।

নৌকাখানা গোলপাতা বোঝাই মনে হলেও আসলে গোলপাতা বোঝাই নয়, নৌকার মাঝখানে মজবুত ধরনের ছৈ আছে। ছৈ এর উপরে সুন্দর করে গোলপাতা সাজিয়ে রাখা হয়েছে। হঠাৎ বাইরে থেকে কেউ টেরই পাবে না যে, ভিতরে ছৈ বা কিছু আছে।

নীচে থেকে সবগুলো ছেলে-মেয়েকে নৌকায় উঠিয়ে নেওয়া হলো, বসিয়ে দেওয়া হলো ছৈ-এর মধ্যে।

ধমক দিলো আরফান নৌকায় উঠে—পোলাপান তোরা কাঁদছোতো গলা টিপা নদীতে ফেলাই দিমু।

আরফান উল্লার যেমন চেহারা তার গলার স্বর ছিলো তেমনি। ছেলে-মেয়েগুলো যারা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলো তারা স্তব্ধ হয়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে। আরফানের অসাধ্য ছিলো না কিছু, নির্মম পাষন্ড ছিলো সে। ইচ্ছা করলে সে একটাকে গলা টিপে নদীবক্ষে ফেলে দিলেও তেমন কিছু তার যায় আসে না।

ছেলে-মেয়েগুলো মুহূর্তে কুঁকড়ে গেলো, একে এই রাতদুপুরে নিদ্রা থেকে জাগিয়ে তাদের আনা হয়েছে তদুপরি অন্ধকার নৌকায় ছৈ-এর মধ্যে যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিলো, সবাই এক কোণে কুন্ডলী পাকিয়ে বসে রইলো, ভয়ে কেউ টু'শব্দটি পর্যন্ত করছে না।

আরফান তার সঙ্গের লোকগুলোকে বললো—তোমরা যাওগা, আজ রাতই নতুন মাল আনবার লাইগা ঢাকা রওয়ানা দিবা, বুঝলা? হ, হোনো, নারুকুল যা ষ্টিমারে আছে তার উপর শ'পাচেক আরও উঠাই লইবা।

আচ্ছা মালিক, তাই আইবো।

যাও, এইবার বেশি মাল আনতে চেষ্টা করবা।

আচ্ছা।

আরফানের সঙ্গের লোকগুলো অন্ধকারে তলিয়ে যায়—ঠিক গর্তে যেমন করে লুকিয়ে পড়ে গুইসাপগুলো তেমনি। নৌকায় উঠে জেকে দাঁড়ায় এবার আরফান উল্লাহ, মাঝিদের লক্ষ্য করে বলে—ছৈ-এর দরজা গোলপাতায় ঠিক মতন ঢাইকা দে। দেহিস্ মানুষ য্যান টের না পায়।

মালিক সব ঠিক কইরা দিমু, কওন লাগবো না।

বেটারা না কইলে একটা কাম পারস্ না তা কয় কি না কওন লাগবো না। কথাগুলো মুখ ভেংচে কর্কশ গলায় বলে আরফান মাতব্বর।

এবার মাঝিরা কেউ কথা বলতে সাহস পায় না, কারণ আরফান শুধু মালিক নয় তার খুশির উপর নির্ভর করছে তাদের ভবিষ্যৎ। কাজেই সে যা বলে তাই তাদের মেনে চলতে হবে। একটু যদি এদিক-ওদিক হয়েছে তাহলেই সর্বনাশ—চাকরি তো যাবেই, প্রাণ নিয়েও টানা-টানি। সোজায় ছেড়ে দেওয়ার ব্যক্তি নয় আরফান, কারণ সে তার গোপন ব্যবসার খোঁজ জানিয়ে দেয় গিয়ে বাইরের লোকজনকে। তাই আরফানের কাছে যারা চাকরি করে তারা আজীবন কাজ করবে বলে পাকা খাতায় নাম-ঠিকানা সব লিখে দেয়, সে কারণেই পালাতে চাইলেও কেউ পালিয়ে বাঁচতে পারে না আরফানের কাছ থেকে।

মাঝিরা এবার নীরবে মালিকের কথামত কাজ করে যায়, গোলপাতাগুলো দিয়ে বেশ করে ছৈ-এর মুখ ঢেকে দেয় ভাল করে।

বলে একজন মাঝি—মালিক এহন নাও ছাড়ুম?

ছাড়বি না তো কি রাইত পোয়াবি এহানে? নাও ছাড়।

নৌকা চলতে শুরু করলো।

আরফান উল্লাহ দৈত্যরাজের মত ছৈ-এর সম্মুখে গোলপাতার উপরে বসে পড়লো।

জমাট অন্ধকারে নদী বেয়ে নৌকা এগুচ্ছে।

লগি ছেড়ে এবার দাঁড় টানতে শুরু করেছে মাঝিদ্বয়।

হাল ধরে বসে আছে ভোলানাথ মাঝি। সে বেশ চুপচাপ বসে আছে, কোনো কথা নেই তার মুখে। অন্ধকারে যেন জমে গেছে সে।

আরফান বললো—লয়ামিয়া ভার বুধা আইছো।

হ' মালিক। দাঁড় টানতে টানতে জবাব দিলো একজন।

ভোলানাথ বুঝি হালে?

হঁ।

সাবধানে নাও লইবা, বুঝলা?

হ' বুঝছি মালিক।

নৌকা চলেছে, শয়তান আরফান হয়তো মালের টাকার হিসাব করছে মনে মনে। এবার মাত্র ন'টা মাল পেয়েছে, আর অন্যান্য বার এরও বেশি মাল সে চালান দিতে পারে।

মাঝিদ্বয় হুম্ হুম শব্দ করে দাঁড় টানছিলো।

আরফান বললো—ব্যাটা তামাক সাজ দেহি একজন।

একজন বললো—বাতাস যে উল্টা বইছে মালিক, এহন নাও ছাইড়া দেওন যাইবো না। ভোলা দাদা, হাল ঠিক্ রাইখো।

আরফান অন্ধকারে বিড়ি ধরালো।

ছৈ-এর ভিতর থেকে তখনও ফুঁপিয়ে কাঁদার চাপা শব্দ বেরিয়ে আসছিলো।

আরফান ধমকে উঠলো আবার কে কাঁদতেছোস্? গলা টিইপা ফেলাই দিমু নাকি?

সঙ্গে সঙ্গে সব নীরব হলো, কাঁদার শব্দ থেমে গেলো চট্ করে।

নৌকা চলেছে অন্ধকারে, আরও দু'চারখানা নৌকা পাশ কেটে যাচ্ছে। কোনো কোনো নৌকা থেকে শোনা যাচ্ছে মাঝিদের গলার ভাটিয়ালী সুর—

আরে অ মাঝি বাই কোথা তুমি যাও
ঘাটে নৌকা ভিড়াইয়া তুমি মোরে নিয়া যাও

কে একজন আর এক নৌকা থেকে উচ্চকণ্ঠে বললো—কার নাও যায়?

আরফান চাপা স্বরে বললো—ভোলা কইয়া দেও ঝুলগাঁও এর নাও এডা।

পিছন নৌকা থেকে ভোলা উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলো—ঝুলান গাঁও এর নাও এডা।

কিসের নাও? পুনরায় প্রশ্ন হলো।

ভোলা বললো—গোলপাতার নাও। আর তোমাগো কিসের নাও? কই যাও তোমরা?

জবাব এলো—আমাগো খালি নাও। কাঠ আনবার যাইতাছি বাই।

আবার নীরব চারিদিক।

জমাট অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। শুধু দাঁড়ের ঝুপঝাপ শব্দ আর পানির ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ ছাড়া কিছু শোনা যায় না।

আরফান বিড়ি টানছে গোলপাতার স্তূপে ঠেস দিয়ে বসে। ছৈ-এর ভিতরে কোনো সাড়াশব্দ নেই, ছেলে-মেয়েগুলো বোধ হয় কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে, রাত তো কম হয়নি।

দূরে নদীর পাড় দেখা যায়, কিন্তু বুঝা যায় না কিছু। গাছ-গাছড়া নজরে পড়ে না, শুধু অসংখ্য আলোর ফুলঝুরি দেখা যায়। জোনাকির আলো সেগুলো।

অন্ধকার আকাশে তারার মালা।

এতোগুলো তারা আকাশে ফুটে থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীর অন্ধকার কিছুমাত্র লাঘব হচ্ছিলো না, অন্ধকার যেন আরও ঘনীভূত হয়ে আসছে।

প্রহরের পর প্রহর কেটে চলেছে, শুধু দাঁড় টানার কচ্ কচ্ শব্দ আর পানিতে ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিলো না।

বহুদূর এসে পড়েছে নৌকাখানা।

হঠাৎ দেখা যায় দূরে—অনেক দূরে একটা আলো দোলা খাচ্ছে।

আরফান বলে উঠে—ওরে ভোলানাথ?

কন?

আলো দেহেছিস্ না?

দেহেছি মালিক। জবাব এলো পিছন নাও থেকে।

বুধা আর লয়া তোরা দেখছোস্?

হ' দেখছি।

তা নাও ফিরা, আমোগো এই ঘাটে নামাই দিয়া তোরা যা। শোন্ লয়া, আমোগো অনেক কাম আছে, বাড়ি যাইয়া একবার দেইখ্যা নিমু সবুর আলীর মাইয়া সহিনারে।

লয়া বলে উঠে—সহিনা কি করছে আপনাগো মালিক?

কি করছে কস্ তুই? আমাগো মান-সম্মান সব নষ্ট কইর‍্যা দিছে। তোগোরে শোনা লাগবো না, তোরা যাগা। ভোলা, অ' ভোলো?

কন মালিক? পিছন থেকে শোনা যায় ভোলানাথের গলা।

শুনছোস্, এই যে সপলাঘাট, এহানে আমাগো নামন লাগবো।

আমি সব জানি মালিক, তাইতো অইদিকে নাও ফিরাই নিতাছি।

হ' তাই ল'।

অল্পক্ষণে ঘাটে নৌকা ভিড়ালো।

লণ্ঠনের আলো এখম সরে এলো ঘাটে, দেখা গেলো একটা হাড়-জিরজিরে কঙ্কালসার লোক লণ্ঠন হাতে নৌকাখানার পাশে এসে দাঁড়ালো—ঘাট চিনতে পারছেন মালিক?

আরফান অট্টহাসি হাসলো—তোরে রাখছি ক্যান? ঘাট চিনতে না পারলে তোর জান থাকবো?

মালিক, আমাগো কোনো দোষ নাই, আমি হরদিন ঘাটে দাঁড়াইয়্যা লণ্ঠন দোলাই, করে কহন আইয়া পড়েন......

বেশ কইর‍্যাছিস্ হবুল্লা, তোর মাইনা আর এক টেহা বাড়াই দিমু। আরফান নেমে পড়বার পূর্বে ভোলা আর লয়া এসে দাঁড়ায় তার সম্মুখে।

আরফান বলে—ভোলা, লয়া, তোরা তো জানোস, মালগুলা ঠিক্‌মত পৌঁছাই দিয়া টেহা গুইনা নিবি।

ভোলা বলে—কত নিতে অইবে মালিক?

সে কতা তোরে কইতে অইবে না, সব আমি বন্দবস্ত কইর‍্যা তবে মাল চালান দিছি। নে, তরা এবার নাও ছাড়। যে টুহুন ভয় আছিলো আমি সাথে আইলাম।

আচ্ছা মালিক। বললো ভোলানাথ!

আরফানের কথায় নৌকা আবার নদীবক্ষে ভাসলো। ঘাটে আর একখানা নৌকা ছিলো, আরফান নৌকাখানার দিকে এগুতে এগুতে বললো—হবুল্লা, জলদি মাঝিগো পাঠাই দেও, এহনই রওনা দিমু, রাত ভোর অইবার আগে.....

আর শোনা গেলো না, আরফানের মালবোঝাই নৌকাখানা তখন স্রোতের টানে অনেকখানি সরে এসেছে। ধীরে ধীরে হবুল্লার হাতের লণ্ঠনখানা মিটমিটে হয়ে আসছে।

ঝুপঝাপ শব্দ তুলে চলেছে নৌকাখানা!

কোথায় চলেছে কে জানে।

ভোলানাথ বলে—বুধা বাই, এবার হালে আইসো, আমি সামনে যাই।

একি কথা ভোলা বাই, তুমি দাঁড়ে আইবা?

হ' আমারে এবার......

লয়া বলে উঠে—আমি তা অইলে হালে যাই, তুমি আমার বদলা আইসো।

তাই অউক, আইসো লয়া বাই।

লয়া দাঁড়খানা নৌকার উপর তুলে রেখে ভোলার দিকে এগিয়ে যায়।

ভোলা এসে দাঁড় টানতে বসে।

ভোর হবার পূর্বেই তাদের সুন্দরবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হবে।

❑

আরফান উল্লাহ সমস্ত গ্রামে তন্ন তন্ন করে সন্ধান চালিয়েও খুঁজে পেলো না সবুর আলীর মেয়েকে, সবুর আলী নিজেও বলতে পারে না কোথায় গেছে তার মেয়ে সখিনা। বুড়ো কেঁদে-কেটে আরফানের হাত-পা ধরে অনেক অনুনয়-বিনয় করলো তবু রেহাই পেলো না সে শয়তান মাতব্বরের হাত থেকে, ধরে নিয়ে গেলো আরফান সবুর আলীকে তার গুদাম ঘরে। আদেশ দিলো সে অনুচরদের—ওর পিঠে চাবুক মাইরা চামড়া তুইল্যা লও, দেহি তাও মাইয়ার কথা কয় কিনা?

অনুচর একটা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে সপাং সপাং করে আঘাত করতে শুরু করলো।

হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো বুড়ো সবুর আলী—মারিস না, আমাগো মারিস না তোরা। মুই কিছুই জানি না।

বল্ রেটা সহিনা কই গ্যাছে? তারে কোথা রাইখ্যা আইসেছিস বল্? আরফান গর্জন করে উঠে।

খুব করে পিটানোর পর মজবুত দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে দিলো আরফান সবুর আলীকে তার নারকেল গুদামের মধ্যে।

তারপর বাড়ি এলো আরফান!

মাতব্বর গৃহিনী স্বামী সেবায় এগিয়ে এলো, ক্লান্ত ঘর্মাক্ত স্বামীকে হাত-পাখা দিয়ে স্বয়ং বাতাস করতে লাগলো।

বাড়ির ঝি-চাকর এরা সবাই খাবার আয়োজনে ব্যস্ত। আরফান খেতে বসলে সখিনা তার সম্মুখে খাবার রেখে গেলো। অবশ্য গৃহকর্ত্রীর আদেশেই তাকে এসব কাজ করতে হচ্ছে।

আরফান বললো—এ মাইয়্যাডা আবার কে?

গৃহিনী বললো—নতুন রাইখেছি, কাজ-কাম বালোই করে।

এতোগুলোন ঝি চাকর তাও তোমাগো অয় না? রাহো যত পারো রাহো, টাহা তো আর তোমাগো দেওন লাগবো না।

খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ে আরফান।

খেতে খেতে আরফান যখন কথাগুলো বলছিলো সব কানে গিয়েছিলো সখিনার—যাক, তবু তাকে চিনতে পারেনি শয়তানটা। মনে মনে আলম ভাইকে সে ধন্যবাদ জানায়, তার বুদ্ধির তারিফ না করে পারে না।

আরফানের পরিত্যক্ত এটো থালা-বাসন নিয়ে সখিনা যখন কূয়োতলায় যাচ্ছিলো হঠাৎ বৈঠকখানা থেকে শোনা গেলো আরফানের চাপা কণ্ঠস্বর, কাউকে যেন বলছে সে—বাদল, সব দেখছোস? সব জায়গা?

হাঁ, সব দেহেছি মালিক? সমস্ত গাঁও খান তন্ন তন্ন করে দেহেছি তাও সহিনার কোনো খোঁজ পাইলাম না।

এ গাঁওটা তো দেখা অইছে, পাশের গাঁও দেখছোস তোরা?

হ মালিক, পাশের গাঁও-ও আমরা খুঁইজ্যা খুঁইজ্যা হয়রান পেরেশান অইছি, কিন্তু কোনোহানে তারে পাইলাম না।

ঠিক্ বুড়ো সবুর আলীর চক্রান্ত, সে-ই মাইয়ারে কোথাও সরাইয়া রাখছে। বাদল, যতক্ষণ বুড়ো তার মাইয়ার খোঁজ না দেয় ততক্ষণ ওরে হাত-পা বাইন্দ্যা চাবুক মারবি, বুঝলি?

হ' বুঝছি মালিক।

আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলো সখিনা, মাতব্বর আরফান আর বাদলার কথা শুনে শিউরে উঠলো সে। সর্বনাশ, তাকে না পেয়ে শয়তানটা তার বাপের উপর অত্যাচার চালিয়েছে। কি করবে সে, কি করে বাপকে উদ্ধার করবে কোনো উপায় যে নেই তার। এক্ষুণি যদি সে বাপকে উদ্ধারের জন্য আত্মপ্রকাশ করে তাহলে রক্ষা নেই, শয়তান আরফান তার সর্বনাশ করবে।

মনঃকষ্ট সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই তার, ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষা করতে থাকে সখিনা, কবে ফিরে আসবে সেই মহৎ ব্যক্তিটি—যে তার আলম ভাই।

এখানে যখন সখিনা পিতার জন্য অস্থির চিত্ত নিয়ে আলম ভাই-এর প্রতীক্ষা করতে থাকে তখন আলম ভাই কোথায় কে জানে!

❑

মাল বোঝাই গোলপাতাওয়ালা নৌকাখানা সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। সূর্যের আলোতে চারিদিক ঝলমল করলেও এ বনের মধ্যে তেমন করে আলো প্রবেশ করতে সক্ষম হচ্ছিলো না। সুন্দরী গাছ আর গোলপাতার ঝাড়ের ঘন ছায়ায় বেশ অন্ধকার লাগছিলো।

একটা সরু নদী বেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে নৌকাখানা।

ভোলানাথ মাঝি হাল ধরে বসে বসে ঝিমুচ্ছে আর মাঝে মাঝে হাই তুলছে। লয়া আর বুধা মাঝির অবস্থাও সেইরকম। সারা রাত দাঁড় টেনে টেনে হাত ব্যথা হয়ে গেছে। যদিও ভোলা কিছুক্ষণ দাঁড় টেনেছিলো মাঝ নদীতে তবু লয়ার কম খাটুনি হয়নি।

বললো লয়া—কি কাম বাইছা নিছিলা, জানড়া গ্যালো। এতো মাল চালান আনি, পয়সা দেয় কয়ডা!

ভোলা বললো—তোরে তাও বালোই দ্যায় মালিক, আমাগো যে কত দেবেন কে জানে।

আজকাল মাল বেশি পাওন যায় না, তাইতো মালিক পয়সা কম দেয়। এর আগে যা মাল আসতো, মালিক পয়সাও দিতো বালো। কথাগুলো বললো বুধা মাঝি।

লয়া বললো—নে অতো কওন লাগবে না, দেহি আর ক'ক্ষ্যাপ দিমু তারপর গুদামের কাম নিমু। মালিক পয়সা যদি বেশি দেয় তাহলে এ কামই করুম। বিড়ি ধরা একডা দেহি?

বুধা পকেট থেকে বিড়ি বের করে অগ্নি সংযোগ করলো।

পরম নিশ্চিন্তে বিড়ি ধরিয়ে টানতে শুরু করলো ওরা।

ছৈ-এর মধ্যে তখন মৃদু মৃদু কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

জেগে উঠেছে বুঝি ছেলে-মেয়েগুলো।

ভোলানাথ বললো—বুধা, দ্যাখতো বাচ্চাগুলোন জাইগ্যা উঠছে নাকি?

বুধা উঠে গিয়ে গোলপাতা সরিয়ে উঁকি দেয়। দেখতে পায় কেউ কেউ জেগে উঠে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে। বললো সে—হ' বাচ্চাগুলো জাইগ্যা উঠছে।

ভোলা বললো—অগো খাইতে দে বুধা, বোধ হয় খিদা পাইছে।

মুখ ভেংচে বলে উঠে বুধা—আঃ কি আরামের কতা কইছো ভোলা বাই, মন্ডা মিঠাই দ্যাওন লাগবো।

ভোলানাথ বললো—তাহলে ওরা খাইবোনা? এতো বেলা অইছে?

লয়া বললো এবার—আজ নতুন কঁতা কইতেছো ভোলা বাই? লাও-এর মধ্যে কারে কবে খাইতে দেয়?

তা অইলে তোমরা যে খাইলা? আমি যে খাইলাম?

আমরা খাইমুনা তো নাও বাইমু ক্যামনে?

ভোলানাথ আর কোনো কথা বললো না, হাল ধরে চুপচাপ বসে রইলো।

নৌকা চলেছে।

ছৈ-এর মধ্যে কাঁদতে শুরু করেছে বাচ্চাগুলো।

ভোলার কেমন কষ্ট লাগছিলো, মায়া হচ্ছিলো তার মনে। বোধ হয় মনে পড়ছিলো বাড়ির কথা, তার ছেলের কথা। না জানি কেমন আছে তার বাচ্চাটা।

এখন যে নদী ধরে নৌকা এগুচ্ছিলো সে নদীটা বেশ ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেছে ভিতরের দিকে। দু'পাশের গোল-পাতার ঝাড় ঝুকে এসেছে নদীর উপর। বেল্‌চা কাঁটার ঝাড় আর সুন্দরী গাছের ডালগুলোও হামাগুড়ি দিয়ে পড়েছে যেন দু'ধারে।

সুন্দরবন তো আর সীমাবদ্ধ নয়, ধরতে গেলে সীমাহীন। চারিদিকে শুধু ঘন বন আর বন। অসংখ্য সুন্দরী গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। হাজার হাজার মাইল ধরে বনের পরিধি। সুন্দরবনের মাঝ দিয়ে অসংখ্য নদী প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এসব নদী কইর‍্যা নদী থেকেই শাখা বিস্তার করে ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত সুন্দরবনের মধ্যে।

এমনি একটি ছোট নদী ধরে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে নৌকাখানা। ক্রমান্বয়ে জঙ্গলটি যেন আরও ঘন মনে হচ্ছে। মাঝে মাঝে হরিণ আর হরিণী নদীতে পানি পান করতে এসে তাদের নৌকা দেখে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছিলো।

ভোলা অবাক হয়ে দেখছিলো এসব, এর পূর্বে সে সুন্দরবনে আসেনি কিনা। সুন্দরবনের মধ্যে যতদূর দৃষ্টি চলে যায় পরিষ্কার—বেশ সচ্ছ, কোথাও যেন একটি পাতা পর্যন্ত পড়েনি। ভালই লাগছে এখন ভোলার।

কিন্তু এখন যে সরু নদী ধরে তাদের নৌকাখানা চলেছে সে নদীর দু'পাশে ঘন ঝোপঝাড় আর জঙ্গল। কেমন যেন গুমোট ভাব চারিদিকে।

আপন মনে লয়া আর বুধা দাঁড় বাইছিলো।

ভোলা বসে আছে হাল ধরে।

বুধা বললো—এ জাগাডা বালো নয়, বাঘের ভয় আছে।

লয়া বললো—চুপচাপ নাও বাইয়া যা, কতা কইসনা কইলাম।

লয়ার কথা শেষ হতে না হতে হুম্ করে জঙ্গলের মধ্যে একটা আওয়াজ হলো, সমস্ত বনভূমি যেন কেঁপে উঠলো থর থর করে। বুধা আর লয়া দাঁড় ফেলে দু'জন দু'জনাকে জড়িয়ে ধরলো। শোনা গেলো বুধার গলা—

—বাঘ, বাঘ আইছে---

ভোলা সামনে তাকাতেই একটা বিরাট চিতাবাঘ গর্জন করে নৌকার দিকে এগিয়ে এলো।

মুহূর্তে ভোলা তার কাপড়ের ভিতর থেকে বের করে নিলো মস্তবড় সুতীক্ষ ধার ছোরাখানা, প্রস্তুত হয়ে উঠে দাঁড়ালো সে দ্রুতগতিতে।

সঙ্গে সঙ্গে চিতাবাঘটা লাফিয়ে পড়লো নৌকার উপর।

ভীষণভাবে আক্রমণ করলো বাঘটা ভোলাকে। ভোলা আর বাঘ মিলে শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ।

লয়া আর বুধা তখন সম্মুখ নৌকার পাটাতনে বসে এ ওকে জড়িয়ে ধরে থরথরিয়ে কাঁপছে। মাঝে মাঝে মুখ উঁচু করে বুধা দেখে নিচ্ছে বাঘের সঙ্গে ভোলার লড়াইটা।

নৌকাখানা দোল খাচ্ছে, এই বুঝি ডুববে এবার।

ছৈ-এর মধ্যে বাচ্চাগুলো এক সঙ্গে চিৎকার করে কাঁদা শুরু করে দিয়েছে—সে এক ভয়ঙ্কর অবস্থা।

সুন্দরবনের অভ্যন্তরে নেই কোন মানুষের চিহ্ন, কে এগিয়ে আসবে তাদের উদ্ধার করতে।

ভোলা মরিয়া হয়ে বাঘের সঙ্গে লড়াই করে চলেছে।

লয়া আর বুধা গড়াগড়ি খাচ্ছে নৌকার পাটাতনে।

গোলপাতায় ঢাকা ছৈ-এর মধ্যে ছেলে-মেয়েগুলোও লুটোপুটি খাচ্ছে। ভোলা তার সুতীক্ষ্ণ ছোরাখানা দিয়ে বাঘটাকে কাবু করার চেষ্টা করছে।

ভীষণ চিতাবাঘ, অসম্ভব তার শক্তি, সহজে কাবু করা কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না ভোলানাথের পক্ষে।

বাঘের নখের আঁচড়ে ভোলার শরীরের কয়েক জায়গায় ক্ষত হয়ে যায়, দরদর করে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। তবু ভোলা কিছুতেই ক্ষান্ত হচ্ছে না।

হঠাৎ বাঘটা আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লো নৌকার উপরে। ভোলা তখন হাঁপাচ্ছে ভীষণভাবে। দেহের কয়েক জায়গা থেকে রক্ত পড়ছে রীতিমত।

বাঘটা লুটিয়ে পড়তেই নৌকার দোলা থেমে এলো ধীরে ধীরে। লয়া আর বুধা এবার পাটাতন থেকে উঠে উঁকি দিলো, মাথা উঁচু করে দেখতে লাগলো বাঘটা গেলো কোথায়।

ভোলার রক্তাক্ত দেহটার দিকে তাকিয়ে আর্তনাদ করে উঠলো বুধা, নৌকার পাশ দিয়ে এগিয়ে জড়িয়ে ধরলো—হায় হায়, একি অইছে তোমার ভোলা বাই?

হঠাৎ দৃষ্টি গেলো নৌকার উপরে পড়ে থাকা চিতাবাঘটার উপরে, আনন্দে চিৎকার করে উঠলো—লয়া বাই, দ্যাহ-দ্যাহ, ভোলা বাই বাঘডা মাইর‍্যা ফ্যালাইছে। বাঘডা মাইর‍্যা ফ্যালাইছে।

ধড়ফড় করে ছুটে এলো লয়া—কও কি? কও কি? ভোলা বাই বাঘডা মাইর‍্যা ফ্যালাইছে?

হ' দেইখ্যা যাও।

লয়া গিয়ে অবাক হয়ে দেখলো, বিরাট চিতাবাঘটা কাৎ হয়ে পড়ে আছে, সুতীক্ষ্ণধার একখানা ছোরা ঠিক বুকের মাঝখানে বিদ্ধ হয়ে আছে তার। চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে বাঘটা শেষবারের মত।

লয়া তাকালো ভোলার দিকে, দু'চোখে তার অফুরন্ত বিস্ময়। বাঘটার দিকে একবার তাকিয়ে ভোলাকে জাপটে ধরলো—ভোলা বাই, তোমাগো গায়ে এতো শক্তি?

তাড়াতাড়ি গামছাটা ছিঁড়ে পানিতে ভিজিয়ে ভোলানাথের দেহের ক্ষতগুলো বেঁধে দিলো ওরা।

আবার নৌকা চলছে।

বাঘটা ওরা ফেলে দিলো না, লয়া ও বুধার ইচ্ছা—মালিককে দেখিয়ে ভোলা ভাইকে কিছু বখশীস্ নিয়ে দেবে। অবশ্য উদ্দেশ্য আছে ভোলা ভাই যদি মোটা বখশীস্ পায় তাহলে কিছুটা আসতো তাদের হতেও।

ভোলার দেহের ক্ষত তেমন গভীর বা মারাত্মক ছিলো না। তাই সে সামলে নিলো কিছুক্ষণের মধ্যেই। আবার সে হাল ধরে বসলো।

এবার নৌকাখানা বেশ স্রোতের টানে ভেসে চলেছে। দু'পাশের ঘন ঝোপঝাড় আরও যেন ঘন আর ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে। সুন্দরবনে এমন অসুন্দর স্থান আছে ভাবতে পারা যায় না।

এক জায়গায় এসে নৌকা থেমে পড়লো।

লয়া বললো—আইয়া পড়ছি, নেও নাও বাঁধো।

নৌকা বেঁধে লয়া পকেট থেকে একটা হুইসেল বের করে ফুঁ দিলো খুব জোরে। একবার—দু'বার তিন বার।

সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরবনের অভ্যন্তর থেকে ঠিক ঐ রকম হুইসেলের শব্দ ভেসে এলো পরপর তিন বার।

কিছুক্ষণের মধ্যেই চারজন বলিষ্ঠ লোক সরু সরু শিকল আর দড়ি হাতে বেরিয়ে এলো গহন বনের মধ্য থেকে। এক একজনের চেহারা যেন এক একটা সাক্ষাৎ শয়তান। নৌকার নিকটবর্তী হতেই বাঘটার উপর নজর পড়লো তাদের, সঙ্গে সঙ্গে ভোলার রক্তমাখা দেহটার দিকে দৃষ্টি ফেলেই আঁতকে উঠলো। কিছুক্ষণ কেটে গেলো ওদের তাল সামলাতে। সব শুনে অবাক হলো ওরা, ভোলানাথকে ধন্যবাদ জানাতে লাগালো।

এবার ছেলেমেয়েগুলোকে মজবুত করে হাত বেঁধে নামিয়ে নিলো নৌকা থেকে, তারপর গরু-ছাগলের মত হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চললো।

বনের মধ্য দিয়ে সরু পায়ে চলা একটা পথ।

পথটা ক্রমান্বয়ে এগিয়ে গেছে গভীর জঙ্গলের মধ্যে।

বুধা নৌকায় রইলো, লয়া আর ভোলানাথ চললো ওদের সঙ্গে সঙ্গে।

বেশ কিছুটা চলার পর দেখা গেলো একটা তাঁবু খাটানো রয়েছে।

চারপাশে গাঢ় বন, তাঁবুটা বনের আড়ালে যেন ঢাকা পড়ে গেছে একেবারে খুব নিকটে না গেলে দেখা যায় না তাঁবুটা। তাবুর আশে পাশে সুন্দরী কাঠের স্তূপ।

লোক চারজন আর ভোলানাথ ও লয়া মিয়া ছেলে-মেয়েগুলোসহ তাঁবুর কাছাকাছি এসে পড়লো। তাঁবুর সম্মুখে কয়েকজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছে দেখা গেলো। আর দু'জন মাড়োয়ারী বাবুও আছে তাদের মধ্যে।

ছেলে-মেয়েগুলোসহ এরা পৌঁছতেই সবাই তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করলো। আরও কয়েকটা ছেলেমেয়েকে তাঁবুর মধ্যে রাখা হয়েছে। এই বাচ্চাদের তাঁবুর মধ্যে নিয়ে হাতের বাঁধন খুলে দেওয়া হলো। বাচ্চারা সাবই কাঁদছে, তবে জোরে বা চিৎকার করে নয়। কে একজনের চোখমুখ কেঁদে কেঁদে রাঙা হয়ে উঠেছে। ক্ষুধায় পিপাসায় চোখ বসে গেছে এক একজনের। ঠোঁটগুলো শুকিয়ে উঠেছে চটচটে হয়ে। কারো বা গালে চাপড়ের দাগ, কারো বা গলায় আংগুলের ছাপ। হয়তো বা গলা টিপে হত্যা করার ভয় দেখিয়ে ক্ষান্ত করার চেষ্টা করা হয়েছিলো।

আরও আশ্চর্য, তাঁবুর মধ্যে যে ছেলে-মেয়েগুলোকে বসিয়ে রাখা হয়েছে তাদের কারো এক চোখ অন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, কারো হাতখানা মুচড়ে

ভেঙ্গে পিছন দিকে বেঁধে রাখা হয়েছে। কারো বা একখানা পা কেটে ফেলে দেওয়া হয়েছে। যার চোখ অন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তার চোখ দিয়ে তখনও রক্ত আর পুঁজ গড়িয়ে পড়ছে, ব্যথায় ছেলেটা একেবারে শুকিয়ে গেছে— সেকি মর্মান্তিক নিদারুণ দৃশ্য। সুন্দরবনের অন্তরালেও এমন এক জঘন্য ব্যবসা চলেছে কে তার সন্ধান জানে। কাঠের ব্যবসার নাম করে এরা সুন্দরবন সরকারের কাছে পেয়েছে সুন্দরবনে প্রবেশের ছাড়পত্র।

লয়া আর ভোলা ছেলে-মেয়েগুলোসহ তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করতেই একজন সাহেবী পোশাক পরা লোক এগিয়ে এলো, তারপর এক এক জনের মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো।

ভোলানাথ আর লয়া দাঁড়িয়ে রইলো একপাশে।

ছেলে-মেয়েগুলোকে পরীক্ষা করা শেষ করে সাহেবটা বসলো গিয়ে চেয়ারে। আরও কয়েজন বসেছিলো এক একটা চেয়ারে, সাহেব তাদের সঙ্গে কি যেন আলাপ করতে লাগলো।

ভোলা আর লয়াকে বিশ্রাম করার জন্য তাঁবুর বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো।

ওরা এবার কিছু পাউরুটী আর চিনি এনে দিলো ভোলা আর লয়ার সম্মুখে।

ক্ষুধা পেয়েছিলো, গোগ্রাসে পাউরুটী আর চিনি গিলতে শুরু করলো ওরা দু'জনা।

তাঁবুর মধ্যে ছেলে-মেয়েগুলোকে কি খেতে দিলো বুঝা গেলো না, হয়তো শুকনো পাউরুটীই দেওয়া হয়েছে তাদের।

গোটা রাত জাগরণে লয়া আর ভোলার চোখ মুদে আসছিলো, খাওয়া-দাওয়া সেরে তাঁবুর বাইরে একটু ফাঁকা জায়গা দেখে সেইখানে শুয়ে পড়লো গামছা বিছিয়ে।

ঘুম ভাঙলো যখন তখন বেলা প্রায় গড়িয়ে গেছে।

ভোলা আর লয়ার খাবার ডাক পড়লো।

তাঁবুর বাইরেই এক জায়গায় পাক হচ্ছিলো। ভোলা আর লয়া সেখানে এসে খেতে বসলো, দেখলো আরও কতকগুলো লোক খেতে বসেছে সার হয়ে। কিন্তু সেখানে ছেলে-মেয়েগুলো নেই। সাহেব বাবু গুলোও বোধ হয় ভিতরে বসেছে।

মিথ্যা নয়, তাঁবুর মধ্যে বসেছে মালিকের দল আর একপাশে মাটিতে বসে খাচ্ছে বালক-বালিকার দল।

বেলা গড়িয়ে এসেছিলো, খাওয়া শেষ করে তাঁবুর মধ্যে পুনরায় ডাকা হলো ভোলানাথ আর লয়া মিয়াকে।

ভোলা আর লয়া তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করতেই দেখলো কয়েকটা ছেলে-মেয়েকে হাত বেঁধে সার করে রাখা হয়েছে। একজন স্যুট পরা লোক ছেলে-মেয়েগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে দর কষাকষি করছে। হাত ভাঙ্গা অন্ধ আর খোঁড়া ছেলেগুলো আছে সে দলের মধ্যে। নতুন যেগুলো নিয়ে আসা হলো সেগুলো এখন মওজুত রইলো পরের মহাজনের জন্য।

কারণ তাদের কারো হাত ভোঙ্গে, পা খোঁড়া করে, চোখ অন্ধ করে ব্যবসায় উপযোগী করে তোলা হবে। অবশ্য যে ছেলে-মেয়েগুলো বেশি সুন্দর তাদের এ সব করা হয় না, তাদের কাউকে ঘেটুদলে, কাউকে বা যাত্রাদলের মালিক ক্রয় করে নিয়ে যায়। বড় বড় নাচিয়েরা নিয়ে যায় মেয়েগুলোকে, ভবিষ্যতে এরা নাচনেওয়ালী বা বাঈজী হবে। দেশ হতে দেশান্তরে চলে যায় এসব হারানো ছেলে-মেয়েগুলো। কেউ সন্ধান জানে না, কোথায় গেলো আর কোথায়ই বা যায় তারা। পত্রিকায় হারানো বিজ্ঞপ্তি, রেডিওতে হারানো সংবাদ প্রচার ছাড়া কেউ কোনো দিন খুঁজে পায় না এইসব ছেলে-মেয়েদের। থানা পুলিশে জানিয়েও কোনো সমাধান হয় না ছেলেধরার। কি ভয়ঙ্কর নির্মম জঘন্য এই ছেলে-হারানো ব্যাপারটা।

দেশের সবচেয়ে জঘন্য আর কুৎসিত ব্যাপার হলো ছেলে-হারানো ব্যাপার। যারা কালের ভবিষ্যৎ, যাদের উপর নির্ভর করছে আগামী দিনের মঙ্গল সেই সব অমূল্য সম্পদ শিশুদের নিয়ে চলেছে ভয়ঙ্কর নারকীয় এক ব্যবসা।

প্রতিদিন কত শত শত সন্তানকে পিতামাতার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, গোপনে ফুসলিয়ে নানাভাবে হরণ করা হচ্ছে এইসব অসহায় অবুঝ শিশুদের। কি ভয়ঙ্কর কি সাংঘাতিক ব্যাপার। কিন্তু আজও এই ছেলেধরা ব্যাপার নিয়ে কেউ তেমন করে মাথা ঘামায় না, তেমন করে ভাববার সময়ও যেন নেই কারো। অথচ দেশ ও সমাজের সবচেয়ে বড় আর নৃশংস কান্ড এই ছেলে হারানো।

সুন্দরবনের অভ্যন্তরেও চলেছে এই কুৎসিত ব্যবসা।

ভোলা আর লয়ার ফিরে যাওয়া আজ হলো না, রয়ে গেলো সেদিনের মত ছেলেধরার তাঁবুতে। পরদিন টাকা-পয়সা নিয়ে রওয়ানা দেবে তারা গোলপাতা বোঝাই নৌকাযোগে।

তাঁবুর মধ্যে একপাশে শুয়ে আছে ওরা, নাক ডাকছে ভোলা আর লয়া, নৌকা ঝোপের মধ্যে গুঁজে রেখে বুধাও এসেছে। নৌকায় রাত কাটানোর মত সাহস হয়নি তার। সুন্দরবন বাঘ-ভল্লুকের রাজ্য ভয় পাবারই কথা।

ঘুমিয়েছিলো ভোলানাথ হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলো তার। একটা চাপা করুণ আর্তনাদ শোনা গেলো তাঁবুর মধ্যে। চাদর সরিয়ে উঁকি দিলো

ভোলানাথ—যে দৃশ্য দেখলো সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠলো সে কি ভয়ঙ্কর কান্ড! একটা বালককে হাত-পা পিছমোড়া করে বেঁধে মাটিতে শুইয়ে দু'জন বলিষ্ঠ লোক চেপে ধরে আছে আর একজন ভদ্র লোকের মত চেহারা লোকটি ছেলেটার চোখে অস্ত্রোপচার করে চলেছে। লন্ঠনের আলোতে ভোলানাথ দেখলো, লোকটা একখানা সুতীক্ষ্ণ ধার ছুরি দিয়ে বালকটার একটা চোখ তুলে নিলো।

ছেলেটা যন্ত্রণায় তীব্র আর্তনাদ করছে কিন্তু মুখ মজবুত কাপড়ে বাঁধা থাকায় আর্তনাদটা ঠিক চাপা গোঙ্গানির মত শোনাচ্ছে। ছেলেটার চোখ দিয়ে তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে গড় গড় করে। কি সাংঘাতিক দৃশ্য! এক একটা করে দুটো চোখই উপড়ে ফেলা হলো।

ভোলানাথ দু'হাতে চোখ ঢেকে ফেললো, মুখটা বিকৃত হয়ে উঠলো তার।

ছেলেটার চোখে এবার ব্যান্ডেজ বেঁধে দেওয়া হলো, তারপর খুলে দিলো ওর হাত ও পায়ের বাঁধন। এবার ছেলেটাকে শুইয়ে দিলো তাঁবুর মেঝেতে একটা খেজুর পাতার চাটাই-এর উপরে।

তারপর আর একটি ছেলেকে নিয়ে আসা হলো ভদ্রলোকটার পাশে।

আর একজন সাহেব, বাবু মানে স্যুট-পরা ভুড়ি-মোটা লোক যে এখানে ছেলেধরা দলের মালিক, সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিচ্ছিলো, সে বললো—ডাক্তার এর চোখ অপারেশন না করে একটা হাতের আংগুল অপারেশন করে নিন, আর দু'টো কান।

হেসে উঠলো ডাক্তার—বাঃ চমৎকার নতুন ধরনের মাল তৈরি হবে তাহলে।

হাঁ, আমার ইচ্ছা এখন থেকে বিভিন্ন ধরনের বিকৃত মাল আমদানী করবো আমি।

পরপর চললো এমনি কয়েকটা অপারেশন।

ভোলানাথ সব দেখলো, কিছু বলবার উপায় নেই তার। বললে ওরা শুনবেই বা কেন। চুপচাপ শুয়েই রইলো সে।

রাত শেষ প্রহর। ভোলা তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো, যদিও বাঘের আঁচড়ে তার দেহের কতকগুলো জায়গায় বেশ ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিলো তবু সে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। সে লক্ষ্য করেছিলো, ওদিকে ঝোপের মধ্যে নদীবক্ষে একটা ছোট্ট মোটর-বোট রাখা হয়েছে। যদিও ভোলার ভয় হচ্ছিলো, না জানি কোন মুহূর্তে বাঘ ভল্লুক আচমকা তাকে আক্রমণ করে বসবে।

দুঃসাহসী ভোলানাথ মোটর-বোটখানায় চেপে বসলো। তারপর বেরিয়ে এলো ঝোপের মধ্যে হতে মাঝ নদীতে। কিছুদূর ধীরে চালিয়ে নিয়ে স্পীড বাড়িয়ে দিলো, ঠিক ঐ মুহূর্তে একটা বিরাট মোটা রশি হঠাৎ করে জড়িয়ে ধরলো তার দেহটা। চারিদিক অন্ধকার হলেও ভোলনাথ বুঝতে পারলো, তার দেহে কোনো রশি বা দড়ি জড়িয়ে যায়নি, তার দেহে একটা হিমশীতল বরফের মত ঠান্ডা কিছু জড়িয়ে গেছে; সেটা অন্য কিছু নয়—সাপ।

ভোলানাথ বুকে সাহস সঞ্চয় করে নিলো তার কাপড়ের তলায় ছিলো সেই ছুরিখানা যে ছুরিখানা দিয়ে সে বাঘটাকে হত্যা করেছিলো। ভোলা ছুরিখানা বের করে সাপটার দেহে সজোরে বসিয়ে দিলো, পর পর কয়েকবার। আশ্চর্য সাপটা সরাৎ করে তার দেহ থেকে লাফিয়ে পড়লো পানির মধ্যে।

ভোলা মুক্তিলাভ করলো, বুঝতে পারলো মোটর বোটখানা যখন ঝোপের মধ্যে রাখা হয়েছিলো তখন ঐ সর্পরাজ আশ্রয় নিয়েছিলো বোটখানার ভিতরে। তারপর বোটখানা যখন চলতে শুরু করেছিলো সেই মুহূর্তে হটাৎ জড়িয়ে ধরেছিলো তার দেহটাকে।

যা হোক, মস্ত বাঁচা বেঁচে গেলো ভোলানাথ, পালানো তার আর হলো না। ওদিকে পূর্ব আকাশ ফর্সা হয়ে আসছে ক্রমান্বয়ে, ভোলা দ্রুত মোটর-বোটখানা ধারে ভিড়িয়ে নিয়ে পুনরায় ফিরে গেলো তাঁবুতে। আলগোছে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লো চাদর মুড়ি দিয়ে।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে ভোলানাথ তার খেয়াল নেই। এক সময় ঘুম ভেঙ্গে গেলো কিন্তু শরীরটা একান্ত ব্যথা বোধ হওয়ায় শুইয়ে রইলো সে।

তাঁবুর মধ্যে তখন সবাই জেগে উঠেছে।

ভোলানাথের কানে গেলে—ডাক্তার, ছেলেগুলোকে ঘুমের ঔষধ খাইয়ে দিয়েছেন তো?

হাঁ দিয়েছি না হলে এতোক্ষণ তাঁবু মাথায় তুলতো।

আমাদের ক'দিন এখানে অপেক্ষা করতে হবে?

অন্ততঃপক্ষে এক সপ্তাহ, না হলে ওদের চোখের ঘা শুকাবে না। দু'টোর পায়ে আর হাতে অপারেশন হয়েছে, সেগুলোও সারতে কয়েক দিন লাগবে।

কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে হঠাৎ যদি ফরেষ্ট অফিসার এসে পড়ে? কিংবা আর কোনো সাহেব---

এতোদূর তারা আসবে না, তাছাড়া এসেও যদি পড়ে মুখ বন্ধ করতে কতক্ষণ। টাকা—টাকার কাছে সব মুখ বন্ধ সাহেব, সব মুখ বন্ধ---হাঃ হাঃ হাঃ ----সবাই জানে, আমরা কাঠের ব্যবসা করি---

তুমি ঠিক বলেছো ডাক্তার, টাকার কাছে সব চুপ হয়ে যায়। যেমন পুলিশের মুখ বন্ধ করে দিয়েছি আমরা। সেবার ধরা পড়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু বড় সাহেব জানবার আগেই ছোটখাট মুখ বন্ধ করে দেওয়ায় বড়দের কানে আর যায়নি, তাই বেঁচে গেলাম।

আমাদের কোনো চিন্তা নেই তেমন, কারণ সিপাই পুলিশগুলো তো আমাদের পয়সায় বেঁচে আছে। তবু সাবধানে থাকতে হয় এই যা। হাঁ এবার মালবাহী ষ্টিমারে শুধু থাকবে সুন্দরী কাঠ আর তলার চোরা ক্যাবিনে থাকবে আসল মাল, হঠাৎ যেন ধরা পড়ার ভয় না থাকে।

❑

পরপর কতদিন গত হয়ে চললো হরি মালিকের জন্য ঘাবড়ে উঠলো একেবারে। সব সময় মনটা অস্থির থাকে, না জানি কোথায় গেলো কি হলো তার।

হরি তো ঢাকা শহরের প্রায় পথঘাট সব চিনে নিয়েছে, প্রায়ই সে স্কুটার ধরে চলে আসে সদরঘাটে। নিপুণ দৃষ্টি মেলে লক্ষ্য করে প্রতিটি ষ্টিমার লঞ্চ আর নৌকা। সমস্ত দিন ঘাটে দাঁড়িয়ে দেখে ফিরে যায় সন্ধ্যায় হোটেলে।

স্কুটার থেকে নেমে অবশ পা দু'খানা টেনে প্রবেশ করে ভিতরে। হোটেলের সম্মুখস্থ জাতীয় পতাকাগুলো পতপত করে তার দিকে তাকিয়ে যেন বিদ্রূপের হাসি হাসে।

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় রফিকের ডাকে—কিরে হরি, সাহেব এলো?

কণ্ঠ যেন শুকিয়ে গেছে, মাথা নেড়ে জানায় —না আসেনি।

এগিয়ে আসে রফিক—আজ ক'দিন হলো গেছে আজও ফিরে এলো না, কোনো বিপদ-আপদ ঘটেনি তো?

শিউরে উঠে হরি, অসহায় ফ্যাল ফ্যাল চোখে তাকায়, কোনো জবাব দিতে পারলো না সে, হয়তো বা চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসছিলো তাই তাড়াতাড়ি রফিকের দৃষ্টি এড়িয়ে উঠে গেলো উপরে।

পরদিন আবার হরি স্কুটার ধরে চলে এলো সদরঘাটে বাটা জুতোর দোকানের সম্মুখে, নেমে এগুতে লাগলো বেডকভার আর পঞ্চের স্যাণ্ডেলের দোকানগুলোর পাশ কটিয়ে, একেবারে সোজা ঘাটে এসে হাজির হলো। সদরঘাটে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো, আজ মনটা যেন বেশি অস্থির লাগছে হরির। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে মন তার চাইছে না।

ওয়াইজ ঘাটের দিকে এগুতে লাগলো হরি, হঠাৎ তার দৃষ্টি চলে গেলো একটা ষ্টিমার তখন ঘাটে ভিড়ছে কেবলমাত্র। হরির চোখকে ফাঁকি দেওয়া

কারো সাধ্য নয়, চমকে উঠলো—এইতো সেই ষ্টিমার যদিও ষ্টিমারের গায়ে নামটা সে পড়তে পারলো না তবু সে চিনে নিলো সহজে! এই সেই ষ্টিমার যে ষ্টিমারে নিরুদ্দেশ হয়েছে তার মনিব বনহুর।

হরি মনোযোগ সহকারে দেখলো, ষ্টিমার বোঝাই শুকনো নারকেল রয়েছে, আস্তে আস্তে ভিড়ছে ষ্টিমারখানা ওয়াইজ ঘাটে। হরির মন আশায় -আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। নিশ্চয়ই সে ফিরে এসেছে। ষ্টিমার ঘাটে ভিড়লেই নেমে পড়বে।

অদূরে দাঁড়িয়ে হা করে তাকিয়ে রইলো হরি ষ্টিমার খানার দিকে।

ষ্টিমার ঘাটে লেগে গেছে।

কিন্তু কই সে তো ষ্টিমার থেকে নেমে এলো না।

এক মিনিট দু'মিনিট করে ঘন্টা কেটে গেলো—কয়েকজন নেমে পড়লো—কারো বা হাতে বাজারের থলে কারো হাতে তেলের শিশি—সবাই সওদা করতে নামছে।

একটা দাড়িওয়ালা খাকি পোশাক-পরা বেশ বলিষ্ঠ লম্বা-চওড়া চেহারার লোক সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো নীচে, সমস্ত শরীরে তেল কালির ছাপ।

হরি এবার খুশি হলো, তার মনিব ছাড়া এ লোকটা কেউ নয়। পিছু নিলো হরি লোকটার।

লোকটা ঘাটের অদূরে একটা পান-বিড়ির দোকানে দাঁড়িয়ে এক খিলি পান কিনে গালে পুরলো তারপর এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলো।

হরি একটু দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছে লোকটাকে।

লোকটা এবার কতকগুলো ফল মূলের দোকানের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো কিছু পাকা কলা কিনে নিলো সে।

পয়সা মিটিয়ে এগুতে লাগলো সম্মুখে।

হরি ভেবেছিলো ফল কিনে লোকটা ফিরে আসবে ষ্টিমারে কিন্তু সে এগুতে লাগলো সদরঘাট ছেড়ে সম্মুখে। হরির সন্দেহ আরও দৃঢ় হলো—তার মনিব ছাড়া কেউ নয়।

লোকটা সদরঘাট ত্যাগ করে একটা বাসে উঠে পড়লো। হরিও উঠে পড়লো সেই বাসে। ঠাসাঠাসি অবস্থা, কেউ কারো দিকে তাকাবার সময় নেই বা উপায় নেই। অনেক কষ্টে হরি লোকটার উপর লক্ষ্য রাখলো।

বাসখানা লিয়াকত এভিন্যু হয়ে কোর্টের সম্মুখ দিয়ে এগিয়ে চললো। অসংখ্য জনতা আর যান বাহনের ভিড় অতিক্রম করে দ্রুত এগুচ্ছে। মাঝে মাঝে কন্ডাকটরের কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে—গুলোস্থান --নিউ মার্কেট --গুলোস্তান---নিউ মার্কেট--

বাসে ভিড় যেন আরও বেড়ে যাচ্ছে, কতকগুলো লোক ভিতরে স্থান না পেয়ে গাড়ির হ্যান্ডেল ধরে বাদুর -ঝোলা হয়ে চলেছে। প্রখর সূর্যের তাপে জান ত্রাহি ত্রাহি করছে সবার।

কন্ডাকটরের তীব্র চিৎকার —গুলোস্তান---নিউ মার্কেট---

একটা বাস ষ্টপেজে বাসটা দাঁড়িয়ে পড়তেই কয়েকজন লোক নেমে পড়লো, ঠিক যেন দৈত্যরাজ উদরপূর্ণ হওয়ায় কিছুটা উদগীরণ করলো।

একটু ফাঁক পেয়েই দাড়িওয়ালা লোকটা বসে পড়লো সামনের আসনে, কলাগুলো রাখলো কোলের উপর।

গুলিস্তান পেরিয়ে বায়তুল মোকাররম মসজিদের সম্মুখ হয়ে গাড়ি এগুচ্ছে। সেক্রেটারীয়েট গেটের মোড় ঘুরতেই একটা বাস ষ্টপেজ। গাড়ি থামাতেই কতকগুলো লোক নেমে পড়লো দড়বড়।

এবার দাড়িওয়ালা লোকটা নেমে পড়লো কলার ঝোপা নিয়ে। ভিড়ের মধ্যে হরিও নেমে দাঁড়ালো সকলের অলক্ষ্যে।

দাড়িওয়ালা লোকটা চারদিকে একবার সতর্ক দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে ফুটপাত ধরে চলতে লাগলো।

হরিও চলেছে তাকে অনুসরণ করে। তার মনিব যদি হবে সে—তবে মাঝপথে নেমে পড়বে কেন, সোজা সে চলে যেতো ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল অভিমুখে। একটা গলির দিকে চলতে লাগলো দাড়িওয়ালা লোকটা। দক্ষিণ হস্তে তার কলার ঝোপা। হঠাৎ, একটা পুলিশের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতেই পুলিশ পিঠ চাপড়ে দিলো দাড়িওয়ালার—কি ভাই, ব্যবসা কেমন চলছে?

দাড়িওয়ালা পুলিশটাকে দেখে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলো চট করে সামলে নিলো নিজকে, হেসে বললো—ব্যবসা চলছে একরকম মোটা মুটি, খুব ভাল নয়।

কিছু দিবি আজ?

বেশি নেই, গোটা বিশ নিতে পার আজ।

বিশ টাকা দিয়ে কি হবে বেটা বলতো?

এই আছে এখন, নাও।

কলা কি হবে?

মাল খুঁজছি, কলা দিয়ে টোপ ফেলবো।

যা, যা বেটা, মোটা কিছু না দিলে দেখবি মজাটা--

আচ্ছা সিপাহী জী, সালাম।

সালাম।

দাড়িওয়ালা যে তার মনিব নয় এতোক্ষণে বুঝলো হরি। পুলিশ আর দাড়িওয়ালা যখন কথা হচ্ছিলো তখন হরি একটু দূরে দাঁড়িয়ে বাদাম ভাজা চিবোচ্ছিলো।

পুলিশের সঙ্গে দাড়িওয়ালা কথা শেষ করে চলে যায়। হরি আবার আড়ালে আত্মগোপন করে অগ্রসর হয়। মাল—কিসের মাল? বুঝতে পারে না হরি পুলিশ আর দাড়িওয়ালার কথাবার্তা।

অলিগলি ঘুরে একটা চায়ের দোকানে এস বসলো লোকটা। এক খিলি পান গালে পুরে দিয়ে সিগারেট ধরালো কিন্তু লোকটা এখন বেশ উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছে বলে মনে হলো! সিগারেট টানছে আর তাকাচ্ছে সামনের দিকে। ওদিকেই কয়েকখানা দালানা কোঠা, প্রাচীর-ঘেরা ছোট্ট বাগান। বাগানে কয়েকটা ছেলে-মেয়ে খেলা করছে।

দাড়িওয়ালা কিছুক্ষণ বসে বসে হাই তুলে উঠে দাঁড়ালো, কলার ঝোপা হাতে নিয়ে এগুতো লাগলো। ঠিক সেই দন্ডে একটা বল এসে পড়লো প্রাচীরটির বাইরে।

দাড়িওয়ালা বলটা হাতে তুলে নিলো।

সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীর টপকে লাফিয়ে পড়লো আট-ন' বছরের একটা ফুটফটে বালক। বালকটা লাফিয়ে পড়েই চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো, অন্বেষণ করেছে সে তার বলটার।

দাড়িওয়ালা হেসে এগিয়ে এলো—খোকা বল। হাত উঁচু করে বলটা দেখালো।

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো বালকটার চোখ দুটো, ছুটে গেলো দাড়িওয়ালার পাশে—বল দাও।

আগে বলো তোমার নাম কি?

খোকা হাত বাড়িয়ে বললো—ফিরোজ।

বাঃ বাঃ চমৎকার নাম তো খোকা, আমার ছেলের নামও ফিরোজ ছিলো। বলটা হাতে দিলো খোকার।

খোকা দাড়িওয়ালার করুণ কণ্ঠ শুনে গম্ভীর মুখে বললো—কেন, তোমার ছেলে নেই?

না বাবা, আজ ছ'মাস হলো মারা গেছে। ঠিক তোমার মতই দেখতে ছিলো।

ঠিক আমার সমান বুঝি?

হ্যাঁ, ঠিক তোমার সমান।

কি হয়েছিলো তোমার ছেলের ?

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করার ভান করে বললো দাড়িওয়ালা—গাড়ি চাপা পড়ে---

বলো কি?

হাঁ। বাবা কোলে এসো, তোমাকে কোলে নিয়ে প্রাণ জুড়াই। এসো,এসো বাবা---হাত বাড়ালো খোকার দিকে।

খোকা মোহগ্রস্তের মত এগিয়ে গেলো লোকটার দিকে।

দাড়িওয়ালা খোকাকে গভীর স্নেহে কোলে টেনে নিলো, তারপর বললো—কলা খাবে? নাও খাও বাবা।

একটা কলা ছিঁড়ে হাতে দিলো লোকটা বালকের।

খোকা মনে করলো, আহা বেচারার ছেলে মারা গেছে, সখ করে যখন কলা দিচ্ছে, খাই না কেন। খোকা কলার খোসা ছড়িয়ে খেতে শুরু করলো।

দাড়িওয়ালা পরপর দুটো কলা ওকে খোসা ছাড়িয়ে দিলো। খোকা খেলো, বললো—আর খাবে?

খোকা বললো— না, আর খাবো না।

দাঁড়াও বাবা তোমার হাতমুখ মুছে দি! লোকটা এবার পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে খোকার হাত-মুখ পরিস্কার করে দিতে লাগলো। মুখের কাছে রুমালটা বেশ কিছুক্ষণ ধরে রাখলো।

একি, খোকা লোকটার কোলের উপর ঢলে পড়েছে।

অদূরে পানের দোকানে দাঁড়িয়ে পান চিবুতে চিবুতে একটা গাছের আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছিলো হরি, অবাক হয়ে গেলো—চিৎকার করে জানাবে না দেখবে কি করে সে।

লোকটা কলার ঝোপা আর বলটা পথে ফেলে দিয়ে বালকটাকে কোলে তুলে দ্রুত বাড়িটার পাশের গলির মধ্যে অদৃশ্য হলো।

হরিও খুব তাড়াতাড়ি আত্মগোপন করে অনুসরণ করলো।

লোকটা চারিদিকে সর্তক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এগুচ্ছে, যেমন কোনো লোক সম্মুখে পড়ে যাচ্ছে তখন বলছে সে—খোকা, খোকা একটু সোজা, হ'বাবা, মাজাটা যে আমার ধরে গেলো।

এমনি নানা কথা বলতে বলতে বড় রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়ালো ঠিক সেই মুহূর্তে একটা বেবী ট্যাক্সি চলে যাচ্ছিলো। লোকটা ডান হাত তুলে ডাকলো—বেবী ---বেবী---

বেবী ট্যাক্সিটা তার সম্মুখে এসে থেমে পড়লো।

দাড়িওয়ালা লোকটা বলে—ছেলেটা রৌদ্রে একেবারে ঘেমে গেছে। খোকা, খোকা ঘুমিয়ে পড়লি বাবা? একটু সোজা হ'বাবা। নাঃ ঘুমটা বড় জেকে গেছে দেখছি--চলো সদরঘাট।

বেবী ট্যাক্সি ছুটতে শুরু করলো।

হরি মুষড়ে পড়লো মুহূর্তের জন্য—কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার, নিশ্চয়ই লোকটা ছেলেধরা। তার মনিব ঐ ষ্টিমারেই তো চলে গেছে এমনি এক ছেলেধরার পিছনে।

হরির মাথায় হঠাৎ বুদ্ধি এলো, তার মনিবকে খুঁজে বের করতে হলে ঐ ষ্টিমারকেই ফলো করতে হবে। আর একটা বেবী ট্যাক্সি ডেকে চেপে বসলো হরি—চলো সদরঘাট।

অল্পক্ষণেই সদরঘাটে পৌঁছে গেলো হরি।।

তাড়াতাড়ি বেবীর ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে নেমে পড়লো হরি, তারপর ভিড়ের মধ্যে এগিয়ে চললো। চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলো কিন্তু ততক্ষণে দাড়িওয়ালা কোথায় ডুব মেরেছে দেখা গেলো না। নিশ্চয়ই সে তার ষ্টিমারে পৌঁছে গেছে।

হরি একসময় তার চিহ্নিত ষ্টিমারের নিকটে পৌঁছে গেলো। অবাক হয়ে দেখতে থাকে তাকিয়ে তাকিয়ে।

হঠাৎ তার কাঁধে একটা হাতের স্পর্শ অনুভব করে ফিরে তাকালো, চমকে উঠলো হরি দেখলো দাড়িওয়ালা তার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে।

হরি ভড়কে গেলো মুহূর্তে, তাহলে কি দাড়িওয়ালা টের পেয়ে গেছে তার কার্যকলাপ। কিন্তু পরক্ষণেই তার সন্দেহ দূরীভূত হলো। দাড়িওয়ালা বললো—কি দেখছিস বেটা?

থতমত খেয়ে বললো হরি—বাবু কোনো কাজ---

কাজ করবি?

হাঁ বাবু। পেট ধরে বলে—দু'দিন পেটে কিছু পড়েনি।

তোর মা-বাপ আছে?

মা আছে, বাপ নেই। বাবু কোনো কাজ থাকলে---

আয় তবে।

কি কাজ করতে হবে বাবু?

নারকেল তুলবি আর নামাবি পাক করতে পারিস্?

পারি কিছু কিছু।

পাকের জোগাড় দিবি।

আচ্ছা।

মাস হিসাবে থাকবি?

থাকবো। কত মাইনে দেবেন বাবু?

কত চাস্ বেটা বল্?

বিশ টাকা করে দেবেন।

আচ্ছা তাই হবে। দাড়িওয়ালা ভাবলো এতো কম মাইনে ভালই হলো। ছেলেটার চেহারা ভাল, বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কাজেই ওকে নিয়ে ষ্টিমারে উঠে গেলো।

হরিকে দেখে এগিয়ে এলো কয়েকজন, একজন বললো—এইটাও লইয়া আইলা নাকি?

কেন পছন্দ হচ্ছে না?

অইবোনা কেন? খুব অইছে। বাঃ বাঃ দু'দিন পর একডা বুড়ারে ধইর‍্যা আনবা হামিদ বাই।

নে বেশি বকবক করিস্ না হাবলু নিয়ে যা ওকে কাজ বাতলে দে। আজ থেকে ও আমাদের এখানে চাকরি করবে।

বালোই অইলো, ছোকড়া দেখতে বালোই কামও বালোই করবো মনে অয়। তা কত টেহা মাইনা দিবা ঠিক কইর‍্যা আনছো হামিদ বাই?

বিশ টাকা।

বাঃ বাঃ আরও বালো---

নে চুপ কর। আরে এতোক্ষণ তোর নামটা শোনা হয়নি, কি নাম তোর?

মাথায় বাধা গামছাটা আর একটু ঠিক করে নিয়ে বলে হরি—আমার নাম মামুদ।

মামুদ।

হাঁ বাবু।

যা কাজ দেখে নেগে।

চলে যায় হরি হাবলুর সঙ্গে। যেতে যেতে কানে আসে কে যেন বললো—হামিদ বাই, তুমি বড় লাকী মানুষ, না অইলে প্রথম ক্ষেপেই একটা বালো মাল পাও। তারপর বিশ টেহাতে চাকর পাও---

এরপর আর কিছু শোনা গেলো না। হরিকে নিয়ে হাবলু তখন ষ্টিমারের নীচের তলায় নেমে চলেছে। যেতে যেতে দেখলো হরি, একটা কামরার মধ্যে কতকগুলো লোক বসে কি সব খাচ্ছে, মদ হবে। শিউরে উঠলো হরি। কিন্তু এসে যখন পড়েছে তখন পালাবার পথ আর নেই।

হরি মনোযোগ দিয়ে কাজে লেগে পড়লো, অল্পক্ষণেই ষ্টিমারের প্রত্যেকের মন জয় করে নিলো সে। এমন একটা কাজের ছেলে পেয়ে খুশি হলো তারা।

আরও চার দিনে তিনটা ছেলে সংগ্রহ করে নিলো ওরা।

মাঝে মাঝে নারকেলের খরিদ্দার আসে, কিছু নারকেল বিক্রিও হয়। নারকেল ব্যবসার অন্তরালে চলে ছেলেধরা ব্যবসা।

রেডিও সংবাদে ঘোষণা শোনা যায়, ছেলে-হারানো সংবাদ।

ষ্টিমারেও বসে ট্রানজিষ্টার শুনে ছেলেধরার দল, হাসে ওরা হা হা করে। হরিও চা পরিবেশন করতে করতে শোনে সব, শিউরে উঠে ওর মন—হায়, এইভাবে কত কার সর্বনাশ এরা করে চলেছে, এর কি সমাধান বা শেষ নেই? হরি নিজের চোখে দেখেছে পুলিশ পর্যন্ত এদের সহায়তা করে চলেছে। এতো নির্মম জঘন্য ব্যাপার কয়টা টাকার লোভে ওরা---ছিঃ ছিঃ ঘৃণায় মন ওর বিষিয়ে উঠে।

হরি যখন এসব ভাবছে তখন হামিদ বলে উঠে—হাবলু, আর বেশি দেরি করা চলবেনা মাল যা পাওয়া গেছে সেই যথেষ্ট।

বললো হাবলু—ভয় কি, পুলিশগুলা তো সব আমাগো হাতের মধ্যে। টেহা দিলেই চোখ বুইজ্যা আর এক দিক চইল্যা যাইবো। দেইখাও দ্যাখবো না তারা বুঝলা?

হামিদ বলে উঠে—পুলিশগুলোকে হাত রেখেছি তাই বলে থানা অফিসারগুলো তো আর আমাদের হাতে নেই?

তা ঠিক্ কইছো হামিদ বাই বড় দারোগা যা রাগী মানুষ। এক পয়সা নাহি ঘুষ লয় না।

ঐ তো মুস্কিল, কোনো রকমে থানা অফিসারের চোখে পড়ে গেলে আর রক্ষা নেই। তখন ঐ ছেচ্ড়া পুলিশগুলো কিছু করতে পারবেনা, টাকা দিয়েও ফল হবে না। সবাই তো আর ঘুষ নেয় না।

সেদিনই সন্ধ্যায় ষ্টিমার ছাড়লো ছেলেধরার দল। এবার তাদের চারটা মাল সংগ্রহ হয়েছে—খুব খুশি নয় ওরা।

হরিও চললো, না গিয়ে তার কোনো উপায় ছিলো না। তার মনিবও একদিন এই ষ্টিমারে উধাও হয়েছে। যেমন করে হোক তাঁকে খুঁজে বের করতেই হবে।

হরি দুঃসাহসে বুক বেঁধে ছেলেধরার ষ্টিমারে পাড়ি জমালো। যতই সে এদের কার্যকলাপ দেখে অবাক হচ্ছে ততই নিজকে সামলে নিয়ে তাল মিলিয়ে চলছে। কি ভয়ঙ্কর সাংঘাতিক মানুষ এই ছেলেধরার দল!

ষ্টিমার এগিয়ে চলেছে, হরি গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে ছোট্ট ক্যাবিনটার মেঝেয় কিন্তু চোখে তার ঘুম নেই।

হঠাৎ একটা শব্দ হলো, চোখ তুলে তাকালো হরি—দেখলো একজন কে যেন তার ক্যাবিনে প্রবেশ করলো। অন্ধকারে চেনা যাচ্ছে না কে লোকটা। ভয় হলো হরির কি উদ্দেশ্য নিয়ে লোকটা এ ক্যাবিনে এসেছে?

হরি নিশ্বাস বন্ধ করে পড়ে রইলো।

ভারী জুতোর শব্দ শোনা যাচ্ছে, আর শোনা যাচ্ছে ষ্টিমার চলার ঝকঝকানি শব্দ।

হরি পিট্ পিট্ করে তাকিয়ে দেখতে লাগলো।

একটা আলো জ্বলে উঠলো ক্যাবিনের মধ্যে, সামান্য ক্ষীণ আলো। সেই আলোকরশ্মিতে দেখতে পেলো হরি সেই দাড়িওয়ালা আর তার পিছনে দু'জন লোক। কেবিনের দেয়ালে চাপ দিতেই একটা দরজা বেরিয়ে এলো। হরি স্পষ্ট শুনতে পেলো ছোট্ট বালকের কাঁদার শব্দ। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে কোনো বালক যেন।

লোকগুলো ক্যাবিনে প্রবেশ করলো, চাপা ধমকের শব্দ কানে এলো হরির—চুপ করে ঘুমো, না হলে এই দেখ ছোরা, কেটে ফেলবো দু'টুকরা করে।

হরি আঁতকে উঠলো কি ভয়ঙ্কর মানুষ এরা।

চোখ বন্ধ করে পড়ে রইলো সে স্তব্ধ হয়ে।

❑

ভোলানাথ, লয়ামিয়া আর বুধা গোলপাতা বোঝাই নৌকা নিয়ে ফিরে চললো, এবার তারা খুলনা হয়ে সপলায় যাবে। গোলপাতা ছেড়ে দিয়ে কিছু শুকনো নারকেল কিনে তবেই ফিরবে তারা। গোলপাতার কাজ শেষ হয়েছে—এখন নারকেলের প্রয়োজন।

লয়া বাঘের চামড়াটা ছাড়িয়ে সঙ্গে নিয়েছে, ভোলার এ ব্যাপারে তেমন কোনো আগ্রহ নেই, যত আগ্রহ বুধা আর লয়ার।

কইর‍্যা নদী হয়ে সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে তাদের নৌকা। কাল রাতের অন্ধকারে এসেছিলো, আজ দিনের আলোয় ফিরে চলেছে। সূর্যের আলোয় চারিদিক ঝলমল করছে যেন। দু'পাশে সুন্দরবন—শুধু বন আর বন! বিস্তৃত প্রান্তর জুড়ে সুন্দরী গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বনের মধ্যে যতদূর দৃষ্টি চলে যায় পরিস্কার ঝকঝকে—মনে হয়, কে যেন ঝাড় দিয়ে রেখেছে। সুন্দরবনের মধ্যে একটি জিনিস দৃষ্টি আকর্ষণ করলো তাদের, সে হলো সুন্দরী গাছের ফাঁকে মাটিতে অসংখ্য শিং যেন মাথা উঁচু করে আছে। ঠিক যেন গরুর শিং-এর মত জিনিসগুলো। এগুলো যে কোনোরকম গাছ বা গাছের শিকড় তাতে কোনো ভুল নেই।

মাঝে মাঝে বালির চর নজরে পড়তে লাগলো অবাক হলো ভোলানাথ, সেই সব বালির চরে সূর্যের আলোতে গা মেলে দিয়ে শুয়ে আছে অনেক

ছোট-বড় কুমীর। তাদের নৌকা চলার শব্দ পেয়ে হুড়মুড় করে কুমীরগুলো নেমে পড়লো নদীর মধ্যে।

কোথাও বা হরিণী তার শিশুগুলোসহ নদীতীরে পানি পান করছে, একটু শব্দ পাওয়ামাত্র চকিতে পালিয়ে গেলো বনের অন্তরালে।

কোথাও বা চরে অগণিত বক সাদা ধপধপে পাখা মেলে রোদ পোয়াচ্ছে, কেউ বা লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটছে বালির উপর। কেউ বা একপা তুলে দাঁড়িয়ে আছে পানির ধারে চুপটি করে পুটি মাছের আশায়।

বুধা বড় শয়তান হুম্ করে একটা শব্দ করলো—সঙ্গে সঙ্গে শুভ্র বলাকার দল ডানা মেলে উড়ে উঠলো আকাশে। অপূর্ব সুন্দর এ দৃশ্য।

সুন্দরবনের বিস্তৃত অংশের মধ্যে আঁকাবাঁকা অসংখ্য নদী।

এদিক থেকে চলে গেছে ওদিকে। নদীর দু'পাশ গোলপাতা আর বেৎফলের গাছ মাথা নুইয়ে যেন অভিনন্দন জানাচ্ছে। পিছনেই সুন্দরী গাছ কাঁচি ছাটার মতই যেন মনে হয় দূর থেকে। সব গাছগুলোই প্রায় এক সমান, কোনোটাই ছোট বড় নয়। সুন্দরবন নামটা সার্থক নাম তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অপূর্ব সুন্দরের সমাবেশ যেন এই সুন্দরবনে।

বেলা গড়িয়ে পড়লো চৌকানী পৌঁছতে, এটা কোনো বন্দর বা জাহাজঘাটা নয়। নদীতীরে একটা ছোটোখাটো গ্রাম। সুন্দরবন শেষ হতেই দেখা যেতে লাগলো নদীর দু'ধারে গোলপাতার ছাউনী ছোট ছোট কুঁড়েঘর। আরও দেখা গেলো নদীর দু'তীরে উলঙ্গ, অর্ধ-উলঙ্গ অগণিত ছেলে-মেয়ে— অবাক হয়ে তারা দেখছে নৌকাগুলো। কেউ বা ঢিল ছুড়ছে কেউ বা হাততালি দিয়ে ধেই ধেই করে নাচছে। কোনো কোনো ছোট বালক হাত নেড়ে ডাকছে নৌকাগুলোকে।

চৌকানী ছাড়তেই শুরু হলো ভৈরব নদী। প্রশস্ত নদী। অসংখ্য নৌকা-ষ্টিমার তাদের নৌকাখানার পাশ কেটে চলে যাচ্ছে। প্রায় নৌকাগুলোই সুন্দরী কাঠ বা গোলপাতা বোঝাই হয়ে ফিরে চলেছে খুলনার দিকে। কোনো কোনো নৌকা, ষ্টিমার এবং জাহাজ চলেছে বিভিন্ন বন্দর অভিমুখে।

নানা ধরনের জলযান দেখা যেতে লাগলো।

কোনো কোনো লঞ্চে চলেছে শিকারী দল, কেউ বা চোখে গগল্স লাগিয়ে ডেকে দাঁড়িয়ে আছে, কেউ বা বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে দূরে দেখছে। কারো বা হাতে বন্দুক শোভা পাচ্ছে। সৌখিন শিকারী দল এরা, তাতে কোনো ভুল নেই।

চালনা বন্দরে পৌঁছতে সন্ধ্যা লেগে গেলো।

লয়ার নির্দেশে চালনা বন্দরে নৌকা ভিড়ালো ভোলানাথ। এখানে কিছু ডাব আর চিড়া-গুড় কিনে নিলো লয়া পথে খাবার জন্য। ডাব খুব সস্তা,

প্রায় দু'তিন আনা মাত্র জোড়া। এত সস্তা ডাব এর আগে দেখেনি ভোলানাথ। সে কয়েকটা কেটে পানি পান করে তৃপ্তি লাভ করলো। লয়া আর বুধা বসলো চিড়ার পুটলী নিয়ে। পেট পুরে ওরা চিড়া গুড় খেয়ে খানিক্ষণ বিশ্রাম করে নিলো চালনায়।

ভৈরব নদী হয়েই তারা খুলনা বন্দর অভিমুখে চললো।

সেখানে গোলপাতা বিক্রয় করার পর কিছু নারকেল কিনে পুনরায় রওয়ানা দেবে তাদের গন্তব্যস্থান সপলা গ্রাম অভিমুখে। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে ফিরবে তারা আরফান উল্লাহর নারকেলের গুদামে।

❑

একদিন লেগে গেলো, হরিসহ হামিদের দল এসে পৌঁছলো আরফান উল্লাহর গুদামে।

এরা যখন এসে হাজির হলো তখন গুদামে হই-হুল্লোড় পড়ে গেছে, গুদামের একটা কক্ষে পাওয়া গেছে পঁচা একটা লাশ। লাশটা ঠিক কার বুঝা মুস্কিল পঁচে একেবারে বিকৃত হয়ে পড়েছে। গুদামকক্ষের চৌকির নীচ থেকে পাওয়া গেছে লাশটা।

থানা-পুলিশ জেনে ফেললে মহা মুস্কিল হবে, কাজেই গোপনে লাশটা পুঁতে ফেলার চেষ্টা করলো আরফান উল্লাহ। দিনে এ কাজ সমাধা করা সম্ভব নয়, কাজেই লাশটা গুদামঘরের এক নিভৃত কোণে রেখে দিলো বস্তা চাপা দিয়ে।

হামিদ আর আরফান উল্লাহ নতুন মাল নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে লাগলো। ছেলে চারটিকে নারকেল স্তূপের আড়ালে একটা ছোট কুঠরীর মধ্যে বন্দী করে রাখা হলো। ওরা ঐখানে কাঁদতে লাগলো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

হরি নতুন লোক, তাই ওকে বিশ্বাস নেই, গুদামঘরের বাইরে চালাঘরের মধ্যে বসিয়ে রাখা হয়েছে তাকে।

হরি কিন্তু এখানে এসে ভীষণভাবে ভড়কে গেছে, যার অন্বেষণে সে এতোদূর এসে পড়লো—সে কই। হরি যেন ক্রমান্বয়ে অস্থির হয়ে পড়ছে। তারপর যখন সে শুনতে পেলো, গুদামঘরের চৌকির নীচে একটা পঁচা লাশ পাওয়া গেছে তখন তার হৃদপিন্ড যেন কেউ ছিঁড়ে ফেললো টুকরা টুকরা করে, মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে লাগলো—তার মনিবকে কেউ হত্যা করে ফেলেনি তো?

সমস্ত দিন হরি নানারকম দুশ্চিন্তায় কাটালো। রাতে গুদামঘরের এক কোণে শুতে গিয়ে ভাবছে নানা কথা। সে শুনেছে রাত চারটায় লাশটা সরিয়ে ফেলা হবে।

এখন রাত দু'টো, সবাই ঘুমিয়ে আছে।

হরি শুধু জেগে আছে, আজ তার ভয়-ভাবনা সব যেন উড়ে গেছে কোথায়। চারিদিক নিস্তব্ধ হরি চুপিচুপি উঠে পড়লো, আলগোছে অগ্রসর হতে লাগলো গুদামঘরের মধ্যে। লোকগুলো সব কুন্ডলী পাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। ওদিকে লাশটাকে রাতে পুঁতে ফেলার জন্য গর্ত করে রাখা হয়েছে। যারা লাশটাকে পুঁতে ফেলবে তারাও একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছিলো, কারণ কিছু পরেই তাদের উঠে পড়তে হবে।

হরি গুটি গুটি পায়ে প্রবেশ করলো বড় গুদামটার মধ্যে। হাবলুর শিয়রে রাখা টর্চটা তুলে নিলো সন্তর্পণে। আবার অগ্রসর হলো, সোজা সে গুদামের মধ্যে নারকেল স্তূপের আড়ালে এসে দাঁড়ালো। একটা বিকট গন্ধ তার নাকে প্রবেশ করলো—সে দুর্গন্ধ কি! হরি বুঝতে পারলো, এটা সেই পঁচা লাশের গন্ধ। নাকে কাপড় চাপা দিলো। হরির মাথায় সর্বদা একটা গামছা বাঁধা থাকতো, যখন হরি পাজামা পরতো তখন সে ব্যবহার করতো টুপি। এক মুহূর্তের জন্যও হরির মাথা থেকে গামছা বা টুপি সরে পড়তো না।

হরি নাকে কাপড় চাপা দিয়ে টর্চ জ্বেলে ভয়-বিহ্বলচকিত পদক্ষেপে এগুতে লাগলো। ঐ তো ওখানে বস্তাটার নীচে লাশটা ঢাকা আছে। ভয়ে হরির বুক কেঁপে উঠলো—হাজার হলেও লাশ তো! কিন্তু পিছিয়ে গেলে চলবে না, দেখতেই হবে ঐ মৃতদেহটা কার? তার মনিবের সন্ধানেই সে এসেছে এতোদূর। কিন্তু কই, এখানেও তো পেলো না তাকে—তবে কি তার মনিবকে কেউ হত্যা করে ফেলেছে—ও লাশটা কি তারই....না না, তা হতে পারে না......হতে পারে না.....তার মনিবকে কেউ হত্যা করতে পারে না। তবে সে গেলো কোথায়? হরি শিউরে উঠলো মনে মনে, তবু কম্পিত পদক্ষেপে লাশটার পাশে এসে দাঁড়ালো, বস্তাটা চট করে সরিয়ে টর্চের আলো ফেললো লাশটার মুখে। বিকৃত লাশটার মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই হরি চিৎকার করে উঠলো—না না, সে নয়....সে নয়....সে নয়....

অমনি হরির মুখে হাতচাপা দিলো কে যেন, হরি চমকে ফিরে তাকাতেই বিস্ময়ে অস্ফুট ধ্বনি করলো—কে—কে তুমি?

অন্ধকারে সে কিছুই দেখতে পেলো না, শুধু বলিষ্ঠ একখানা হাত তার মুখে এসে পড়েছিলো।

হরির কণ্ঠস্বরে লণ্ঠন হাতে ছুটে এলো কয়েকজন—স্বয়ং আরফান উল্লাহও। আজ সে বাড়ি না গিয়ে গুদামঘরেই ঘুমিয়েছিলো, কারণ লাশটা পুঁতে না ফেলা পর্যন্ত সে নিশ্চিন্ত নয়।

অন্যান্যের সঙ্গে আরফানও এসে দাঁড়ালো তার গুদামঘরের নারকেল স্তূপের আড়ালে।

লণ্ঠনের আলোতে আরফান উল্লাহ বলে উঠলো—ভোলানাথ তুমি?

হরিও তাকালো ভোলানাথের মুখে, আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো হরির চোখ দুটো।

আরফান বললো—এতো রাতে এহানে কি করছিলা তোমরা?

ভোলা জবাব দিলো—আমরা রাতে ঘাটে আইসেছি, তারপর গুদামে আসতে অনেক রাইত অয়, তাই কাউরে না ডাইক্যা শুইয়া পড়ছিলাম।

লয়া আর বুধা আইসে?

না, ওরা নাও-এ আছে। নারকুল বোঝাই নাও, তাই একা রাইখ্যা আইবে কেমুন কইর‍্যা?

তা এহানে তুমি আর ঐ ছোকরা ক্যান্?

লাশটা দেখতে আইসেছিলাম মালিক? বললো ভোলা! হরির কথা বললে হয়তো সে কোনো বিপদে পড়তে পারে তাই সে নিজের কথা বললো।

হরি তো থ' মেরে দাঁড়িয়ে আছে, এতোক্ষণ যে একটা ভয়-ভাবনা-দুশ্চিন্তা তার মনে ঝড় তুলেছিলো সব যেন শেষ হয়ে গেছে, ভোলার দর্শনে অনাবিল এক শান্তি এসেছে তার মনে। আরফানের ভয়ঙ্কর চেহারা আর ভীষণ গর্জনে সে এখন এতোটুকু ভীত নয়।

আরফান বললো—লাশ দেখতে আইছিলা কিন্তু ও কেন তোমাগো সাথে?

হেসে বললো ভোলানাথ—আমারে একা ভয় লাগে তাই অরে সঙ্গে আনছি।

লাশের কি দেখছ?

দেখছিলাম কার এ অবস্থা অইছে।

চিনতে পারলা?

চিনতে পারমু না মালিক, এ যে গফরা।

গফরা?

হাঁ মালিক।

গফরারে আমি না ক্ষ্যাপে পাঠাইছি, মাল লইয়া গ্যাছে সে দক্ষিণ গাঁও?

ভোলা হরির হাত থেকে টর্চটা নিয়ে ফেললো লাশটার মুখে—ভাল কইর‍্যা দেহেন মালিক।

আরফান তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকালো, সে এমন ভাল করে লক্ষ্যই করেনি। গন্ধে নিকটেই যায়নি সে। এখন ভালভাবে তাকিয়ে চিনতে ভুল হলো না, বললো—তাই তো, এ যে দেখতাছি গফরা। হায়, গফরারে কে এমন কইর‍্যা মারলো?

গফুরের হত্যা ব্যাপার ঘটেছিলো আজ থেকে বেশ কয়েকদিন আগে। স্বয়ং বনহুর ওকে হত্যা করে গফুর সেজে সে গিয়েছিলো মাল নিয়ে।

অন্যান্যের সঙ্গে ভোলাও যোগ দিয়ে গফুরের লাশ পুঁতে রাখলো মাটির তলায়। লাশ গোপন করার পর নিশ্চিন্ত হলো আরফান উল্লাহ।

❑

ভোলানাথ মাঝিকে একসময় নিভৃতে পেয়ে হরি পাশে এসে দাঁড়ালো, এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললো—স্যার, আপনি চলে এলেন আর গেলেন না?

তাই বুঝি তুমি আমার সন্ধানে এসেছো?

হাঁ স্যার! সত্যি আমি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম একেবারে। তা আপনি ভোলানাথ সেজে......

হেসে উঠলো ভোলানাথ-বেশি বনহুর—হাঁ, ভোলানাথ সেজে আমি ছেলেধরার আসল ঘাঁটি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি।

কোথায় সে ঘাঁটি?

সুন্দরবনের অন্তরালে।

সুন্দরবন!

হাঁ, বনটা সুন্দরই বটে কিন্তু তার ভিতরেও যে চলেছে ভীষণ এক জালিয়াতি কুৎসিত ব্যবসা। তুমি কেন এলে হরি, তোমাকে নিয়ে আমি একটা সমস্যায় পড়লাম।

অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো হরি—তাহলে আমি চলে যাই!

পা বাড়ালো হরি সামনের দিকে।

বনহুর ওকে ধরে ফেললো খপ করে—হরি।

না না, আমাকে ছেড়ে দিন, যেতে দিন আমাকে।

বনহুর হরিকে বাহুবন্ধনে বেঁধে ফেললো—সকলের চোখে ধূলো দিতে পারো হরি কিন্তু আমার চোখে নয়।

একি, ছেড়ে দিন বাবু, ছেড়ে দিন।

উঁ হুঁ ছাড়বো না।

বাবু?

নূরী, তুমি বড্ড ছলনাময়ী। কেন, তুমি আমার সঙ্গে ছলনা করো বলোতো?

হরির মাথা থেকে গামছাটা খুলে নেয় বনহুর, সঙ্গে সঙ্গে কোঁকড়ানো একগাদা চুল ছড়িয়ে পড়ে চোখেমুখে তার।

বনহুর গভীর আবেগে নূরীর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে, চুম্বনে চুম্বনে রাঙা করে তোলে ওর গন্ডদ্বয়।

হরিবেশি নূরী বনহুরের বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেওয়ার চেষ্টা করে বললো—কেউ এসে পড়লে তখন কি হবে বলো তো?

নূরী, এতোদিন ধৈর্য ধরে তোমার কার্যকলাপ আমি লক্ষ্য করে এসেছি। কিন্তু আজ আর পারলাম না।

আহ্ ছেড়ে দাও হুর।

না।

যদি কেউ এসে পড়ে?

এদিকে কেউ আসবে না, শুধু মালিক আরফান ছাড়া। এখন আরফান নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। গফরার লাশ নিয়ে সে জেগেছে সারারাত। নূরী, আমি যখন সুভাষিণীসহ প্লেনে উঠে বসলাম তখন তুমি শিখ তরুণের বেশে আমাদের পিছন আসনে এসে বসলে, সেই মুহূর্তে আমি তোমায় চিনে ফেলেছি। বড্ড হাসি পাচ্ছিলো তোমার কান্ড দেখে, কিন্তু কোনোরকমে নিজেকে সামলে রেখেছিলাম, ভেবেছিলাম দেখি তুমি কি করো।

নূরী অবাক হয়ে বলে—কি আশ্চর্য, তুমি আমাকে প্রথমেই চিনে নিয়েছিলে?

হাঁ, তারপর তুমি পরের এরোড্রামে নেমে গেলে আমি বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলাম কিন্তু একটু পরে একজন বোরখা-পরা তরুণী এসে উঁঠলো—সেই যে তুমি, তা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম।

নূরী বনহুরের চুল ধরে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে বললো—তুমি এতো ধূর্ত!

তারপর ভগবৎগঞ্জে এসে প্রতীক্ষা করছিলাম তোমার। বেশ ঘাবড়ে পড়েছিলাম বিলম্ব দেখে, হঠাৎ এক চাকর এসে হাজির—নাম তার হরি। বাঃ চমৎকার বুদ্ধি.....

থাক হয়েছে। নূরী বনহুরের মুখে হাতচাপা দেয়।

বনহুর বলে—কিন্তু এখানে এলে কেন বলো তো? তোমাকে নিয়ে এবার সমস্যায় পড়বো।

না, আমার জন্য তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না।

ঠিক সেই মুহূর্তে পাশব্দ শোনা যায়।

বনহুর নিজে নূরীর মাথায় গামছাটা পাগড়ীর মত করে বেঁধে দিয়ে চুলগুলো গুঁজে দেয় পাগড়ীর ভিতরে।

একটু পরে আরফান এসে দাঁড়ায়—ভোলানাথ?

বলুন মালিক?

আরফান হরির দিকে তাকায়।

বনহুর বুঝতে পারে, ওকে দেখে সন্দেহ হচ্ছে তাই কোনো কথা বলতে চেয়ে বলতে পারছে না আরফান উল্লাহ।

ভোলানাথ বলে এবার—হরি যাও, মালিককে বইল্যা তোমাগো পাওনা মিটাই দিমু।

হরি বলে—আচ্ছা দিবেন।

চলে যায় হরি।

ভোলানাথ বলে—কন এবার মালিক?

হোনো ভোলা, তুমি আমাগো বিশ্বাসী আর কামের মানুষ, তাই তোমাগো একটা কথা কইমু?

কন মালিক?

এ পাড়ার সবুর আলীরে চেনো না।

তা চিনমু না মালিক? সবাইরে চিনি!

ওর মাইয়্যা সহিনারে চেনো?

তারে দেহিনি মালিক।

আজ কয়দিন অইলো বুড়া সবুর আলীরে বাঁইন্ধ্যা রাখছি। দিনে একবার কইর‍্যা চাবুক লাগান অয়। তাও বেটির কথা কয় না বুড়া।

কন কি মালিক, সবুর আলীরে বাঁইন্ধ্যা রাখছেন? চাবুক মারেন তাও মাইয়্যার কথা কয় না?

কয় না, বড় পাজি বুড়া।

মালিক, আপনি বুড়ারে ছাইড়া দ্যান, আমি ফুসলাইয়্যা তার থেইক্যা কথা আদায় কইর‍্যা নিমু।

কি যে কও, বুড়ারে ছাইড়া দিলে আসল কথা কইবো আর?

মালিক আমি কইলাম, দেহেন কাম হাসিল অয় কিনা। বুড়াডারে ছাইড়া দিয়া ভাল ভাল খাইতে দিমু, ভাল ভাল কাপড় চোপড় দিমু আর দিমু টাহা.....

কও কি ভোলা?

হ মালিক, মাইর‍্যা কোনোদিন আসল কথা বাইর করা যায় না, মিঠা কথায় সব অয়।

আচ্ছা, তা অইলে তুমি যা বালো বুঝ তাই করো। কিন্তু মনে রাইখো, বুড়ার বেটী সহিনারে আমার চাই।

আচ্ছা মালিক তাই অইবো।

যাও।

মালিক!

কও?

হরি কয়টা টেহা চায়?

আচ্ছা দিয়া দিমুনি। দেহ বুড়ারে ছাইড়া সব জাল পণ্ড কইর‍্যা দিও না।

না মালিক।

ভোলানাথ মালিকের কাছে আদেশ পেয়ে তখনই গুমঘরে গেলো— ভোলা অরশ্য গুমঘর চিনতো না, আরফানই পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলো তাকে।

আরফানের সঙ্গে আর একজন লোককে দেখে বুড়ো সবুর আলী ভয়ে কুঁকড়ে গেলো, করুণ কণ্ঠে বললো—আমাগো আর কষ্ট দিও না আরফান বাই, আমি মইর‍্যা গেলাম।

ভোলাই কথা বললো প্রথমে—না আর তোমারে কষ্ট দেওয়া অইবো না। তোমারে ছাইড়া দিমু বইলাই আইসেছি।

কি কইল্যা, তোমরা আমাগো ছাইড়া দিবা? আরফান বাই, ও কি সত্য কতা কইছে?

হ, সত্য কতা। কিন্তু তোমার মাইয়্যারে না পাইলে দেখবা কি অয়।

ভোলানাথ ততক্ষণে বুড়ো সবুর আলীর হাত-পা'র বাঁধন খুলে দিতে থাকে।

আরফান উল্লাহ ভোলার কানে কানে পুনরায় তার মনোভাব ব্যক্ত করে চলে যায় সেখান থেকে।

ভোলা সবুর আলীকে মুক্ত করে দিয়ে বলে—চলো তোমারে বাড়ি রাইখ্যা আসি।

সবুর আলী কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকায় ভোলার মুখের দিকে। ভোলা চাপা স্বরে বলে—আমি সেই আলম, কোনো চিন্তা করবেন না। আলী সাহেব।

বাবা, তুমি আমাগো সেই আলম?

হাঁ।

আমার মাইয়্যা সখিনা কই গ্যাছে, তুমি তারে সঙ্গে লইয়্যা আইছিলা? কও আমাগো মাইয়া কই?

কোনো ভয় করো না, বলছি তোমার মেয়ে ভালই আছে।

সত্যি কইছো বাপ?

হাঁ, সত্যি তোমার মেয়ে ভাল আছে। আচ্ছা, আমি আজ তোমাকে তার সঙ্গে দেখা করাবো।

ভোলানাথ সবুর আলীসহ বেরিয়ে পড়লো।

আজ সবুর আলী ছাড়া পেয়ে প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিলো, এ ক'দিন ধরে এক অন্ধকার ঘরে নারকেল ছোবড়ার মধ্যে বন্ধন অবস্থায় থেকে জীবন তার ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছিলো। হাত-পায়ে ঘা হয়ে গিয়েছিলো একেবারে।

বাড়ি এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো সবুর আলী।

একসময় বনহুর চাষীর বেশে এসে হাজির হলো আরফান উল্লাহর বাড়িতে। সন্ধ্যা তখন গড়িয়ে গেছে, ঘরে ঘরে লণ্ঠন জ্বলে উঠেছে। আরফান উল্লাহর বাড়িতেও তখন সন্ধ্যা আলো জ্বলে উঠেছে।

বনহুর ছেঁড়া জামা আর ময়লা একটা লুঙ্গী পরে এসে দাঁড়ালো আরফান উল্লাহর বাড়ির সদর গেটে, চাকরটার নাম ধরে ডাকলো—ছলিম ভাই বাড়ি আছেন? ও ছলিম ভাই......

বাড়ির ভিতর থেকে শোনা গেলো ছলিমের গলা—আমাগো কে ডাহে?

বনহুর বললো—একবার এদিকে আসুন না দয়া করে।

বাইরে বেরিয়ে আসে ছলিম—রুক্ষ চুল, মলিন মুখ বনহুরকে দেখেই বলে উঠে—ও তুমি আইছো?

হাঁ।

তা কি কও, বোনডারে দেখবার চাও?

না, ওকে নিয়ে যাবো।

নিয়া যাইবা? তা এক মাস অয় নাই তারি মধ্যে আবার লাইয়র?

না ভাই, আমার বাপের অসুখ, তাই দেখতে চায় ওকে।

বুঝছি, বুঝছি, অমন কত জনা মাইয়া পোলা রাইখ্যা যায় আবার কয়দিন থাইক্যা লইতে আসে, কয় মায়ের জ্বর না হয় বাপের পেটের অসুখ....দাঁড়াও আম্মাজানেরে কই দেহি কি কয়।

ভিতরে চলে যায় ছলিম, একটু পরে দরজার আড়ালে এসে দাঁড়ায় আরফান গৃহিনী, ছলিম আর সখিনাও আসে।

সখিনা এগিয়ে আসে—বাইজান, বাপজী ক্যামন আছে?

তার অসুখ তাই তোমাকে নিতে এসেছি।

আরফান গৃহিনী এ ক'দিনে সখিনার কাজে মুগ্ধ হয়ে গেছে। তার সব কাজ কেড়ে নিয়ে করেছে সে, ঘর গোছানো থেকে রান্না-বাড়াটা পর্যন্ত। এখন আরফান গৃহিণীর ওকে ছেড়ে দিতে মন চাইছিলো না। বললো সে আড়ালে থেকে—দেহো তোমার বোনডা বালোই কাম করে। যা টেহা চাও তাই দিমু, লইয়া যাইও না।

বাপের অসুখ না হলে আসতাম না। বাপকে দেখে আবার রেখে যাবো। আপনার বাড়ি না হলে যে বাঁচা নেই ওর।

সত্যি কইছো কতাডা?

হাঁ সত্যি বলছি, আজই আবার রেখে যাবো।

সখিনাকে লক্ষ্য করলো আরফান গৃহিণী—যাও গা, আবার আইয়ো।

আইমু আম্মাজান, না অইলে আমাগো চলবো, না। সখিনা আরফান গৃহিনীর নিকটে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলো।

পথে চলতে চলতে বললো সখিনা—আলম বাই, বাপজানের সত্য অসুখ অইছে?

না না, মিথ্যা বলে তোমাকে নিয়ে এলাম বোন।

বাপজান বালো আছে?

ভাল আর কই, তোমাকে না পেয়ে শয়তান আরফান তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে গুদামে এক অন্ধকার ঘরে বন্ধ করে রেখেছিলো, আমি ফিরে এসে তাকে সেখানে থেকে নিয়ে এসেছি। তোমার বাপ তোমাকে দেখার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সখিনা?

কন বাইজান?

বাপের সঙ্গে দেখা করে আবার চলে আসবে কিন্তু। যতদিন ওকে, মানে আরফানকে সায়েস্তা করতে না পেরেছি ততদিন তোমাকে ওর বাড়িতেই আশ্রয় নিয়ে থাকতে হবে।

আপনে যা কইবেন তাই অইবো।

সখিনা বনহুরকে কখনও 'আপনি' কখনও তুমি বলতো, কারণ সে একটি অশিক্ষিতা গ্রাম্য তরুণী। ভাল কথা বলতে সে জানে না।

বনহুর সখিনাসহ সবুর আলীর বাড়ি পৌঁছে গেলো।

কন্যাকে সুস্থ অবস্থায় দেখে সবুর আলীর আনন্দ আর ধরে না, সস্নেহে মাথায়-পিঠে হাত বুলিয়ে নীরবে অশ্রু ফেলেন। আরফানের নৃশংস আচরণে অতিষ্ঠ হলেও তার কন্যা সখিনা যে কোনো কষ্ট পায়নি বা লাঞ্ছিত হয়নি এটাই তার খোদার কাছে হাজার শুকরিয়া।

পিতা আর কন্যা যখন আনন্দে আত্মহারা তখন বনহুর পাশে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য উপভোগ করছিলো, তাদের এই খুশি তার মনেও এক অপূর্ব শান্তি এনে দিচ্ছিলো।

কিন্তু বেশিক্ষণ সখিনাকে এখানে রাখা সম্ভব নয়, হঠাৎ যদি কেউ জেনে ফেলে তাহলে মুস্কিল হয়ে পড়বে। বনহুর বললো—বোন সখিনা, এবার চলো। আর বিলম্ব করা উচিত নয়।

সখিনা পিতার পায়ে সালাম করে উঠে দাঁড়ালো।

চলেন আলম বাই।

চলো বোন। আলী সাহেব, আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন, সখিনার জন্য কোনো চিন্তা ভাবনা করবেন না।

আচ্ছা বাবা, তুমি যা বালো বোঝো করো।

বনহুর সখিনাকে নিয়ে বেরিয়ে যায়।

সখিনাকে নিয়ে বনহুর বেরিয়ে যাবার পরই আরফানের লোক এসে হাজির হয়, একবার দেখে যায় নিজের চোখে সখিনা ফিরে এসেছে কিনা।

ভাগ্য ভাল বলতে হবে তাই রক্ষা পায়—

বনহুর সখিনাকে নিয়ে তখন আরফান উল্লাহর বাড়ির দিকে এগিয়ে চলেছে।

বনহুর যখন সখিনাসহ আরফান উল্লাহর বাড়ি অভিমুখে যাচ্ছিলো তখন হরি দূর থেকে দেখে ফেলে। চাষীর বেশে বনহুরকে চিনতে তার মোটেই দেরি হয় না কিন্তু ওর সঙ্গে মেয়েটি কে? ঘোমটার মুখ ঢেকে ওর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। অনুসরণ করে হরি বনহুর আর সখিনাকে।

অল্প কিছুদূর এগুতেই হাবলু হরিকে দেখে ফেলে বলে—কিরে, কই যাইতেছোস্?

হরির অনুসরণ করা আর হলো না, মনের সন্দেহ মনে চেপে বললো—নতুন জায়গা, একটু দেখে নিচ্ছি ভাই।

চল আমি তোরে গ্রামডা ঘুইরা দেহাইয়া আনি।

অগত্যা হরি অনুসরণ করলো তাকে।

হাবলুর সঙ্গে চললেও হরির মনে ভীষণ একটা তোলপাড় শুরু হলো, তবে কি বনহুর এখানে এসে কোনো মেয়েছেলের পাল্লায় পড়ে গেছে? কে ঐ ঘোমটায় মুখ-ঢাকা তরুণী......

হাবলু বললো—কি ভাবতাছোসরে হরি?

না, কিছু না।

বুঝছি, নতুন দ্যাশে আইয়া তোরে ফাঁপর লাইগেছে।

হাবলুর কথায় কোনো জবাব না দিয়ে চলতে থাকে হরি।

জ্যোৎস্না প্লাবিত আকাশ, আলোতে ঝলমল করছে চারিদিক! পথ-ঘাট সব পরিস্কার দেখা যাচ্ছে।

তবু হরি বেশি দূর যেতে রাজি হয় না, ফিরে যায় আরফান উল্লাহর গুদামে হরি আর হাবলু।

খাওয়া-দাওয়ার পরে হরি তার নির্দিষ্ট জায়গায় শুয়ে পড়ে। তখনও ফিরে আসেনি ভোলানাথ। হরির গা জ্বালা করছে—এখানে এসে ভোলানাথ খুব মেতে উঠেছে মেয়েছেলে নিয়ে! রাগে গস গস করে হরি।

গুদামের এক কোণে একটা মাদুর বিছিয়ে শুয়েছে হরি কম্বলমুড়ি দিয়ে। এ গুদামে কেউ শোয় না, তাই হরি নিজের থাকার জন্য বেছে নিয়েছে এটা।

নানা কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে হরি ঘুমিয়ে পড়েছে খেয়াল নেই।

হঠাৎ নিজের ললাটের উপর কারো হাতের স্পর্শ পেয়ে ঘুম ভেঙ্গে গেলো হরির, চোখ মেলতেই অন্ধকারে চাপা একটি কণ্ঠস্বর, যে কণ্ঠের প্রতীক্ষায় সে এতোক্ষণ প্রহর গুণছিলো।

নূরী!

অভিমানে ভরে উঠে নূরীর মন, বলে—না-না, তুমি যাও। হাত খানা সরিয়ে দেয় সে তার ললাট থেকে।

বলে বনহুর—নূরী, মিছেমিছি তুমি অভিমান করছো।

না, আমি জানতাম না তুমি এখানে এসে একটা মেয়েকে নিয়ে মেতে উঠবে.....

এ তুমি কি বলছো নূরী?

আমি সব দেখেছি।

কি দেখেছো?

তুমি একটা ঘোমটায় মুখ-ঢাকা মেয়েকে নিয়ে......

নূরী, তোমার সন্দেহ অহেতুক। যাকে তুমি আমার সঙ্গে দেখেছো সে বিপন্না এক তরুণী। নূরী, সব শুনলে তুমি কিছুতেই আমার উপর রাগ বা অভিমান করতে পারবে না। সে আমাকে 'ভাইজান' বলে ডাকে। সংক্ষেপে বনহুর সখিনা সম্বন্ধে সব খুলে বললো। আরও বললো—নূরী, এই মুহূর্তে আমাকে সপলা গ্রাম ছেড়ে যেতে হচ্ছে।

কোথায় যাবে? চিন্তিত কণ্ঠে বললো নূরী।

নূরী, এরা সাংঘাতিক মানুষ, নারকেল ব্যবসার অজুহাতে এরা ছেলেধরা ব্যবসা চালিয়ে চলেছে। শুধু এরাই নয়, এমনি অনেকগুলো দল আছে যারা দিনের পর দিন শত শত শিশুর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। কি ভয়ঙ্কর, কি সাংঘাতিক এরা! নূরী, এদের শায়েস্তা না করা অবধি আমার স্বস্তি নেই।

তুমি যে বলেছিলে কোথায় যাবে?

তা, আজ ভোররাতে একটা ষ্টিমার সপলা ঘাট থেকে সুন্দরবন অভিমুখে ছাড়বে, আমি সেই ষ্টিমারেই যাবো।

আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।

তা হয় না।

কেন?

আমি ষ্টিমারে মাল নিয়ে যাবো, মানে কয়েকটি ছেলে নিয়ে যেতে হবে আমাকে। তারপর অনেক কাজ আছে আমার, পারবে তুমি আমাকে সহায়তা করতে?

তোমার নূরী কোন্‌দিন তোমাকে সহায়তা করেনি বলো? হুর, আমায় তুমি সঙ্গে নিয়ে চলো, পারবো না আমি একা থাকতে এখানে....নূরী বনহুরের বুকের কাছে জামার খানিকটা অংশ চেপে ধরে।

বেশ, তুমিও চলো তবে।

হাঁ, আমাকেও তুমি সঙ্গে নেবার ব্যবস্থা করো।

বেশ চলো।

আনন্দে নূরী বনহুরের কণ্ঠ বেষ্টন করে ওর ওষ্ঠদ্বয়ে চুম্বন রেখা এঁকে দেয়।

বনহুর নিজকে সংযত রাখতে সক্ষম হয় না, নূরীকে গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে।

নূরী বলে—এখানে এসেও তুমি জড়িয়ে পড়লে ছেলেধরার জালে। কোথাও গিয়ে তোমার স্বস্তি নেই হুর?

আজ নতুন তুমি এটা আবিষ্কার করলে নূরী? দোয়া করো, এই জঘন্য ছেলেধরার মায়াজাল যেন ছিন্ন-ভিন্ন করে দিতে পারি। কি ভয়ঙ্কর এই নারকীয় ব্যবসা! নূরী, আমি সুন্দরবনের অন্তরালে যে নারকীয় দৃশ্য স্বচক্ষে দর্শন করেছি তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। যতক্ষণ আমি এদের ধ্বংস করতে না পেরেছি ততক্ষণ আমার বিশ্রাম নেই।

হুর, ভয় হয় এরা যদি তোমার কার্যকলাপ টের পেয়ে তোমাকে হত্যা করে?

সেজন্য চিন্তা করো না নূরী। শুধু প্রার্থনা করো, আমি যেন এই ব্যবসা সমূলে নিঃশেষ করতে পারি।

কিন্তু কি করে তা সম্ভব হুর, কি করে তা সম্ভব? পুলিশ এদের হাতের পুতুল—জানো, আমি সেদিন নিজ কানে যা শুনেছি আর দেখেছি সব অবিশ্বাস্য ব্যাপার। ছেলেধরাদের সাহস কি করে এতো বেড়ে গেছে জানো? শুধু পুলিশদের অমনোযোগিতায়—এরা ওদের পয়সায় বেঁচে আছে.......

নূরী, তুমি যা বলছো সব সত্য কিন্তু আসলে ছোট ছোট অল্প মাইনের পুলিশগুলোই ওদের পয়সা নিয়ে পান-গাঁজা খেয়ে থাকে। আমি এসব পুলিশের সহায়তা নেবো না, আমি যাবো এদের হেড অফিসারের কাছে, তাদের সাহায্যই হবে আমার পাথেয়।

হেড অফিসার—সে আবার কেমন?

পুলিশদের উপরওয়ালা। পয়সা যাদের ন্যায়নীতিচ্যুত করতে পারে না। তুমি যে-সব পুলিশদের কথা শুনেছো তারা তো এক আনা পেলেও পকেটে রাখে—অবশ্য সবাই নয়। অনেক পুলিশ সিপাহী আছে যারা প্রাণ দিয়েও দেশ আর সমাজের সেবা করে যায়, বুঝলে?

আমি তো অতো জানি না হুর।

জানো না কিন্তু মনে রেখো একজন আর দু'জনকে দিয়েই গোটা পৃথিবীর মানুষের বিচার করা যায় না। এই পৃথিবীতে কত মানুষ আছে কত রকম। এক একজন মানুষের এক এক রকম মনোভাব, তাদের কার্যাবলীও

বিভিন্ন ধরনের। নূরী, তুমি একজন বা দু'চার জন পুলিশকে দেখে বা তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করে সমস্ত পুলিশবাহিনীর প্রতি অবিশ্বাস এনো না।

বনহুর নূরীকে যখন কথাগুলো বুঝিয়ে বলছিলো তখন হঠাৎ গুদাম ঘরের দরজা খোলার শব্দ শোনা যায়। কক্ষে প্রবেশ করে আরফান ও আরও একজন কেউ।

বনহুর তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়ে নারকেল স্তূপের আড়ালে। হরি-বেশি নূরী চাদরমুড়ি দিয়ে নাক ডাকাতে থাকে।

সম্মুখ দিয়ে গুদামের চোরা কুঠরী অভিমুখে চলে যায় আরফান উল্লাহ আর পিছনে একজন। নূরী চাদর সরিয়ে উঁকি দেয়। ওদিকের ডিমকরা হ্যারিকেনের আলোতে অস্পষ্ট দেখলো, যে লোকটা আরফানের পিছনে চলেছে সে অন্য কেউ নয়—ঐ দাড়িওয়ালা; নাম তার হামিদ।

আরফানের সঙ্গে হামিদ নারকেল স্তূপের আড়ালে চলে যেতেই বনহুর বেরিয়ে এলো, চুপি চুপি পিছু নিলো ওদের।

এই গভীর রাতে কি করে, কোথা যায় ওরা—দেখবে সে। আরফান আর হামিদ কয়েকটা গুদামঘর পেরিয়ে একেবারে শেষ গুদামে প্রবেশ করলো।

এ গুদামগুলো এমন এক ভাবে তৈরি যে, প্রত্যেকটা গুদামের মধ্য দিয়ে প্রত্যেকটা গুদামে যাতায়াতের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সহসা কেউ এ পথের সন্ধান পাবে না। অসংখ্য নারকেলের স্তূপের আড়ালে এমনভাবে দরজাগুলো লুকানো, কেউ বুঝতে পারবে না সেখানে কোনো দরজা আছে।

এমন কি বনহুরও জানতে পারেনি, এ সব নারকেল স্তূপের ভিতরে গোপনে লুকানো আছে এমন এক একটা দরজা। আরফান উল্লাহ আর হামিদ সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করলো ভিতরে।

বনহুর দরজার আড়ালে লুকিয়ে পড়লো।

পাশের গুদামের মধ্য থেকে শোনা গেলো আরফানের গলা—জে, কেডি, তুমি মালগুলো তৈরি করে রেখো। আজ আবার চারটা মাল চালান যাচ্ছে। ঐ মালগুলোও তৈরি করে রাখবে। আগামী সপ্তাহে এক সঙ্গে বাইশটি মাল ভারতে চালান যাবে। কি বললে? হাঁ, ঠিকভাবে কাজ চালিয়ে যাবে। টাকা-পয়সার ব্যাপারে পরে সব আলোচনা হবে। আমি আর হামিদ মিয়া আগামীকাল এসে পড়বো। কাজে কোনো ভুল যেন না হয়, আচ্ছা গুড্ নাইট......

বনহুর স্পষ্ট বুঝতে পারলো, গভীর রাতে আরফান আর হামিদ চোরা গুদামে নারকেল স্তূপের আড়ালে ওয়ার্লেসে সুন্দরবন ঘাঁটিতে কথাবার্তা আদান-প্রদান করছে। আরও আশ্চর্য হলো বনহুর আরফানের মার্জিত কথা

শুনে। সে এখানে যেভাবে কথা বলে তাতে মনে হয় সে স্বাভাবিক গ্রামবাসীদের মতই একজন, সেইরকম গ্রাম্য ভাষায় আলাপ আলোচনা করে—কিন্তু আসলে সে সুন্দর বাংলা বলতে পারে, মাঝে মাঝে ইংরেজি শব্দও সে ব্যবহার করছিলো।

বনহুর আর দেরি না করে দ্রুত নিজের জায়গায় এসে শুয়ে পড়লো, কিন্তু কান আর দৃষ্টি তার সজাগ রইলো।

একটু পরে আরফান আর হামিদ চলে গেলো তাদের শয্যার অদূরে নারকেল স্তূপের আড়াল দিয়ে সামনের গুদামের দিকে।

আরফান আর হামিদের পদশব্দ মিশে যেতেই বনহুর উঠে পড়লো, আবার এলো নূরীর পাশে, ফিস ফিস করে বললো—নূরী, আজকেই আমাকে যেতে হবে।

নূরী আচমকা চমকে উঠলো যেন, বললো—কোথায়?

আরফান উল্লাহর মাল চালান যাচ্ছে সুন্দরবনে—সেই ষ্টিমারে যাবো।

আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।

সম্ভব নয়।

কেন?

আমি এবার সুন্দরবন পর্যন্ত যাবো না, মাঝপথে নেমে পড়বো—ধরো চালনা বন্দরে, সেখান থেকে চলে যাবো খুলনায়।

খুলনা?

হাঁ, সেখানে গিয়ে আমি খুলনা পুলিশ সুপারের সঙ্গে যোগাযোগ করবো, না হলে সব পণ্ড হয়ে যাবে। অনেকগুলো ছেলেমেয়ে এখনও সুন্দরবনে ছেলেধরাদের গোপন ঘাঁটিতে আটকা আছে, তাদের শরীরে নানারকম অস্ত্রোপচার করে পঙ্গু করে ফেলা হয়েছে। নূরী বিলম্ব হলে এসব শিশুদের আমি রক্ষা করতে পারবো না। শয়তানের দল আগামী সপ্তাহেই তাদের এইসব জমানো মাল ভারতে চালান দেবে।

ভারতে? বলো কি হুর?

শুধু ভারতেই নয়, এমনি কত শত সন্তানদের এরা দেশ হতে দেশান্তরে চালান দিয়ে এক ভয়ঙ্কর ব্যবসার ফাঁদ পেতে বসেছে। নূরী, তুমি সঙ্গে থাকলে আমি অসুবিধায় পড়বো।

বেশ, তুমি যাও কিন্তু আমি?

তুমি ঢাকায় ফিরে যাও লক্ষ্মীটি।

না, তুমি ফিরে না আসা অবধি আমি কোথাও যাবো না হুর।

তাহলে এখানেই থেকে যাও, সাবধানে থেকো।

আচ্ছা। হুর, তুমিও সাবধানে চলো! নূরী বনহুরের গণ্ডে এঁকে দেয় একটা গভীর প্রীতি উপহার যা তাকে সংগ্রামে আরও উৎসাহী আর উদ্দীপ্ত করে তুলবে।

বলে বনহুর—এবার তুমি হরি আর আমি ভোলা, কেমন?

নূরী বনহুরের নাকে মৃদু চাপ দিয়ে হেসে বলে—আচ্ছা।

বনহুর নিজের বিছানায় শুয়ে পড়তেই হাবলু এসে পড়ে। বনহুর ভাবে, ভাগ্যিস ঠিকমত এসে পড়েছিলো নইলে হাবলু এসে দেখতো সে নেই— বিছানা শূন্য, সাড়া পড়ে যেতো গুদামে।

হাবলুকে দেখেই বনহুর নাক ডাকাতে শুরু করলো।

হাবলুও এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেছে, হাই তুলে নিদ্রালস কণ্ঠে ডাকলো—ভোলা বাই,ও ভোলা বাই উঠো......

বনহুর গা মোড়া দিয়ে উঠে বললো—কে—হাবলু?

হ' তোমাগো মালিক ডাকতাছে।

আমাগো ক্যান?

জানমু ক্যামনে? যহন যা তার মনে অয় তহনই তাই করণ লাগে। চলো দেহি কি হুকুম তার।

হাবলু না জানলেও জানে বনহুর, কি জন্য তাকে ডাকা হচ্ছে—এই মুহূর্তে মাল নিয়ে নৌকা ভাসাতে হবে। রওয়ানা দিতে হবে সুন্দরবন অভিমুখে।

বনহুর হাবলুর সঙ্গে আরফান উল্লাহর সামনে এসে দাঁড়ালো—মালিক, আমাগো ডাকছেন?

হ ভোলানাথ, তুমি লয়া আর হাবলু আজ ভোর রাতেই রওয়ানা দিবা। রাজু গাড়ি ঠিক কইর‍্যাছে, মাল গাড়িতেই লইয়া যাইবা। ঘাটে ষ্টিমার আছে, 'মালিক' ষ্টিমার, বুঝলা?

বুঝছি, তা এবার নাও যাইবো না?

না, এবার ষ্টিমার যাইবো। আমি ফরেষ্ট অফিস থেইক্যা পারমিশন লইয়া রাখছি। নাও-এ গেলে বহুৎ দেরি অয়, মাল তাড়াতাড়ি পৌঁছাইতে পারবো না কাজেই ষ্টিমার যাইবো।

বেশ, আমি এহনই মাল লইয়া বিদায় হই মালিক।

যাও দেহ গাড়িতে মাল উঠছে কিনা।

ভোলা আর বাবলু বেরিয়ে যায়। গুদামের পিছন দিকে কদম গাছের নীচে একটা গরুর গাড়ি দাঁড়িয়েছিলো। সেই গাড়ির পাশে গিয়ে দাঁড়ায় ভোলা আর হাবলু। তারা পৌঁছে দেখে, লয়া আর বুধা চারটি ফুটফুটে বালককে গাড়িতে উঠিয়ে শুইয়ে দিলো। তারপর গাড়ির পিছনে এবং সামনে বেশ কিছুটা নারকেল স্তূপ করে সাজিয়ে রাখলো। পাকা হাতের কাজ, একটুও বুঝা যাবে না ছৈ-এর ভিতরে কোনো মানব শিশু আছে।

গাড়ি ছাড়লো। লয়া আর ভোলা গাড়িতে উঠে বসলো। হাবলু আর বুধা হেটেই রওয়ানা দিলো, হেইয়া জোয়ান চেহারা হাবলু আর বুধার, লাঠি হাতে তারা সম্মুখে এগুতে লাগলো। রাজু গাড়ি চালাচ্ছে।

ভোলার কাপড়ের নীচে আজ শুধু ছোরাই নেই, গুলীভরা একটি রিভলভারও আছে। এ রিভলভার সে কৌশলে সংগ্রহ করে নিয়েছে। আরফান উল্লাহর গোপন কুটির মধ্যে মেঝেতে পোতা আছে একটা মস্তবড় লৌহসিন্দুক; সেই সিন্দুকের মধ্যে স্তরে স্তরে সাজানো আছে অগণিত রিভলভার, পিস্তল, সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরা, খাঁড়া—এমনি অনেকরকম অস্ত্র। সেদিন বনহুর গোপনে আরফান উল্লাহর বালিশের তলা থেকে চাবির গোছা নিয়ে কৌশলে খুলে ফেলে লৌহসিন্দুক। একটা রিভলভার আর কিছু গুলী তুলে নেয়, তারপর পুনরায় চাবির গোছা রেখে দেয় আরফান উল্লাহর বালিশের তলায়।

বনহুরের অসাধ্য কিছু নেই, সে অতি সহজেই এ কাজ সমাধা করে নেয়। সাধারণ মাঝির ড্রেসের নীচে তার লুকোনো আছে দুটো মারাত্মক অস্ত্র।

গাড়ি পৌঁছলো একসময় সপলাঘাটে।

মাল উঠিয়ে নেওয়া হলো।

ভোলানাথ, লয়া, বুধা আর হাবলু ষ্টিমারে উঠে পড়লো। এবার ষ্টিমারের খোলসে ছোট একটা খুপড়ীর মধ্যে লুকিয়ে রাখলো ছেলে চারটিকে। এসব খুপড়ীর মধ্যে মুরগী রাখা হয় বা হয়ে থাকে।

রাজু গাড়ি নিয়ে ফিরে চললো।

ষ্টিমারখানা এবার নদীপথে দ্রুত ছুটে চললো।

বনহুর ষ্টিমারের রেলিং-এ ঠেশ দিয়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলো সামনের দিকে, তার মাথার মধ্যে তখন নানারকম চিন্তার উদ্ভব হচ্ছে। রাত ক্রমান্বয়ে শেষ হয়ে আসছে, ভোর হতে আর কিছু বিলম্ব।

লয়া, বুধা আর হাবলু ষ্টিমারের ডেকে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়েছে, এরি মধ্যে নাক ডাকছে ওদের। নিশ্চিন্ত এখন ওরা, কারণ চালনা বন্দরে না পৌঁছানো পর্যন্ত ওদের কোনো কাজ নেই।

ভোলানাথ শুধু জেগে আছে, তার চোখে ঘুম নেই। ডেকের রেলিং-এ ঠেশ দিয়ে সিগারেটের পর সিগারেট নিঃশেষ করে চলেছে। ভাবছে, এই চারটি ছেলেকে সুন্দরবন ঘাটিতে পৌঁছে দেবার সঙ্গে সঙ্গে এদের চোখ বন্ধ করে দেওয়া হবে কিংবা হাত-পা ভেঙ্গে খোঁড়া করে দেওয়া হবে—না না, তা হতে দেবে না সে, আর সুযোগ দেওয়া চলবে না এদের। কাল আরফান উল্লাহ আর হামিদ মিয়া সুন্দরবন ঘাঁটিতে মিলিত হবে দলের সঙ্গে—এই সুযোগ নষ্ট করবে না ভোলানাথ।

ভোলানাথ বার বার তাকাচ্ছে অদূরে ঘুমন্ত লয়া, বুধা আর হাবলুর দিকে, এই মুহূর্তে সে এদের শেষ করে ফেলতে পারে কিন্তু এতো সহজেই

এদের শেষ করবে না। সমুচিত শাস্তি হওয়া দরকার, শুধু ছেলেধরাই নয়, ছেলেধরাদের যারা সাহায্য করে তাদেরও মৃত্যুদন্ড দেওয়া উচিত।

ভোলা ডেকের ওপাশ থেকে নিয়ে এলো কয়েকগাছা দড়ি আর কয়েকটা গামছা। তারপর হাতের অগ্নিদগ্ধ সিগারেটটা নদীগর্ভে নিক্ষেপ করে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। চারিদিকে তাকিয়ে দেখে নিলো—আর কেউ আশেপাশে নেই। ষ্টিমারের চালক এবং তার সহকারী দু'জন নীচে ইঞ্জিন-কামরায় কাজ করছে।

ষ্টিমারখানা খুব বড় নয়, কাজেই বেশি লোকজনের প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া বুদ্ধিমান আরফান উল্লাহ তার নিতান্ত বিশ্বাসী জন ছাড়া এ ষ্টিমারে কাউকে স্থান দেয় না। এটা শুধু তার কারবারী 'মালিক' ষ্টিমার।

আজ 'মালিক' ষ্টিমারে নারকেলের স্তূপ পূর্বের মত না থাকলেও কিছুকিছু আছে। যাতে বাইরের লোক দেখলে মনে করে ষ্টিমার-খানা নারকেল ব্যবসায়ী ষ্টিমার—যাত্রীবাহী নয়।

ভোলা দড়ি আর গামছা নিয়ে এসে দাঁড়ালো। চট করে লয়ার মুখে গামছা গুঁজে দড়ি দিয়ে বেশ করে বেঁধে ফেললো। মুখের ঘোরে আচমকা লয়া এতোটুকু শব্দ করার মত সুযোগ পেলো না। ভোলানাথ লয়াকে বেঁধে শুইয়ে রেখে এবার বুধা ও হাবলুকে বেঁধে ফেললো! অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কাজ করলো ভোলা।

লয়া, বুধা আর হাবলুর মুখ বাঁধা, হাত দু'খানা পিছমোড়া করে বাঁধা, পা দু'খানাও মজবুত করে বেঁধে ফেলেছে। মুখের ভিতরে গামছার খানিকটা অংশ গুঁজে দেওয়ায় কোনো শব্দ করতে পারছে না ওরা।

প্রথমে ওরা ভেবেছিলো বোধ হয় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে, কিন্তু পরক্ষণেই টের পেলো—স্বপ্ন নয় সত্য। কে যেন অন্ধকারে তাদের এ অবস্থা করেছে।

ভোর হবার এখনও কিছুটা বাকি। অন্ধকার তাই জমাট বেঁধে উঠেছে।

ভোলানাথ এবার এক একজনকে কাঁধে উঠিয়ে একটা ক্যাবিনে নিয়ে মেঝেতে শুইয়ে দিলো। লয়া, বুধা আর হাবলুকে ক্যাবিনে রেখে ক্যাবিনের দরজায় তালা আটকিয়ে ফেললো।

দুর্দান্ত শক্তিশালী লয়া, বুধা আর হাবলুকে ভোলার কাবু করতে কিছুমাত্র বেগ পেতে হলো না। ভোলানাথ ওদের তিনজনকে ক্যাবিনে আটকে রেখে ষ্টিমারের সিঁড়ি বেয়ে নীচে ইঞ্জিন কামরায় এসে দাঁড়ালো।

চালক ফিরে তাকাতেই তার পিলে চমকে গেলো। ভোলানাথের হস্তে উদ্যত রিভলভার দেখে হতবাক হয়ে পড়লো, তারপর সামলে নিয়ে বললো—কি ব্যাপার ভোলা ভাই?

সহকারীদ্বয় এবং ফায়ারম্যানটি ভয়ে থর থর করে কাঁপতে শুরু করলো।

হঠাৎ সহকারীদ্বয়ের একজন চিৎকার করে ডাকলো—লয়া বাই, লয়া বাই, ভোলা বাই ক্ষেইপ্যা গ্যাছে, আইসো—আইসো......

সহকারীটির চিৎকার শুনে হাসি পেলো ভোলানাথ-বেশি বনহুরের কিন্তু গম্ভীর কণ্ঠে বললো—ইউসুফ, ষ্টিমার খুলনা অভিমুখে নিয়ে চলো।

ষ্টিমার চালকের নাম ইউসুফ ছিলো, কাজেই ভোলা তাকে নাম ধরে আদেশ দিলো।

ভোলার কথায় বললো ইউসুফ—মালিক সুন্দরবন যাইতে কইছে, খুলনা যাইমু ক্যান্ ভোলা বাই?

যেতে হবে—আমার আদেশ।

তুমি কি সত্যি সত্যি ক্ষ্যাপছো ভোলা বাই? জানো, মালিক জানতে পারলে কি অইবো?

জানি, আমি যা বলি শোন।

পুনরায় সহকারীদ্বয়ের একজন চিৎকার করে উঠে—লয়া, বুধা, তোমরা কই গ্যালা, ও হাবলু বাই.....

ভোলানাথ ওর গলা টিপে ধরে—খবরদার, চিৎকার করলে মারা পড়বে। লয়া, বুধা, হাবলু কেউ আর আসবে না।

চালক অস্ফুট কণ্ঠে বলে—এ কি কথা কও ভোলা বাই! ওদের খুন করছো? আইবো না ক্যান?

হাঁ, ওদের খুন করেছি। আমার কথা না শুনলে তোমাদেরও খুন করবো।

একি কথা কও ভোলা বাই!

শোন খুলনা বন্দরে সোজা ষ্টিমার নিয়ে চলো।

ক্যান?

কাজ আছে।

কইবা না?

হাঁ, পরে বলবো।

মালিক যদি জানতে পারে?

আমি এখন মালিক; আমার হুকুম না মানলে মরবে, বুঝলে?

ভোলাবাই একি কথা কও!

বেশি কথা বলো না ইউসুফ, সোজা খুলনা বন্দর অভিমুখে ষ্টিমার নিয়ে চলো।

আচ্ছা, যা কও তাই করমু, তাও প্রাণে মাইরো না......ইউসুফ ভোলার হস্তস্থিত রিভলভারের ভয়ে খুলনা অভিমুখে ষ্টিমার চালাতে শুরু করলো।

ভোলা নিজেও রইলো ইউসুফের পাশে। দক্ষিণ হস্তে তার গুলীভরা রিভলভার।

ইউসুফের সহকারীদ্বয় ও ফায়ারম্যান নিজ নিজ কাজ করে চললো, সকলেরই মুখ বিমর্ষ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। ভোলানাথ তাহলে তাদের আসল অনুচর বা দলের লোক নয়, সে নিশ্চয়ই পুলিশের লোক।

ইউসুফ ভয় পেয়ে বললো—আমারে হাজতে দিও না ভোলা বাই, তুমি যা কইব্যা তাই করমু।

ইউসুফের বিপন্ন অবস্থা দেখে তার সহকারীদ্বয় ও ফায়ারম্যান কাঁপতে শুরু করেছে, কারো মুখে কোনো কথা নেই। ভয়ে ভয়ে নিজ নিজ কাজ সমাধা করে চলেছে তারা।

❑

খুলনা বন্দরে ষ্টিমার পৌঁছলে ভোলানাথ ইউসুফ আর তার সহকারীদ্বয় ও ফায়ারম্যানকে একটা ক্যাবিনে আটকে রেখে তালা বন্ধ করে দিলো তারপর বন্দরে নেমে সেখানে থেকে খুলনা পুলিশ অফিসে ফোন করলো। শুধু তাই নয়, পুলিশ সুপারের নিকটেও জানালো ভোলানাথ, এক্ষুণি খুলনা বন্দরে তিন নম্বর ফ্লাটে চলে আসুন, সঙ্গে পুলিশ বাহিনী প্রস্তুত হয়ে আসবেন। আমি ভোলানাথ এখানেই অপেক্ষা করছি।

খুলনা পুলিশ সুপার ফোনটা অবহেলা করতে পারলেন না। তিনি স্বয়ং পুলিশ ফোর্স নিয়ে হাজির হলেন।

ভোলানাথ প্রতীক্ষা করেছিলো, পুলিশ বাহিনীসহ পুলিশ সুপারকে দেখে চিনতে তার ভুল হলো না। ভোলানাথ পুলিশ ভ্যানের পাশে এসে পুলিশ সুপারকে আদাব দিলো—স্যার এসেছেন?

তুমিই ফোন করেছিলে? তোমার নাম ভোলানাথ? বললেন পুলিশ সুপার স্বয়ং।

ভোলা বললো—হাঁ স্যার, আমিই ফোন করেছিলাম। আমার নামই ভোলানাথ।

কিন্তু যেভাবে তুমি ফোন করেছো তা অন্যায়।

স্যার, বেশি ভাববার সময় পাইনি, কারণ ছেলেধরা ষ্টিমার আমি পাকড়াও করেছি।

হঠাৎ বন্দরে পুলিশ ফোর্সসহ পুলিশ সুপারকে দেখে বন্দরের লোকজন ভড়কে গেলো, দূর থেকে তারা শুধু লক্ষ্য করতে লাগলো, কেউ এগুনোর সাহস পেলো না।

ভোলার বেশ দেখে পুলিশ সুপার প্রথমে তার সঙ্গে তাচ্ছিল্যভাবে কথা বলছিলেন কিন্তু যখন ভালভাবে আলাপ হলো তখন তিনি ভোলাকে সাধারণ জন মনে করতে পারলেন না। পুলিশ সুপার মনে করলেন, নিশ্চয়ই এই মাঝি-বেশি লোকটি কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হবেন, কোন সি আই ডি অফিসারও হতে পারেন। পুলিশ সুপার অবহেলা করতে পারলেন না ভোলানাথকে।

তারপর যখন ভোলানাথসহ পুলিশ সুপার এবং পুলিশ ফোর্স 'মালিক' ষ্টিমারে উঠে পড়লেন তখন বিস্ময়ে স্তব্ধ হলেন পুলিশ সুপার।

ভোলানাথ দেখালো—এই দেখুন স্যার, এই যে হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় যারা এই ক্যাবিনে বন্দী রয়েছে, এরা ছেলেধরা দলের অনুচর। সবসময় এরা ছেলেধরা সর্দারকে সহায়তা করে থাকে। আর ঐ কামরায় যাদের আটকে রেখেছি তারা এই ষ্টিমার চালক ও তার সহকারীত্রয়। ভোলানাথ-বেশি বনহুর এবার পুলিশ সুপারকে নীচে নিয়ে যায়, তারপর যে ছোট্ট খুপড়ীটার মধ্যে ছেলে চারটিকে আটক করে রেখেছিলো দেখালো।

পুলিশ সুপার মিঃ রহমানের চক্ষুস্থির, তিনি স্বচক্ষে যা দেখলেন তা অতি বিস্ময়কর ব্যাপার। একসঙ্গে চারটি ছেলেকে যেভাবে বন্দী করে রাখা হয়েছে তা মর্মান্তিক। পুলিশ সুপার জীবনে এমন দৃশ্য কোনোদিন দেখেননি, ছেলেধরাগণ কিভাবে ছেলেদের আটকে রাখে তাও তিনি জানেন না। আজ তাঁর নতুন এক অভিজ্ঞতার সঞ্চার হলো। তিনি বলে উঠলেন—কি সাংঘাতিক ব্যাপার!

বনহুর বললো স্যার, আপনাকে পুলিশফোর্সসহ আহ্বান জানানোর উদ্দেশ্য শুধু ষ্টিমারের এই ক'জনাকেই গ্রেফতার নয়, এদের আসল ঘাঁটি ঘেরাও করে সর্দার ও সমস্ত দলবলকে গ্রেফতার করা। স্যার, আপনি পুলিশ ফোর্সসহ আমার সঙ্গে এই ষ্টিমারে চলুন।

পুলিশ সুপারের সঙ্গে সমস্ত পুলিশ ফোর্স অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়েই এসেছিলো—আর বিলম্ব না করে ষ্টিমারের চালকদের মুক্ত করে দেয় বনহুর, কঠিন আদেশের স্বরে বলে—ইউসুফ, যদি রেহাই পেতে চাও তবে সুন্দরবন তোমাদের ঘাঁটিতে ষ্টিমার নিয়ে চলো। কোনোরকম চালাকি করলে মরবে, বুঝলে?

ভয়ে কাঁপছিলো ইউসুফ ও তার সহকারীত্রয়। শুধু ভোলাকে দেখে নয়, অসংখ্য সশস্ত্র পুলিশ ফোর্স দেখে তাদের পিলে চমকে গিয়েছিলো। ভয়-বিহবল কণ্ঠে বললো ইউসুফ—আপনারা যা বলবেন তাই করবো। আমাদের তবু ছেড়ে দেবেন দয়া করে।

হাঁ, তোমাদের মুক্তিই দেওয়া হবে। বললেন পুলিশ সুপার স্বয়ং।

ইউসুফ ও সহকারীত্রয় ষ্টিমারের ইঞ্জিনকক্ষে প্রবেশ করে ষ্টিমার ছাড়বার আয়োজন করলো।

দু'জন অস্ত্রধারী পুলিশকে তাদের ইঞ্জিনকক্ষে পাহারায় নিযুক্ত রাখা হলো।

বনহুর পুলিশ সুপার মিঃ রহমানকে বললো—স্যার, পুলিশ বাহিনীকে ষ্টিমারের খোলসের মধ্যে গোপনে লুকিয়ে থাকতে হবে, আপনি ক্যাবিনে বিশ্রাম করবেন। ষ্টিমারের মধ্যে পুলিশের লোক আছে—এ কথা বাইরের কেউ যেন টের না পায়।

মিঃ রহমান বনহুরের বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে মনে মনে খুশি হলেন, বনহুরের কথামত কাজ করলেন তিনি। সমস্ত পুলিশ ফোর্স ষ্টিমারের মধ্যে আত্মগোপন করে রইলো।

স্বয়ং পুলিশ সুপার নিজেও গোপনে লুকিয়ে রইলেন।

বনহুর ভোলানাথের বেশে চললো।

ষ্টিমার খুলনা বন্দর ত্যাগ করে সুন্দরবন অভিমুখে রওয়ানা দিলো। যখন ষ্টিমার খুলনা বন্দর ত্যাগ করলো তখন বেলা শেষ প্রহর। চালনা বন্দরে পৌঁছতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে গেলো।

বনহুরের উদ্দেশ্য পরদিন ঘাঁটিতে পৌঁছানো, কারণ আরফান উল্লাহ আর হামিদ ওয়্যারলেসে সুন্দরবন ঘাঁটিতে জানিয়ে দিয়েছে—তারা পরদিন এসে পৌঁছে যাবে। কাজেই বনহুর সেই মুহূর্তে পুলিশ ফোর্স নিয়ে আক্রমণ চালাবে ছেলেধরার ঘাঁটির উপর।

চালনা বন্দরে ষ্টিমার থামিয়ে ফরেষ্ট অফিস থেকে পারমিশন সংগ্রহ করে নিলো ভোলা। অবশ্য পূর্ব হতেই এখানে আরফান উল্লাহর লোক অপেক্ষা করছিলো, তাকেও ভোলা উঠিয়ে নিলো ষ্টিমারে।

ষ্টিমার যখন আসার কথা তার চেয়ে দেড়গুণ সময় পরে ষ্টিমার আসায় অবাক হয়ে গিয়েছিলো আরফানের অনুচর বাদলা। ভোলাকে সে খুটিয়ে খুটিয়ে জিজ্ঞাসা করছিলো ষ্টিমার পৌঁছতে এতো বিলম্ব হলো কেন।

ভোলা বললো—ষ্টিমারে চলো সব কমু। আমরা পুলিশের হাতে ধরা পড়তে গিয়া বাইচ্যা গেছি।

বলো কি?

হ' ভাগ্যিস ওরা ষ্টিমারে খোঁজ লইতে উইঠ্যা পড়েনি। ষ্টিমারে চলো, সব জানতে পারবা।

ভোলার সঙ্গে বাদলা উঠে পড়লো ষ্টিমারে। এতোক্ষণ ষ্টিমারের বিলম্ব দেখে সে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলো। এবার আনন্দে শিস্ দিতে দিতে ষ্টিমারের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যায়।

ভোলাকে লক্ষ্য করে বলে—ভোলা বাই, লয়া-বুধা-হাবলু বাই এরা কই গ্যালো? এগোরে দেখতাছি না ক্যান?

দেখবা দেখবা, হগলে ভিতরে আছে।

কি করতাছে ওরা?

চলো না ভিতরে।

যে ক্যাবিনে লয়া মিয়া, বুধা আর হাবলুকে পিছমোড়া করে বেঁধে রাখা হয়েছিলো সেই ক্যাবিনে বাদলাকে ঠেলে দেয় ভোলা দ্যাহো ওরা এইহানে ক্যামন আরামে হুইয়া আছে।

বিস্ময়ে আড়ষ্ট হয়ে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠে—একি দেখতাছি ভোলা বাই....

কিন্তু কথা শেষ হয় না, পুলিশ সুপার পিস্তল বাগিয়ে ধরেন—খবরদার নড়ো না।

ভোলা দ্রুতহস্তে বেঁধে ফেলে বাদলাকে, তারপর মুখে রুমালখানা গুঁজে দেয়।

বাদলা কিছু বুঝবার আগেই কাজ শেষ হয়ে যায়। ওকেও ফেলে রেখে দেয় লয়া, বুধা আর হাবলুর কাছে, তারপর ক্যাবিন বন্ধ করে রাখে ভোলা ভালভাবে।

সুন্দরবনের মধ্যে দিয়ে কইর্যা নদী বয়ে এগুচ্ছে ষ্টিমার 'মালিক'। ডেকে দাঁড়িয়ে শুধু ভোলানাথ আর পুলিশ সুপার মিঃ রহমান। নদীর দু'তীরে সুন্দরী গাছগুলো ঝাপসা অন্ধকারের মত লাগছে। জ্যোৎস্না রাত, কিন্তু আকাশে মেঘ থাকায় সব কেমন অস্পষ্ট লাগছিলো।

জঙ্গলের মধ্য হতে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে ফেউ-এর ডাক। শিয়ালের ডাক বড় একটা শোনা যাচ্ছে না। ষ্টিমারখানা মাঝনদী দিয়ে এগুচ্ছিলো তাই হিংস্র জন্তুর তেমন কোনো ভয় ছিলো না।

নদীর পানিতে সময় সময় শুঁ শুঁ ভেসে উঠেই আবার ডুব দিচ্ছিলো। কখনও বা কুমীর অলস দেহটা ভাসিয়ে এগুচ্ছিলো ধীরে ধীরে। জ্যোৎস্নার আলো তেমন না থাকলেও বেশ বোঝা যাচ্ছিলো।

ডেকে রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলো ভোলানাথ-বেশি বনহুর আর পুলিশ সুপার মিঃ রহমান।

কইর্যা নদীর আঁকাবাঁকা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে আছে সমস্ত সুন্দরবনময়। এসব শাখার নামকরণও আছে ভিন্ন ভিন্ন!

এবার ষ্টিমারখানার স্পীড কমিয়ে দেওয়ার জন্য বনহুর নির্দেশ দিলো ইউসুফকে, আরও জানিয়ে দিলো যেভাবে এগুলে শব্দ না হয় সেইভাবে ষ্টিমারখানাকে ঘাঁটিতে নিয়ে চলো।

প্রাণের ভয় কার না আছে।

ইউসুফ বুঝতে পেরেছে, এবার তাদের ছেলেচুরি ব্যবসার পরিসমাপ্তি। এতোদিন সে এই পাপময় জঘন্য ব্যবসার বাহক হিসাবে কাজ করে এসেছে—আজ তার প্রায়শ্চিত্ত। নাছোড়বান্দার মতই ইউসুফ আজ ভোলানাথের কথামত কাজ করে যাচ্ছে—তবু যদি উদ্ধার পায় সে—এই আশায়।

অত্যন্ত গোপনে সতর্কতার সঙ্গে সুন্দরবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলো 'মালিক' ষ্টিমার, ঘাঁটির অনতিদূরে এসে নদীর কিনারে ষ্টিমার ভিড়লো।

তখন সবেমাত্র ভোর হয়েছে।

সুন্দরবনের সুন্দরী গাছের শাখায় শাখায় জেগে উঠেছে পাখীর কাকলী। প্রভাতের মৃদুমন্দ হাওয়া ধীরে ধীরে বয়ে চলেছে। স্নিগ্ধ শীতল পরিবেশ। কে জানে এই সুন্দরবনের মধ্যে লুকিয়ে আছে কত হিংস্র প্রাণী।

ভোলানাথ ডেকে এসে দাঁড়ালো। স্বয়ং পুলিশ সুপার রিভলভার হস্তে দাঁড়িয়ে রইলেন আড়ালে। অন্যান্য পুলিশ ফোর্স অতিসন্তর্পণে ষ্টিমারের অভ্যন্তরে আত্মগোপন করে আছে। কেউ বাইরে থেকে যেন টের না পায় ষ্টিমারে পুলিশ আছে।

লয়া, বুধা, হাবলু আর বাদলকে পূর্বের সেই কক্ষেই হাত-পা-মুখ বন্ধন অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে। ইউসুফ আর তার সহকারীত্রয় ইঞ্জিনকক্ষে পুলিশ পাহারায় বন্দী রয়েছে।

আর অবুঝ অসহায় শিশু বালক চারজনকে ছোট খাঁচার মত খুপ্ড়ী থেকে বের করে এনে যত্নসহকারে একটা ক্যাবিনে রাখা হয়েছিলো। তাদের ডাব এবং কিছু খাবার খাওয়ানো হয়েছিলো। স্বয়ং পুলিশ সুপার এবং ভোলানাথ ওদের মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছিলো। তাদের আশ্বাস দিয়ে বলছিলো—তোমরা আবার তোমাদের আব্বা-আম্মাদের কাছে ফিরে যেতে পারবে। আমরা তোমাদের উদ্ধার করার জন্যই চেষ্টা করছি। নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়ে তবে ওদের বুঝিয়ে স্থির রাখা হলো।

এবার ভোলানাথ মিঃ রহমানকে বললো—স্যার, সমস্ত পুলিশ বাহিনী এই ভোরের অন্ধকারে সুন্দরবনের মধ্যে লুকিয়ে পড়তে হবে গাছের আড়ালে না লুকিয়ে গাছের ডালে আশ্রয় নিতে হবে সকলের এবং যতদূর সম্ভব গাছের ডালপাতার আড়ালে চুপচাপ বসে থাকতে হবে। কোনোরকমে ছেলেধরার দল যেন টের না পায় যে পুলিশ সুন্দরবনে প্রবেশ করছে।

হাঁ, যা বলছো ঠিক্ কথাই বলছো ভোলানাথ। সেইভাবেই কাজ করতে হবে।

স্যার, কয়েক ঘন্টার মধ্যে ছেলেধরা সর্দার ও তার সহকারী এসে পড়বে, আপনারা ততক্ষণ অপেক্ষা করবেন। তার পূর্বে যা করতে হয় আমিই করবো। স্যার, যতক্ষণ আমি হুইসেলে শব্দ না করবো ততক্ষণ আপনারা নিজ নিজ জায়গা থেকে বের হবেন না যেন।

বেশ, তোমার কথামতই এসেছি, শেষ পর্যন্ত তোমার কথা অনুযায়ীই কাজ করবো ভোলানাথ। যদি ছেলেধরার দলও তাদের সর্দারকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হই তাহলে তোমাকে আমরা পুরস্কৃত করবো।

হাসলো ভোলানাথ।

পুলিশ সুপার ভোরের ঝাপসা আলোতে বনমধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন—চারিদিক কাঠের স্তূপ দেখছি, ব্যাপার কি?

বললো ভোলানাথ—কাঠের ব্যবসার নাম করেই এসব বদমাইশের দল সুন্দরবনের অভ্যন্তরে ছেলেচুরি ব্যবসা চালিয়ে চলেছে। শুধু তাই নয় এরা গোলপাতা বোঝাই নৌকার মধ্যে ছেলে চালান দিয়ে থাকে, যেমন কাঠবোঝাই নৌকার খোলের মধ্যে অজ্ঞান করে লুকিয়ে রাখা হয় ছেলে-মেয়েদের তারপর তাদের নিয়ে যাওয়া হয় দেশ হতে দেশান্তরে।

মিঃ রহমান ভোলানাথের কথাগুলো অবাক হয়ে শুনছিলেন।

ভোলানাথ বললো—স্যার, এখন একটুও বিলম্ব করার সময় নেই, আপনি পুলিশবাহিনীসহ এই বনের মধ্যে নেমে পড়ুন। ঐ যে পায়েচলা পথ দেখছেন ঐ পথেই কিছুদূর এগুলে পাওয়া যাবে ছেলেধরাদের সুন্দরবন—ঘাঁটি। এখানেই এরা কাঠের ব্যবসার নাম করে ছেলে-হরণ ব্যবসা চালিয়ে চলেছে।

পুলিশ সুপারের আদেশে পুলিশ বাহিনী সেই বনের মধ্যে নেমে পড়লো, কিন্তু নামবার পূর্বে গহন বন দেখে ভড়কে যাচ্ছিলো মনে মনে!

ভোলানাথ সাহস দিয়ে বললো—এখানে বনটা যতই ঘন হোক হিংস্র জন্তুর আনাগোনা কম, কারণ এখানে সাক্ষাতে লোকের সমাগম না হলেও অসাক্ষাতে সব সময় লোকের আগমন হয়ে থাকে। কাজেই ভয় তেমন নেই, তবুও সাবধান থাকা প্রয়োজন।

পুলিশ সুপারের আদেশে ইউসুফ ও সহকারীত্রয়কে ইঞ্জিনকক্ষের পাশের কামরায় বন্দী করে পুলিশ পাহারা রাখা হলো। লয়া, বৃধা, হাবলু আর বাদলার অবস্থা কাহিল, না মরে কোনোরকমে বেঁচে আছে এই যা। তাদের ক্যাবিনের মধ্যেও একজন পুলিশ মোতায়েন রাখা হলো। তাছাড়াও কয়েকজন পুলিশ রাইফেল নিয়ে লুকিয়ে রইলো ষ্টিমারের মধ্যে। বাইরে থেকে এতোটুকু সন্দেহ করবার জো নেই।

পুলিশবাহিনীসহ পুলিশ সুপার স্বয়ং ছেলেধরাদের তাঁবুর পাশে গাছের ডালপাতার আড়ালে আত্মগোপন করে রইলেন। সেকি এক মহা আশঙ্কাপূর্ণ মুহূর্ত। পুলিশ সুপার তাঁবুর অদূরে একটা ঝাপড়া গাছের ডালপাতার মধ্যে লুকিয়ে লক্ষ্য রাখলেন।

তাঁবুর মধ্যে নিশ্চিন্ত মনে সবাই ঘুমিয়ে আছে। তাঁবুর চারপাশে কাঠের স্তূপ। অসংখ্য সুন্দরী কাঠ টুকরা করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে তাঁবুর চারপাশে। তাঁবুর সম্মুখভাগে খানিকটা ফাঁকা তাঁবুতে প্রবেশের পথ সেটা।

তাঁবুর সম্মুখে অগ্নিকুন্ডটা সমস্ত রাত ধরে জ্বলে জ্বলে এখন নিভে এসেছে।

বনের মধ্যে অদূরস্থ কোনো স্থান থেকে শোনা যাচ্ছে জংলী মোরগের ডাক।

ভোলানাথ ষ্টিমারের ডেকে দাঁড়িয়ে হুইসেলে ফুঁদিলো। একবার—দু'বার—তিন বার। ঠিক ঐ রকম একটা শব্দ শোনা গেলো তাঁবুর মধ্যে পরপর তিন বার।

গাছের শাখায় পাতার আড়ালে বসে পুলিশ সুপার মিঃ রহমান বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে নিপুণভাবে দেখতে লাগলেন। তিনি হুইসেলের শব্দ শুনে ভালভাবে তাঁবুর দিকে দৃষ্টি ফেরালেন।

তাঁবুর ভিতর হতে চারজন বলিষ্ঠ চেহারার লোক কয়েকগাছা দড়ি হাতে বেরিয়ে এলো। চলতে লাগলো বনের মধ্যে দিয়ে নদীর দিকে যেদিকে ষ্টীমার খানা নোঙর করা আছে।

ভোলা পূর্ব হতেই বালক চারটিকে ষ্টিমার থেকে নীচে নামিয়ে এনেছিলো, এবার লোক চারজন আসতেই সে বালক চারজনকে তুলে দিলো তাদের হাতে।

বালক চারজনকে ওরা দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললো তারপর নিয়ে চললো তাঁবুর দিকে।

চারজনের মধ্যে যে লোকটা বেশ মাতব্বর গোছের সে বললো—লয়া, বুধা, এরা কই? অগো তো দেখতাছিনা।

বললো ভোলা—ঘুমাইতাছে। গোটারাত জাইগ্যা আইছে কিনা। আর আজ ভোরেই বা আইলা ক্যান?

তা অনেক কান্ড অইয়া গ্যাছে সব পরে জানতে পারবা, এহন অগো নিয়া চলো।

বালক চারটিকে হাত বেঁধে বনের মধ্যে দিয়ে তাঁবুর দিকে যেতে লাগলো ওরা।

ভোলানাথ ষ্টিমারেই রয়ে গেলো কারণ তার উদ্দেশ্য ছেলেধরা সর্দার আরফান ও তার সহচর হামিদকে অভ্যর্থনা জানানো।

পূর্বাকাশ রাঙা করে সূর্য উঁকি দিলো। সুন্দরবনের সুন্দরী গাছের ফাঁকে ফাঁকে ছড়িয়ে পড়লো সোনালী আলোর আভা। নদীর পানিতে সূর্যের আলোকরশ্মি পড়ে রূপালী পর্দার মত লাগছে। ভোলানাথ রেলিং-এ ভর দিয়ে তাকিয়ে রইলো পূর্বাকাশের দিকে। এমনভাবে কোনোদিন সে সূর্যোদয় উপভোগ করেনি। আজ প্রাণভরে দেখতে লাগলো ভোলানাথ এ দৃশ্য।

মুগ্ধ নয়নে ভোলানাথ তাকিয়েছিলো, ঠিক সেই মুহূর্তে একটা মোটর-বোটের শব্দ শোনা গেলো। সম্বিৎ ফিরে এলো ভোলানাথের। নিশ্চয়ই এ মোটর-বোট আরফান উল্লাহ আর হামিদের।

সন্দেহ মিথ্যা নয় ভোলার, অল্পক্ষণেই একটা মোটর-বোট দৃষ্টিগোচর হলো তার।

ভোলা এবার দ্রুত ষ্টিমার ত্যাগ করে নীচে নেমে মোটর-বোটখানার অপেক্ষা করতে লাগলো।

অল্পক্ষণের মধ্যেই এসে পড়লো মোটর-বোটখানা, নিকটবর্তী হতেই দেখলো মোটর-বোটে রয়েছে আরফান উল্লাহ স্বয়ং এবং হামিদ ও আরও দু'দুজন তার সহচর।

ভোলাকে দেখে তারা নেমে পড়লো এবং জিজ্ঞাসা করলো ঠিকভাবে পৌঁছতে পেরেছিলো কিনা?

ভোলানাথ জানালো—হ, আমরা বালো ভাবেই ঘাঁটিতে পৌঁছাইতে পারছি।

হুইসেল দিলো ভোলা পরপর দু'বার তাঁবুর মধ্য হতে ভদ্রবেশি দু'জন লোক বেরিয়ে দ্রুত এগুতে লাগলো বনের মধ্যে সরুপথ ধরে নদীর ধারের দিকে।

আরফান উল্লাহ ও হামিদ আর তাদের সহচরদ্বয়কে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে চললো ঘাঁটিতে। তাঁবুর মধ্যে যখন ওরা প্রবেশ করলো তখন ভোলাও প্রবেশ করলো তাদের সঙ্গে তাঁবুর মধ্যে।

তাঁবুর আশেপাশে বৃক্ষশাখায় বসে সব লক্ষ্য করছিলো পুলিশ বাহিনী। পুলিশ সুপার নিজেও চোখে ব্যাইনোকুলার লাগিয়ে সব দেখছিলেন, প্রতীক্ষা করছিলেন ভোলানাথের হুইসেলের একটি শব্দের।

এ কথাটা পূর্ব হতেই পুলিশ সুপারের সঙ্গে আলোচনা করে রেখেছিলো ভোলানাথ। বলেছিলো সে—স্যার, আমি যখন একবার টানা হুইসেল বাজাবো ঠিক সেই মুহূর্তে আপনারা নিজ নিজ স্থান হতে বেরিয়ে পড়বেন।

পুলিশ সুপার ও পুলিশবাহিনী সতর্কভাবে কান পেতে অপেক্ষা করছিলো। যেমন হিংস্র জন্তু শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পূর্ব মুহূর্তে ওৎ পেতে বসে থাকে ঠিক তেমনিভাবে বসে আছে তারা।

তাঁবুর মধ্যে গোল বৈঠক বসলো।

আরফান উল্লাহ, হামিদ ও তাঁবুর মধ্যে ভদ্রবেশি আরও চারজন বসলো হিসাব-নিকাশ নিয়ে।

ইতিমধ্যে চা-নাস্তা কফি চললো।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে এবার ভালভাবে হিসাব-নিকাশে মনোযোগ দিলো—এতোদিন কত মাল কোথায় কিভাবে চালান গেছে, কত টাকা নগদ পাওয়া গেছে, কত বাকি আছে, সব নিয়ে আলোচনা চলতে লাগলো।

এই তো সুযোগ, ভোলানাথ তাঁবুর বাইরে এসে খুব জোরে হুইসেলে ফুঁ দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ বাহিনী যে যেখানে লুকিয়ে ছিলো সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লো, পুলিশ সুপার মিঃ রহমানও লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন, তারপর উদ্যত রিভলভার হস্তে ছুটলেন তাঁবুর দিকে।

এতো দ্রুত এ কাজ সমাধা হলো যে তাঁবুর ভিতরে ছেলেধরার দল প্রস্তুত হবার পূর্বেই পুলিশবাহিনী তাঁবুর চারপাশে ঘিরে ফেললো।

ভিতরে প্রবেশ করলো ভোলানাথ প্রথমে, তারপর মিঃ রহমান!

ভোলানাথের হস্তে রিভলভার এবং তার পিছনে পুলিশ সুপারকে উদ্যত রিভলভার হস্তে দেখে প্রথমে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো ছেলেধরার দল, বিশেষ করে তাদের বিশ্বাসী ভোলানাথকে পুলিশ অফিসারের সঙ্গে রিভলভার হস্তে দেখে থ'মেরে গেলো ওরা কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বললো আরফান উল্লাহ—ভোলা, একি করতাছো? কিছুইতো বুঝতে পারতাছি না?

ততক্ষণে হামিদ খাতাপত্র লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করছিলো।

মিঃ রহমান গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—খবরদার একটি কাগজও লুকোতে চেষ্টা করো না। এবার মিঃ রহমান পকেট থেকে একটা বাঁশি বের করে ফুঁ দিলেন সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন রাইফেলধারী পুলিশ প্রবেশ করে দাঁড়ালো।

পুলিশ সুপার এবার বললেন—এদের একটিও যেন বাইরে না বের হতে পারে লক্ষ্য রাখো এবং প্রত্যেকের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দাও।

পুলিশ সুপার আদেশ দেবার সঙ্গে সঙ্গে আরফান একখানা সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরা বের করে ঝাঁপিয়ে পড়লো ভোলার উপর।

ভোলা খপ করে ধরে ফেললো আরফানের ছোরাসহ দক্ষিণ হাতখানা, পর মুহূর্তেই প্রচন্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিলো তার নাকের উপর।

আরফান উল্লাহ হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো তাঁবুর মেঝেতে।

ভোলানাথ আরফানের উঠে দাঁড়াবার পূর্বেই ওর জামার ঘাড় ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে নিলো, তারপর আবার এক ঘুষি বসিয়ে দিলো ওর চোয়ালে।

ঘুরপাক খেয়ে পড়ে গেলো আবার আরফান উল্লাহ, ওর হাতের ছোরাখানা ছিটকে পড়লো কয়েক হাত দূরে।

ভোলানাথের অসীম শক্তি এবং বুদ্ধিকৌশল দেখে পুলিশ সুপার বিস্মিত হলেন। তিনি হামিদ ও অন্যান্য দলবলকে গ্রেপ্তার করে ফেললেন। পুলিশবাহিনী ততক্ষণে প্রত্যেকের হাতে হাতকড়া লাগিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলো।

ভোলানাথ আরফানের বুকে রিভলবার চেপে ধরলো—একচুল নড়বে না কিন্তু।

আরফান অগত্যা সোজা হয়ে দাঁড়ালো, ভোলার দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত পিষতে লাগলো।

ভোলা বললো—স্যার, এই বেটা ছেলেধরাদের সর্দার।

হাতকড়া পরিয়ে দাও এর হাতে।

আরফানের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেওয়া হলো।

তাঁবুর মধ্যে যে কয়জন ছেলেধরা সর্দার মহাজন ছিলো সবাইকে হাতকড়া পরিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে ফেলা হলো। আরফান ফাঁদে পড়া ব্যাঘ্রের মত ফোঁস ফোঁস করতে লাগলো। আজ যেন সে দেখতে পেয়েছে ভোলানাথের আসল রূপ।

এবার বললো ভোলানাথ—স্যার, আসুন আমার সঙ্গে।

মিঃ রহমান অনুসরণ করলেন ভোলানাথকে।

কিছুদূর অগ্রসর হতেই তাঁবুর মধ্যে একটা কাঠের স্তূপ পরিলক্ষিত হলো। মিঃ রহমানসহ কাঠের স্তূপের ওপাশে এগুতেই নজরে পড়লো—কিছু পূর্বের সেই চারজন বালককে হাত বেঁধে বসিয়ে রাখা হয়েছে। বালক চারজন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। এক এক জনের চোখ টকটকে লাল হয়ে ফুলে উঠেছে।

মিঃ রহমান বললো—এই চারটি ছেলেকে এরা চুরি করেছে?

বললো ভোলানাথ—স্যার, এই চারটি আজকের মাল। আগের মাল এরা কোনো গোপন স্থানে সরিয়ে ফেলেছে বলে মনে হচ্ছে।

মিঃ রহমান দু'জন পুলিশসহ নিজেও অনুসন্ধান চালালো।

ভোলানাথ নিজেও অত্যন্ত মনোযোগসহকারে খুঁজতে শুরু করলো, ব্যাপার কি, আগের সেই ছেলেমেয়েগুলো গেলো কোথায়। সে তো জানে, একসঙ্গে অনেকগুলো মাল চালান যাবে এবার, নিজ কানে গতকাল শুনেছে আরফান উল্লাহর ওয়্যারলেসের বক্তব্য।

কিন্তু তাঁবুর মধ্যে তন্ন তন্ন করে সন্ধান চালিয়েও পূর্বের সেই ছেলেগুলোর কোনোই হদিস পাওয়া গেলো না। ঘাবড়ালো না তবু ভোলানাথ এবার সে হঠাৎ তাঁবুর ভদ্রবেশি একটি মহাজনের বুকে রিভলবার চেপে ধরলো—শীগ্‌গির বলো, কোথায় সেই ছেলেগুলো বলো?

গভীর কণ্ঠে বললো ভদ্রলোকটা—এ চারটি ছেলেই এখানে আছে, এবং তাদের তুমিই এনেছো।

কি বললে, এই চারটি ছেলেই এখানে আছে বা ছিলো?

হাঁ।

মিথ্যাবাদী কোথাকার! তারপর পুলিশ সুপারের দিকে লক্ষ্য করে বললো—স্যার, সহজে এরা গোপন রহস্য প্রকাশ করবে না, আপনি যদি হুকুম দেন আমি যেভাবে খুশি এদের কথা আদায় করে নেবো?

হাঁ ভোলানাথ, তুমি যেভাবে ইচ্ছা এদের কথা এবং সবকিছু প্রকাশ করে নাও। তুমি তো জানো ছেলে ধরাদের শাস্তি মৃত্যুদন্ড। কাজেই তুমি যেভাবে খুশি কথা আদায় করে নিতে পারো।

উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ভোলানাথের মুখমন্ডল কারণ সে মিঃ রহমানের সম্মুখে এদের শাস্তি দিতে কুণ্ঠা বোধ করছিলো। এবার ভোলা ভদ্রলোকটির দক্ষিণ হাতখানা রিভলভারের সম্মুখে ধরে গুলী বিদ্ধ করলো—কি এখনও চুপ থাকবে?

দক্ষিণ হস্তে গুলীবিদ্ধ হওয়ায় লোকটা আর্তনাদ করে উঠলো,থেতলে গেলো ওর হাতখানা, তাজা লাল রক্তে রাঙা হয়ে উঠলো তাঁবুর মেঝে। ভোলানাথের কথায় বললো—আমি জানি না, আমাকে মাফ করো, ভোলা, আমাকে মাফ করো---

এবার তোমার বাম হস্তখানা গুলীবিদ্ধ করে পঙ্গু করে দেবো বলো মালগুলো কোথায়?

আরফান বলে উঠলো—জান নিলেও আমরা বলবো না। তুমি আমাদের হত্যা করো।

পুলিশ সুপার মিঃ রহমান নিজেও ভোলানাথের কার্যকলাপ দেখে বিস্মিত-হতবাক হয়ে পড়েছেন যেন। তিনি অবাক হয়ে দেখছেন। পুলিশ বাহিনীকে আদেশ দিয়েছেন একটি প্রাণী যেন পালাতে না পারে।

তাঁবুর মধ্যে তখন ছেলেধরা দল কোনোরকম প্রস্তুত ছিলো না বলেই গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে, নইলে একটিকেও পাকড়াও করা যেতো না। এতোটুকু যদি জানতে পারতো ওরা তাহলে হাওয়ায় উড়ে যেতো কিন্তু ভোলানাথের নিপুণ সতর্কতার জন্যই তা সফল হয়নি।

ভোলানাথ এবার ছেলেধরা দলের মধ্যে হতে ডাক্তারকে টেনে আনলো সম্মুখে দাঁতে দাঁত পিষে বললো—ডাক্তার, এতোদিন অসংখ্য অসহায় বালক-বালিকার অঙ্গ তুমি নিজ হস্তে পঙ্গু করেছো আজ আমি তোমাকে ক্ষমা করবো না। তোমার মুখ দিয়েই জানতে চাই, বলো কোথায় তোমাদের তৈরি মালগুলো জমা করে রেখেছো। গর্জন করে উঠলো

ভোলানাথ—বলো নইলে তোমার সমস্ত দেহ ক্ষতবিক্ষত করে লবণ মেখে দেবো।

গম্ভীর হয়ে বললো ডাক্তার—জানি না।

জানো না? ভোলানাথ মুহূর্ত বিলম্ব না ডাক্তারের একখানা হাত গুলীবিদ্ধ করলো।

উঃ বাবাগো! ডাক্তার বাম হস্তে দক্ষিণ হস্তখানা চেপে ধরলো। রক্তে রাঙা হয়ে উঠলো ডাক্তারের দেহের বসন।

বললো ভোলা—যে হস্ত দিয়ে তুমি অসহায় শিশুদের অঙ্গে অস্ত্রোপচার করেছিলে সেই হস্ত আমি খতম করলাম বলো কোথায় তারা?

ডাক্তার ব্যথাকরুণ চোখে তাকালো আরফান উল্লাহ আর হামিদের দিকে।

ভোলানাথ বললো—ওদের দিকে তাকিয়ে কোনোই ফল হবে না বন্ধু, যদি জীবন বাঁচাতে চাও তবে বলো ওরা কোথায়?

এবার ডাক্তার বলে উঠলো—বলবো না। বলবো না আমি।

বলবে না? কথা শেষ করেই ভোলানাথ ডাক্তারের আর এক খানা হাতে গুলীবিদ্ধ করলে।

হাতখানা দুমড়ে গেলো একেবারে থেতলে যাওয়া কলাগাছের মত।

এবার ডাক্তার ভূতলে গড়িয়ে পড়ে গেলো, রক্তে ভেসে গেলো মেঝেটা। চিৎকার করে আর্তনাদ শুরু করলো।

হেসে উঠলো বনহুর, সে আর নিজকে সংযত রাখতে সক্ষম হলো না, তার মধ্যে জেগে উঠেছে দস্যুপ্রাণ—হাঃ হাঃ হাঃ, ডাক্তার এবার তুমি উপলব্ধি করতে সক্ষম হচ্ছো? এই হস্তদ্বয় দ্বারা তুমি যখন নিষ্পাপ শিশুগুলোর দেহে অস্ত্রচালনা করতে তখন তারা কি নির্মম বেদনায় আর্তনাদ করতো? তখন কি এতোটুকু মায়া হতো না তোমার মনে শয়তান?

বনহুর টেনে দাঁড় করিয়ে দেয় ডাক্তারকে—উঠে, বলো কোথায় সেই অসহায় শিশুগুলো?

এবার ডাক্তার মরিয়া হয়ে উঠেছে, রক্তের স্রোত বইছে তার হাত দু'খানা দিয়ে। চিরদিনের জন্য বিনষ্ট হয়ে গেছে ডাক্তারের হাত দু'খানা।

বনহুর রিভলভার চেপে ধরলো এবার ডাক্তারের পায়ে—পা দু'খানা যদি হারাতে না চাও তবে বলো?

বনহুরের গুরুগম্ভীর কঠিন কণ্ঠে তাঁবুর মধ্যে যেন বাজ পড়লো। থরথর করে কেঁপে উঠলো তাঁবুর অভ্যন্তর। পুলিশ বাহিনী সবাই বিস্মিত হতবাক, কারো মুখে কোনো কথা নেই। পুলিশ সুপার নিজেও স্তব্ধ হয়ে দেখছেন।

ডাক্তারের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়েছে, এবার সে চুপ থাকতে পারলো না বললো—চলো আমি বলছি---

ভোলানাথ-বেশি বনহুর রিভলভারখানা চেপে ধরলো ডাক্তারের পিঠে— চলো, কোনোরকম চাতুরি করতে যেও না, বুঝলে?

ডাক্তার কোনো কথা বললো না, রোদন করতে করতে এগুলো।

আরফান চিৎকার করে উঠলো—ডাক্তার।

বনহুর গুতা মারলো ডাক্তারের পিঠে—চলো।

পুলিশ সুপার স্বয়ং ভোলনাথ আর ডাক্তারকে অনুসরণ করলেন।

ডাক্তার রক্তাক্ত দেহে এগুতে লাগলো, তার পরিধেয় বসন রাঙা হয়ে উঠেছে। তাঁবুর শেষ অংশে যে কাঠের স্তূপ ছিলো সেই দিকে এগুতে লাগলো ডাক্তার।

বনহুর রিভলভার উদ্যত করে রেখেছে, কোনোরকম শয়তানি করলেই তার গুলী গিয়ে বিদ্ধ হবে ডাক্তারের দেহে। কাজেই ডাক্তার বিবর্ণ ফ্যাকশে হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছে আর রোদন করছে।

কাঠের স্তূপের পাশে এসে দাঁড়ালো ডাক্তার, বললো—এই কাঠ সরিয়ে ফেলো।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ সুপারের নির্দেশে পুলিশগণ কাঠের স্তূপ সরিয়ে ফেললো। দেখা গেলো, সেই স্থানে মাটির নীচে একটা সুড়ঙ্গপথ।

পুলিশ সুপার হতবাক—তিনি বিস্ময়সূচক শব্দ করলেন—আশ্চর্য!

বনহুর হেসে বললো—শুধু আশ্চর্যই নয় স্যার, একটু পরে যা দেখবেন তা কল্পনাতীত। আসুন আমার সঙ্গে---

ডাক্তার বেদনায় অস্থির হয়ে পড়েছিলো, সে আর এগুতে পারলো না, বসে পড়লো ধপ্ করে ভূতলে।

বনহুর আর পুলিশ সুপার সুড়ঙ্গপথ বেয়ে নীচে নামতে লাগলো। অন্ধকার সুড়ঙ্গমধ্যে হাতড়ে কিছুদূর নেমে পড়তেই আলোকচ্ছটা দেখতে পেলো তারা। ভিতরে লণ্ঠন জ্বলছে, বনহুর আর পুলিশ সুপার এসে দাঁড়ালো একটা প্রশস্ত জায়গায়, চমকে উঠলেন মিঃ রহমান—অনেকগুলো বালক-বালিকার ক্রন্দনের চাপা শব্দ কানে আসছে।

বনহুর সেই ক্রন্দনের শব্দ লক্ষ্য করে এগুলো, মিঃ রহমান সহ এসে পড়লো আর একটি কক্ষের মত খুপড়ীর মধ্যে। বনহুর সম্মুখস্থ প্রশস্ত কক্ষমধ্য হতে লণ্ঠনটা হাতে উঠিয়ে এনেছিলো। লণ্ঠনের আলোতে দেখলো, অনেকগুলো ছেলে-মেয়ে মেঝেতে বসে আছে খেজুর পাতার চাটাই-এর উপরে। কেউ কেউ কাঁদছে, কেউ বা শুধু আছে তখনও মাথার নীচে হাত রেখে।

লণ্ঠনের আলোতে দেখলো বনহুর আর মিঃ রহমান—কি মর্মান্তিক করুণ দৃশ্য! কারো চোখ দুটোই অন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কারো বা একটা

চোখ অন্ধ করা হয়েছে। কারো বা হাত একখানা সম্পূর্ণ কেটে ফেলা হয়েছে, কারো বা পায়ের হাড় কেটে বের করে ফেলা হয়েছে। কতকগুলো সুস্থ দেহেই আছে কিন্তু তাদের অবস্থাও শোচনীয়।

কিছুক্ষণ পুলিশ সুপার মিঃ রহমানের মুখ দিয়ে কোনো কথা উচ্চারণ হলো না। তিনি আজ প্রায় বিশ বছর ধরে পুলিশের চাকরি করে আসছেন, কিন্তু এমন রহস্যময় কান্ড তিনি ইতিপূর্বে কখনও দেখেননি। একবার ছেলেধরাদের দু'জনকে গ্রেফতার করেছিলেন একটি চোরাই ছেলেসহ, তাদের জেল হয়েছিলো। কিন্তু ছেলেধরাদের যে ঘাঁটি বা এই ধরনের ভয়ঙ্কর একটা ব্যবসা আছে তা তিনি কোনোদিন ভাবতে পারেননি। আজ স্বচক্ষে তিনি দেখছেন এই দৃশ্য।

কয়েকজন পুলিশের সহায়তায় বন্দী বালক-বালিকাগণকে উপরে উঠিয়ে আনা হলো। প্রায় চল্লিশটি শিশু বালক-বালিকা মওজুত ছিলো ছেলেধরাদের সুন্দরবন ঘাঁটিতে। এসব ছেলে-মেয়েগুলোকে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আমদানী করা হয়েছে।

বনহুর বললো—স্যার আজ যদি ঠিক্‌ভাবে আপনি আমাকে সাহায্য করতে সক্ষম না হতেন তবে আমি হয়তো এই ছেলেধরা দলকে সায়েস্তা করতে পারতাম না। স্যার, অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে।

পুলিশ সুপার বনহুরের হাত মুঠায় চেপে ধরলেন—এই ভয়ঙ্কর ছেলেধরা দলকে গ্রেপ্তার করতে আপনি যে আমাকে সহায়তা করলেন সে জন্য আমি কৃতজ্ঞ। বলুন আপনি কে? কি আপনার পরিচয়? নিশ্চয়ই আপনি সাধারণ ভোলানাথ নন, ভোলানাথের অন্তরালে আপনার আসল পরিচয় ঢাকা আছে, আমি তা বুঝতে পেরেছি।

পুলিশ সুপার ভোলানাথকে এতোক্ষণ 'তুমি' বলে সম্বোধন করে আসছিলেন এবার তিনি তাকে সামান্য 'তুমি' সম্বোধন করতে পারলেন না।

হেসে বললো বনহুর—আমি সাধারণ একজন মানুষ। আমার নাম আলম, ঢাকায় থাকি—এই পর্যন্ত।

পুলিশ সুপার বনহুরের কথায় খুব খুশি হতে পারলেন না। তিনি মনে করলেন, নিশ্চয়ই এ ব্যাক্তি কোনো সি আই ডি অফিসার কিন্তু সে নিজের সুনাম চায় না, সেই কারণেই হয়তো নিজকে গোপন রাখতে চায়।

বললো বনহুর—আজকেই এই ছেলেগুলো বিদেশে চালান হয়ে যেতো ভাগ্য যে আমরা ঠিকভাবে কাজ করতে সক্ষম হয়েছি।

মিঃ রহমান আরফান উল্লাহসহ ছেলেধরা দলকে গ্রেফতার করে বনহুরের নির্দেশে ষ্টিমারে ফিরে এলেন। আসার সময় ছেলেধরাদের ঘাঁটি থেকে ওয়্যারলেস ও সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে চললেন। এইসব কাগজপত্রের

মধ্যে রয়েছে তাদের হিসাব নিকাশ। কত ছেলে তাদের আমদানী হয়েছে, কত দেশ-বিদেশে চালান গেছে, কত টাকা তারা এতোদিন ছেলেধরা ব্যবসায় উপার্জন করেছে—সব খুঁটিনাটি লেখা আছে এসব খাতাপত্রে।

পুলিশ সুপার মিঃ রহমান, কয়েকজন পুলিশকে সুন্দরবন ছেলেধরাদের ঘাঁটিতে পাহারারত রাখলেন। তিনি এবার বন্দীদের নিয়ে ষ্টিমার 'মালিকে' ফিরে চললেন খুলনা অভিমুখে।

বনহুরও চললো এই ষ্টিমারে।

খুলনায় পৌঁছে ছেলেধরা দলকে হাজতে বন্দী করে তারপর আবার যাবেন তিনি সপ্‌লায়। সেখানে আছে আরফানের নারকেল ব্যবসার আড়ত আর তার কয়েজন অনুচর। এঁদেরও গ্রেফতার করতে হবে।

ভৈরব নদীর বুক চিরে এগিয়ে চলেছে ষ্টিমার 'মালিক'।

আজ নিজ ষ্টিমারে বন্দী হয়ে চলেছে আরফান উল্লাহ ও তার দলবল। অভিজ্ঞ ছেলেধরা আরফান উল্লাহ প্রায় দশ বছর সে এই ব্যবসা করে চলেছে। নারকেল স্তূপের মধ্যে এবং কাঠের নৌকার খোলের ভিতরে, গোলপাতা বোঝাই নৌকার ছৈ—এর আড়ালে অগণিত ছেলে-মেয়েকে সে চালান করেছে দেশ হতে দেশান্তরে কেউ তাকে কোনোদিন সন্দেহ করতে পারেনি আর আজ কিনা তারই অনুচর সেজে ভোলানাথ মাথায় বজ্রাঘাত করলো। আরফান উল্লাহর ইচ্ছা হচ্ছিলো সে নিজের মাংস নিজে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ভক্ষণ করে।

একটা ক্যাবিনের মধ্যে তাদের ঠাসাঠাসি করে বন্দী রাখা হয়েছে। হাত দু'খানা পিছমোড়া করে হাতকড়া লাগানো। কোমরে মোটাসোটা দড়ি বাঁধা। পায়ে শিকল বাঁধা যেন কোনো রকমে পালাতে সক্ষম না হয়।

❑

খুলনায় ছেলেধরা দলকে নামানো হলো। সমস্ত শহরে একটা আশ্চর্যকর সাড়া পড়ে গেলো। লোকে লোকারণ্য ষ্টিমারঘাট। পুলিশ তাদের বাধা দিতে সক্ষম হচ্ছিলো না। সবাই দেখতে চায় এই শয়তান ছেলেধরার দলকে।

ষ্টিমার থেকে যখন সবাইকে বন্ধন অবস্থায় ডেকে নামানো হলো তখন অগণিত জনতা চারপাশ থেকে ঢিল থুথু আর ইট পাটকেল ছুঁড়ে মারতে লাগলো তাদের গায়ে, আর নানারকম কুৎসিত ভাষায় গালাগালি করতে লাগলো।

চারিদিকে পুলিশ পরিবেষ্টিত অবস্থায় ছেলেধরা দলকে খুলনা পুলিশ অফিসে নিয়ে যাওয়া হলো। সাবধানে বন্দী করে রাখা হলো হাজতে।

আর অসহায় শিশু বালক-বালিকাগণকে যত্নসহকারে হসপিটালে রাখা হলো তাদের রীতিমত চিকিৎসার জন্য। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলে বাচ্চাদের নিজ নিজ মা-বাপ আত্মীয় -স্বজনের নিকটে পৌঁছে দেওয়া হবে।

তারপর পুলিশ সুপার মিঃ রহমান পুনরায় নতুন পুলিশ ফোর্স নিয়ে চললেন 'মালিক' ষ্টিমারেই সপ্‌লা বন্দরের দিকে। বনহুরও চললো তাঁর সঙ্গে। মিঃ রহমান বনহুরের সঙ্গে গভীরভাবে বন্ধুত্বের বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছেন। সপলায় পৌঁছানোর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের মধ্যে চললো নানারকম আলোচনা।

পুলিশ সুপার কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করেই বিস্মিত হলেন, বনহুরের বুদ্ধিমত্তা তাঁকে মুগ্ধ করে ফেললো। এর আগে এমন ব্যক্তির সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেছে কিনা সন্দেহ। বনহুরের প্রতিটি কথার মধ্যে ছিলো যুক্তিপূর্ণ ভাবধারা। তিনি মনোযোগ সহকারে শুনছিলেন তার কথাগুলো।

সন্ধ্যায় সপলা বন্দরে ষ্টিমার 'মালিক' পৌঁছে গেলো।

কয়েকজন পুলিশ নিয়ে মিঃ রহমান ও বনহুর এসে হাজির হলো সপলা গ্রামে। আরফান উল্লাহর গুদাম আচমকা ঘেরাও করে ফেললো পুলিশবাহিনী, একটি লোকও যাতে বের হতে না পারে।

আরফান উল্লাহর গুদাম যখন ঘেরাও করা হলো তখন রাত একটা বেজে দশ মিনিট হয়েছিলো। সবাই ঘুমাচ্ছিলো নাক ডাকিয়ে।

মিঃ রহমানের আদেশে প্রত্যেক ব্যক্তির হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেওয়া হলো। হরিও বাদ গেলো না, পুলিশ সবাইকে গ্রেপ্তার করে এক জায়গায় জড়ো করলো।

ওদিকে বনহুর তখন হরির অন্বেষণে গুদাম চষে ফিরছে।

হঠাৎ এসে পড়লো বনহুর বন্দীদের সম্মুখে, হরির দিকে নজর পড়তেই বনহুর চমকে উঠলো, তার হাতেও হাতকড়া লাগানো রয়েছে।

বনহুর বললো—স্যার, এটা আমাদের লোক, মানে আমার চাকর।

ক্ষমা করবেন, আমার পুলিশ বাহিনী একে চিনতে পারেনি।

পুলিশ সুপারের আদেশে হরিকে মুক্ত করে দেওয়া হলো। হরি বনহুরের দিকে তাকিয়ে বললো—হুজুর, কাজ সমাধা হয়েছে তো?

হাঁ হরি, কাজ সমাধা হয়েছে। ছেলেধরা দলকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হয়েছি।

হুজুর, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

বনহুর বললো—স্যার, হরি আমাকে এ ব্যাপারে অনেক সাহায্য করেছে। হরির কাছে আমি কৃতজ্ঞ স্যার।

মিঃ রহমান হরির পিঠ চাপড়ে বললেন—হরি, তোমাকে পুরস্কার দেওয়া হবে।

হাতের মধ্যে হাত কচলায় হরি—হুজুর, আপনাদের মর্জি।

মিঃ রহমান এবার আরফান উল্লাহর বাকি অনুচরগলোকে বন্দী করে নিয়ে ফিরে চললেন খুলনার দিকে।

বনহুর আর হরি মিঃ রহমানকে সপলা ঘাটে বিদায় সম্ভাষণ জানালো এসে।

ষ্টিমারখানা সপলাঘাট ত্যাগ করার পর বললো হরি—কাজ শেষ হলো?

হাঁ নূরী।

কে নূরী?

না না হরি, হাঁ, কাজ শেষ হয়েছে। একটু বাকি আছে তবুও।

কি আবার বাকি ইলো? ছেলেধরা দলবল সব এখন পুলিশের হাতে, সুন্দরবন ঘাঁটিও পুলিশের কবলে।

আছে, একটা কাজ বাকি আছে এখনও।

কি কাজ?

বলবো। চলো সপলা গ্রামে।

না! আমি আর সপলায় যাবোনা।

কিন্তু আমাকে যেতে হবে নূরী।

ফের নূরী বলছো?

কেন, এতো আপত্তি কেন তোমার নাম ধরে ডাকায়?

হোটেলে ফিরে কি অসুবিধায় পড়বে। হঠাৎ যদি নূরী বলে ডেকে বসো তাহলেই হয়েছে।

ও, সেই ভয় বুঝি?

ভয় নয়—লজ্জা।

নূরী, এবার ঢাকায় ফিরে ইন্টারকন্টিনেন্টাল ত্যাগ করে অন্য একটা বাসা ভাড়া করে থাকবো।

কারণ?

কারণ আমি যা করবো তা ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে থেকে সম্ভব হবে না।

বেশ, যা তোমার ভাল লাগে করো।

❑

সপলা গ্রামে ফিরে এলো বনহুর আর নূরী।

গ্রাম্যচাষীর বেশ ত্যাগ করে ভাল জামা কাপড় পরে ভদ্র বেশ ধারণ করলো বনহুর, তারপর নূরীসহ আরফান উল্লাহর বাড়িতে আগমন করলো।

আরফান উল্লাহর গ্রেফতার ব্যাপার নিয়ে সমস্ত বাড়িময় একটা শোকের ছায়া পড়েছে। একজন ভদ্রলোককে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভড়কে গেলো চাকর ছলিম, বললো—কে আপনি? কি চান কন?

আমি সখিনার ভাই আলম।

এ্যাকি কন? আপনি, আপনি সখিনার বাই অন?

হাঁ, তাকে গিয়ে বলো আমি এসেছি।

ছলিম বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলো, শোনা গেলো তার গলা—সহিনা, তোমাগো বাই আইসেছে।

একটু পরে সখিনাসহ ছলিম বেরিয়ে এলো, সখিনা বনহুরকে দেখেই আড়ালে লুকিয়ে পড়লো।

হেসে বললো বনহুর—সখিনা, আমি তোমার আলম ভাই।

ঘোমাটা ফাঁকে তাকালো সখিনা অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা সুন্দর বেশধারী ভদ্রলোকটার দিকে। এ লোকটা কি করে তার সেই আলম ভাই হবে। না না, তার আলম ভাই—সে যে মুখে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি গোঁফ, চুল এলোমলো রুক্ষ, গায়ে জামা-কাপড় ময়লা এবং ছেড়া—আর এ যে অদ্ভুত সুন্দর একটি লোক।

বনহুর বুঝতে পারলো সখিনা তাকে চিনতে পারেনি। এবার সে আরও সরে গেলো বললো—সখিনা তুমি আমার দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখ, আমিই তোমার আলম ভাই। চলো, তোমাকে তোমার পিতার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসি। সখিনা, যার ভয়ে তোমাকে এ বাড়িতে আশ্রয় নিতে হয়েছিলো তাকে আমি পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি।

এতোক্ষণ সখিনার যেন বিশ্বাস হলো, সে ভালভাবে বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো—মাফ করো আমাগো আলম বাই, আমি তোমারে চিনতে পারিনি।

এসো বোন তোমাকে পৌঁছে দি।

বেরিয়ে আসে সখিনা আরফান উল্লাহর বাড়ি থেকে। আজ তার আর কোনো ভয় নেই। যেখানে ছিলো বাঘের ভয় সেখানেই তাকে রাত কাটাতে হয়েছে। শুধু আলম ভাই-এর বুদ্ধির জন্যই বেঁচে গেছে সে শয়তানটার কবল থেকে।

সখিনাকে নিয়ে বনহুর আর নূরী ফিরে এলো সবুর আলীর বাড়িতে।

বৃদ্ধ সবুর আলী কন্যাকে ফিরে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হলো। বনহুরকে প্রাণ ভরে দোয়া দিলো বৃদ্ধা সবুর আলী।

সবুর আলী আর সখিনার কাছে বিদায় নিয়ে ফিরে এলো বনহুর আর নূরী হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে। এতোদিন সে কোথায় ছিলো ম্যানেজার সাহেব এসে জিজ্ঞাসা করলেন।

বনহুর জানালো, তার এক আত্মীয়ের হঠাৎ অসুস্থতার খবর পেয়ে চলে গিয়েছিলো, বলে যাবার মত সময় হয়ে উঠেনি। আত্মীয় সুস্থ হয়ে উঠায় ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছে সে।

সেদিন হোটেলের বাগানে সবুজ দূর্বা ঘাসের উপর বসেছিলো বনহুর। আজ তার দেহে ধবধবে পা জামা আর পাঞ্জাবী পরা রয়েছে। গভীরভাবে বনহুর কিছু চিন্তা করছিলো বসে বসে। হয়তো সেই ছেলেধরা রহস্য ব্যাপার নিয়েই ভাবছিলো সে। আজকের সংবাদপত্রে খবরটা বিরাট আকারে প্রকাশ পেয়েছিলো। এক অজ্ঞাত ভদ্রলোকের সহায়তায় খুলনা পুলিশ সুপার মিঃ রহমান এক দুর্ধর্ষ ছেলেধরা দলকে গ্রেফতারে সক্ষম হয়েছেন। প্রায় চল্লিশটি হারানো ছেলে-মেয়েকে উদ্ধার করা হয়েছে। তারা এখন খুলনা হসপিটালে চিকিৎসাধীন আছে। তাদের শরীর কিছুটা সুস্থ হলেই নিজ নিজ পিতা-মাতা আত্মীয়-স্বজনের নিকেট পৌছে দেওয়া হবে। এইসব কথাই চিন্তা করছিলো বনহুর নির্জনে বসে।

হঠাৎ পিছনে একটা মিষ্টি কণ্ঠস্বর—আপনি একা বসে বসে কি ভাবছেন?

ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় বনহুর সম্পূর্ণ অপরিচিত এক তরুণী ঠিক তার পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আধুনিক তরুণী বটে, পরনে ফিকে আকাশী রং-এর শাড়ি, ব্লাউজ গাঢ় নীল। পায়ে নীল হাইহিল জুতো, গলায় একটা নীল ফিতার বাঁধা বড় লকেট। লকেটখানা বুকের কাছে দুলছে। মাথায় আধুনিক প্যাটার্ণ খোপা বাঁধা, বিরাট খোপাটার বামপাশে মস্ত একটা গোলাপ গোঁজা রয়েছে। দু'কানে জ্বলজ্বল করছে দুটো মূল্যবান রুবী।

বনহুর এক নজরে মেয়েটার আপাদমস্তক লক্ষ্য করে নিয়ে মৃদু হেসে বললো—কি ভাবছি নিজেই জানি না।

মেয়েটি সরে এলো আরও কয়েক পা, ঠিক বনহুরের পাশে এসে ঘনিষ্ঠভাবে বসে পড়লো মনে হলো যেন কতদিনের চেনা মেয়েটি।

বনহুর একটু সরে বসলো মেয়েটির কাছ থেকে।

তরুণীটি হেসে বললো—ক'দিন থেকে ভাবছি আপনার সঙ্গে পরিচয় করবো কিন্তু সুযোগ হয়ে উঠেনি।

বনহুর বাঁকা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো তরুণীর মুখে মনে পড়লো ক'দিন আগে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে এই তরুণীটিকে এরোপ্লেনের মধ্যে দেখেছিলো। তবে অল্প সময়ের জন্য, তাই তেমনভাবে আজ স্মরণ হচ্ছিলো না। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে এসে আবার তার দেখা পাবে, ভাবতে পারেনি বনহুর।

তরুণী বললো—যদি কিছু মনে না করেন তবে আপনার নামটা জানতে পারি কি?

বললো বনহুর—নিশ্চয়ই! আমার নাম আলম।

নামটা তরুণী একবার উচ্চারণ করলো আপন মনেই—আলম। সত্য এ নামটা আমার কাছে খুব প্রিয়। মিঃ আলম, আপনি কতদিন আছেন এখানে?

এসেছি প্রায় সপ্তাহ দুই হলো, থাকবো কিছুদিন।

সত্যি কি যে খুশি হলাম আপনার কথা শুনে।

অবাক হয়ে তাকালো বনহুর —তার থাকা না থাকায় তরুণীর কি আসে যায়। আড়চোখে একবার তরুণীর মুখটা দেখে নিলো সে।

তরুণী বললো—আপনি আমার কথা শুনে নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছেন। মিঃ আলম, জানেন না আমি কত অসহায়া। জীবনে আমার অনেক দুঃখ, ব্যথা-বেদনা।

বনহুর সঙ্কোচিত হয়ে পড়ে, অপরিচিত এক যুবতীর মুখে এমন ধরনের উক্তি অশোভনীয় মনে হয়। তবু নীরব থাকা ছাড়া তেমন কোনো উপায় খুঁজে পায়না সে।

তরুণী বলে চলে—এমন কেউ নেই আমার যার কাছে বসে মনের দুঃখ প্রকাশ করবো।

মনে মনে প্রমাদ গুণলো বনহুর। তবু ভাগ্যি যে হরি বেশি নূরী আজ হোটেলে নেই, সে তার কয়েজন বয় সঙ্গীসহ নিউমার্কেটে বেড়াতে গেছে। হোটেলে বয় সেজে থাকতে হলে ওদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে না চলে উপায় নেই। তাই নূরী সব সময় ওদের কথায় কাজ করে, তবে নিজকে সামলে রেখেই চলাফেরা করে সে।

বললো এবার বনহুর—আমার কাছে মনের দুঃখ ব্যথা প্রকাশ করে তেমন কোনো ফল হবে বলে মনে করি না।

কিন্তু মিঃ আলম, আমি আপনাকে অনেকখানি বিশ্বাস করি।

কারণ? ভ্রূ কুচকে বললো বনহুর।

কারণ আপনি যেমন একা নিঃসঙ্গ আমিও ঠিক তেমনি।

আপনার কথা আমি---

মানে বুঝতে পারছেন না, এইতো? জানেন আমার প্রাণে কত ব্যথা?

তা আমি কেমন করে জানবো? তাছাড়া আমি জেনেই বা কি উপকার করতে পারবো আপনার?

পারবেন। পারবেন মিঃ আলম। কই এতোক্ষণ হলো আলাপ করছি আমার নামটাতো জিজ্ঞাসা করলেন না?

হাঁ, ভুল হয়েছে। বলুন কি নাম ধরে ডাকবো আপনাকে?

মিসেস শোহেলী বেগম। আপনি আমাকে শোহেলী বলেই ডাকবেন।

বনহুর মনে করেছিলো তরুণী অবিবাহিতা, এবং সেই কারণেই সে তার পাশে এসেছে তার সঙ্গ কামনা করে কিন্তু---

কি ভাবছেন মিঃ আলম?

ভাবছি আপনি বিবাহিতা হয়েও পিতার স্নেহের বন্ধনকে আজও এড়াতে পারেননি?

কে আমার পিতা?

কেন, আপনার সঙ্গে যে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে দেখেছিলাম তিনি কি---

আমার স্বামী।

আপনার স্বামী।

হাঁ মিঃ আলম, ঐ বৃদ্ধা আমার স্বামী---একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে তরুণী, তারপর বেদনা-ভরা কণ্ঠে বলে—মিঃ আলম, আমি বড় নিঃসঙ্গ তাই আপনার মত একজন সঙ্গী পেতে চাই।

এতোক্ষণে বনহুর বুঝতে পারলো তার হেয়ালীপূর্ণ কথাগুলোর মানে। বললো—আপনি বুঝি এই হোটেলেই উঠেছেন মিসেস শোহেলী?

মিসেস নয়, আপনি আমাকে শুধু শোহেলী বলেই ডাকবেন।

আমি তাতেই খুশি হবো বেশি।

বেশ, তাই হবে। আচ্ছা উঠি আজ, কেমন?

বসুন না আর একটু?

একটু নিউমার্কেট যাবো কিনা।

খুশি হলো মিসেস শোহেলী—আমিও যাবো মিঃ আলম। চলুন না এক সঙ্গেই যাওয়া যাক?

প্রমাদ গুণলো বনহুর, কিন্তু বলে যখন ফেলেছে তখন আর উপায় কি—যেতেই হয়। বললো বনহুর—চলুন যদি আপত্তি না থাকে। কিন্তু আপনার স্বামী?

তিনি হোটেলকক্ষে অচেতন, রাত আটটার পূর্বে তার চেতনা ফিরে আসবে না মিঃ আলম।

তার মানে?

মানে প্রতিদিন মদ না খেলে তার হজম হয় না, এতো বেশি তিনি রোজ পান করেন তার দরুন তার জ্ঞান ফিরতে পুরো আট ঘন্টা লেগে যায়।

আশ্চর্য এই বয়সেও তিনি এইভাবে নেশা করেন?

হাঁ মিঃ আলম। থাক চলুন আর একদিন সবকথা আপনাকে বলবো।

না, আমি আপনার ঘরের কথা শুনতে চাই না মিসেস শোহেলী।

দেখুন আমি বারবার বলছি আমাকে মিসেস বলবেন না।

বেশ চলুন শোহেলী---কিন্তু কেমন বেখাপ্পা লাগছে না কথাটা আপনার কাছে?

মোটেই না। চলুন---

বনহুর এগুলো হোটেলের সম্মুখভাগে যেখানে তার গাড়িখানা পার্ক করা আছে। গাড়ির পাশে এসে দরজা খুলে ধরলো বনহুর—উঠুন।

শোহেলী হাস্যোজ্জ্বল মুখে ড্রাইভ আসনের পাশে বসলো।

বনহুর গাড়ির সম্মুখ দিয়ে ঘুরে ড্রাইভিং আসনে উঠে বসলো। গাড়িতে ষ্টার্ট দিয়ে গাড়িখানা বের করে আনলো রাস্তায়। একবার হাতঘড়িটা দেখে নিলো বনহুর। বেলা পাঁচটা পঁচিশ বেজে গেছে। হরিকে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যেই তার নিউমার্কেট যাওয়া। কিন্তু মিসেস শোহেলীসহ যাওয়াটা তার মনে বাধলো, বিশেষ করে নূরীর কাছে কৈফিয়ৎ দিতে তাকে হিমসিম খেতে হবে।

গাড়িখানা ছুটে চলেছে রাজপথ ধরে।

মিসেস শোহেলীর আনন্দ আর ধরছে না, মিঃ আলমের মত সুন্দর সুপুরুষ একটি লোককে পাশে পেয়ে মন তার ভরে উঠেছে খুশিতে। সব সময় বৃদ্ধ স্বামীর পাশে থাকতে গিয়ে সে যেন হাঁপিয়ে উঠেছে, আজ যেন মুক্তির নিশ্বাস ফেললো।

বনহুর ভাবলো, এখন কি করা তার কর্তব্য? মিসেস শোহেলীকে চট করে এড়ানো কিছুতেই সম্ভব নয়। বনহুর বলে উঠলো—শোহেলী, আপনার যদি আপত্তি না থাকে, চলুন না রমনা পার্কে গিয়ে একটু বসা যাক?

ওঃ তা হলে তো আমার প্রাণ ভরে যাবে।

কেন, নিউমার্কেটে যে কাজ ছিলো বললেন আপনার?

না, তেমন কাজ নয়। থাক, আর একদিন হবে। চলুন না রমনা পার্কে যাই।

বেশ চলুন।

রমনা পার্কের গেটের ভিতরে গাড়ি প্রবেশ করলো বনহুরের। এখানে আরও অনেক গাড়ি পার্ক করা আছে। বনহুর একটি জায়গা বেছে নিয়ে গাড়ি রাখলো।

তারপর গাড়ি থেকে নেমে এগুতে লাগলো বনহুর আর মিসেস শোহেলী।

অন্যান্য ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখছে, এমন জুটি তারা যেন ইতিপূর্বে আর দেখেনি। পাশাপাশি উভয়ে এগিয়ে চলেছে পার্কের পথ ধরে। আরও অনেক পুরুষ-মহিলা শিশু, বালক-বালিকাসহ চলেছে।

বনহুর আর মিসেস শোহেলী নির্জন একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়লো।

বনহুরের উদ্দেশ্য কোনোরকমে শোহেলীকে এড়ানো, কিন্তু কিছুতেই যেন তা সম্ভব হচ্ছে না, যতই ওকে ত্যাগ করার চেষ্টা করছে ততই মিসেস শোহেলী আরও নিবিড় হওয়ার চেষ্টা করছে যেন তার সঙ্গে।

ফ্যাসাদ গুণলো বনহুর।

পাশাপাশি বসে আছে বনহুর আর মিসেস শোহেলী। বেলা শেষের সূর্যাস্তের সোনালী আভা এসে ছড়িয়ে পড়েছে উভয়ের মুখে।

শোহেলী বললো—মিঃ আলম।

বলুন?

আমার জীবন কাহিনী আপনাকে শোনাতে চাই মিঃ আলম।

কি ফল হবে তাতে?

জানি না, কিন্তু আমার সমস্ত মন আপনাকে জানানোর জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে। মিঃ আলম, আপনি আমাকে বলবার সুযোগ দিন।

আমাকে বলে যদি তৃপ্তি পান বলুন? বনহুর একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলো।

মিসেস শোহেলীর মুখমন্ডল অত্যন্ত বেদনা-বিধূর করুণ দেখাচ্ছে। বনহুরের মায়া হলো, সহানুভূতির স্বরে বললো—বলুন মিসেস শোহেলী?

আবার আপনাকে দেখেই বুঝা যায়। বললো বনহুর একরাশ সিগারেটের ধোঁয়ার ফাঁকে।

মিসেস শোহেলী একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলতে শুরু করলো আবার—আমার পিতা একজন গরীব জমিদার ছিলেন নামে শুধু তিনি চৌধুরী ছিলেন। এই চৌধুরী উপাধি তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছিলো যেন এ পৃথিবীতে। সব তাঁর চলে গিয়েছিলো ছিলো শুধু একখানা চুন-বালি খসে পড়া হাড়-জিরজিরে বাড়ি—বাড়ি নয় ইমারত। একদিন হয়তো এই ইমারত বাঈজীর চরণের নুপুর ধ্বনিতে মুখর হয়ে থাকতো। পাইক পেয়াদা আর বরকন্দাজের কলকণ্ঠে হয়তো কান ঝালাপালা হয়ে উঠতো। সিংহদ্বারে নহবতের সুর জনগণের মনে জাগাতো এক অপূর্ব মোহের আবেশ। কিন্তু আমি জন্মে অবধি দেখেছি চৌধুরী বাড়িতে এক করুণ বেদনার ছাপ। ইটের স্তূপের আড়ালে অনাহারে তিল তিল করে ধুকে-মরা একটা পরিবার! মিঃ আলম, আমরা ছিলাম একটি নয়—সাত সাতটি বোন আর পাঁচটি ভাই। আমার বড় ছিলো চারটি বোন, আমি পঞ্চম।

বনহুর মনে মনে বিরক্ত হলেও কান পেতে শুনতে লাগলো। একটি সিগারেট শেষ করে পুনরায় আর একটি ধরালো সে।

মিসেস শোহেলী বলে চলেছে—আমার বয়স যখন সাত বছর তখন আমার উপলব্ধি করার ক্ষমতা হয়েছিলো, আমি দেখেছিলাম আমাদের সংসারের আসল রূপ। বাবা বৃদ্ধ—উপার্জনে অক্ষম; ভাইরা সব ছোট ছোট। আমার বড় বোনগুলোর বয়স অনেক হয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু কারো বিয়ে হয়নি।

যখন ছোট তখন না বুঝলেও আরও কিছুদিন পর বুঝলাম কেন আমার দিদিদের বিয়ে হচ্ছে না। আমাদের বৃদ্ধ এক চাকরানীর মুখে একদিন গোপনে জানতে পারলাম, আমাদের মা যিনি, তিনি এক পতিতার মেয়ে। সুন্দরী রূপসী বলে বাবা তার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করে ঘরে এনেছিলেন কিন্তু সেদিন তিনি বুঝেননি কত বড় ভুল তিনি করেছিলেন। বুঝলেন বিশ বছর পরে আমার বড় বোনের যখন বিয়ে সম্বন্ধ ফিরে গেলো, আর এলো না কোনো দিন। পেটে খাবার নেই, পরনে কাপড় নেই—ঘরে একটি নয়, বারোটি সন্তান।

ক্ষুধার জ্বালা কম নয়, বাবা সব সময় চারিদিকে খাদ্যের অন্বেষণে ছুটোছুটি করে ফিরতেন। মাথার ঘাম পায়ে করে রিক্ত হস্তে ফিরে আসতেন। তখন আমাদের মনের অবস্থা যেন কি হতো তা ভাষায় বুঝানো যায় না।

বনহুরের কাছে মিসেস শোহেলীর কথাগুলো প্রথম বিরক্তিজনক মনে হলেও এখন যেন জানার বাসনা ধীরে ধীরে উঁকি দিয়ে উঠলো। বেলা শেষ হয়ে আসছে খেয়াল নেই তার, শুনে চলেছে বনহুর বিস্ময়ভরা স্তব্ধ মন নিয়ে।

মিসেস শোহেলী বলে যায়—মিঃ আলম ক্ষুধায় কাতর ছোট ছোট ভাই-বোনদের করুণ কান্না দেখে বাবা মাটিতে বসে রোদন করতেন।

বড় বড় বোনগুলো আঁচলে অশ্রু মুছতো শুধু আড়ালে দাঁড়িয়ে মা গাল দিতেন কেন তার মরণ হয় না, কেন ছেলেমেয়েগুলো মরে না, যমকি চোখে দেখে না তাদের —এমনি কত কি। কিছুক্ষণ চুপ রইলো মিসেস শোহেলী হয়তো মনের দুঃখ কিছুটা শান্ত করে নেবার জন্যই সে মাথা নত করে মাটি থেকে দুর্বাঘাসগুলো টেনে ছিঁড়তে লাগলো, তারপর আবার বলতে শুরু করলো—একদিন দেখলাম, একটা লোকের সঙ্গে বাবা বাইরে আড়ালে দাঁড়িয়ে ফিস ফিস করে কিছু বলছে। কেউ যেন তাঁকে দেখে না ফেলে বা তাঁর কথা না শোনে সেইজন্য বারবার তাকাচ্ছিলেন এদিক-সেদিকে। মিঃ আলম, পিতাকে এভাবে কথা বলতে দেখে আমার মনে কেমন সন্দেহ জাগলো, আমি প্রাচীরের আড়ালে আরও সরে এলাম, তাদের কথাবার্তা শুনতে না পেলেও দেখতে পাচ্ছিলাম সব। অবশ্য পিতাকে আমার সন্দেহ

করার মত কিছুই ছিলো না, সন্দেহ হচ্ছিলো যে লোকটার সঙ্গে পিতা কথা বলছিলেন তাকে। তাই আমি সচেনতভাবে লক্ষ্য করছিলাম। দেখলাম লোকটা বাবার হাতে বেশকয়েকটা টাকা গুঁজে দিলো। মিঃ আলম, সেইদিন আমরা পেট পুরে খেতে পেয়েছিলাম। খেয়ে রাতে ঘুমিয়েছি—আজ কতদিন পর এমন করে তৃপ্তি সহকারে খাওয়া, তাই সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলো চেয়ে দেখি বড় দিদি পাশের বিছানায় এলোমেলো বেশে বসে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আর সেই সকাল বেলার লোকটা বেরিয়ে যাচ্ছে ঘর থেকে।

বনহুর আবার দৃষ্টিটা তুলে ধরলো মিসেস শোহেলীর মুখে। অশ্রু ছলছল করছে ওর চোখ দু'খানা। কেমন যেন গম্ভীর হয়ে রইলো কিছু সময় তারপর বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো—এরপর থেকে দিদির ঘরে রোজ আসতে লাগলো লোকটা। বেশ রাত করে আসতো সে। বাবা মাকে ধমকে দিতেন—ওদের সকাল সকাল খাইয়ে শুইয়ে দিও। আমরা ঘুমোতে দেরি করলে বাবা যেন ভীষণ রেগে যেতেন। কাজেই চোখে ঘুম না পেলেও ঘুমের ভান করে পড়ে থাকতাম।

ক্রমে ব্যাপারটা সরে এলো বাড়ির সকলের। এখন আমাদের দু'বেলা দুটো ভাত জুটতে লাগলো। ক্রমান্বয়ে দিন গড়িয়ে যাচ্ছিলো, প্রায় কয়েক মাস কেটে গেছে। হঠাৎ দিদি একদিন বমি করতে শুরু করলো, তারপর মাথা ধরা আজকাল প্রায়ই লেগেই ছিলো দিদির সব সময়।

দিদি অসুস্থ তবু সেই শয়তানের মত লোকটা আসতো যেতো তখন আতো বুঝিনি কেন সে এমন করে রোজ আসে যায়। অনেক ক'টা দিন চলে গেলো—একদিন দিদি মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছে দেখলাম। তখন অনেক রাত আমরা যে ঘরে শুই সেই ঘরের মেঝেতে একটা ছেঁড়া মাদুরের উপর দিদি গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছে। আমাদের বাড়িতে অনেকগুলো ঘর ছিলো বটে কিন্তু ব্যবহার উপযোগী ছিলো মোটে দুটো। একটিতে শুতো বাবা-মা আর কোলের বাচ্চাটা আর দ্বিতীয়টায় ঘুমাতাম আমরা সবাই। বড় একটা খাট ছিলো, সেটাতে পাশাপাশি কোনোরকমে রাত কাটাতাম। বড় দিদি মেজো দিদি এরা ঘুমাতো ওদিকের চৌকিতে। যখন থেকে ঐ লোকটা আসা যাওয়া শুরু করলো তখন থেকে মেজো দিদিও শুতো আমাদের খাটে সেকি কষ্ট হতো আমাদের। কিন্তু বাবার ভয়ে আমরা টু শব্দ করতাম না। অভাবের তাড়নায় বাবা এমন হয়ে পড়েছিলেন যার দরুন বাবার চেহারা আর মেজাজ দুই-ই হয়ে পড়েছিলো রুক্ষ আর কর্কশ।

বড় দিদিরা বাবার সম্মুখে যাওয়ার চেয়ে যমের সম্মুখে যেতেও বুঝি এতো দ্বিধা করতো না। দিদিদের বয়স শেষ হয়ে আসছে তবু কারো বিয়ে

হচ্ছে না—এ যেন তাদের নিজেদেরই দোষ। সব সময় বাবা বিষ নজরে দেখতেন দিদিদের তার সঙ্গে আমাদেরও। ভাইরা সব ছোটছোট আমাদের পায়ের কাছে কোনো রকমে ঘুমাতো। ভাগ্যিস খাটখানা খুব বড় ছিলো তাই রক্ষা, এতোগুলো কোনো রকমে রাত কাটাতাম।

হাঁ, দেখলাম দিদি মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছে। দিদির পাশে কেউ নেই, শুধু মা। আমি দেখলাম, আমার অন্যান্য দিদিরা সবাই জেগে আছে, কিন্তু কেউ কথা বলতে সাহসী হচ্ছে না। সবাই যেন কাঠের পুতুলের মত আরষ্ট হয়ে গেছে।

কয়েকদিন হলো লোকটা আর আসে না। বাবা সব সময় রুক্ষ মেজাজ নিয়ে থাকতেন। পেটেও ক্ষুধার জ্বালা, লণ্ঠনেও তেল নেই।

এক কোনে মিটমিট করে কেরোসিনের ডিবেটা জ্বলছে। ঘরখানা আধো অন্ধকার। ভাল করে দেখা যাচ্ছে না কিছু। শুধু শোনা যাচ্ছে দিদির মর্ম্মস্পর্শী গোঙ্গানির শব্দ।

না জানি দিদির কি কষ্ট হচ্ছে। আমার বুকখানা ভেঙ্গে চৌচির হয়ে যাচ্ছিলো, যখন দিদি বারবার একটু জলের জন্য কাতর কণ্ঠে মার কাছে অনুরোধ জানাচ্ছিলো। মন চাচ্ছিলো আমি ছুটে গিয়ে দিদির মুখে জলের গেলাসটা তুলে ধরি। কিন্তু মা কেন যে এতো নিষ্ঠুর হয়েছিলেন আমি পরে বুঝলাম। মেজো দিদি ফিস ফিস করে বললেন—ঘরে জল কোথায় যে দেবে। পাশের বাড়ির ওরা জল দেয়নি। শুনে আমার মনটা ডুকরে কেঁদে উঠলো কিন্তু কি করবো, কোনো উপায় নেই। বাড়িতে বড় ইদারা ছিলো বহুকাল অযত্নে নষ্ট হয়ে গেছে, অপরের বাড়ি থেকে পানি বয়ে এনে সংসার চালাতে হতো। দিদির অবস্থা পাড়ার লোক জেনে ফেলায় আমাদের একঘরে করেছিলো তাই কেউ আর জল দিতো না। আমাদের বাড়ির কিছু দূরে একটা পুকুর ছিলো, সেই পুকুরের জলে আমরা রান্না করতাম এবং পান করতাম। হয়তো আজ পুকুরের জলও ঘরে নেই।

একটু পরেই শুনতে পেলাম ছোট্ট বাচ্চার কন্নার শব্দ। আর সহ্য হলো না, খাটের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলাম, দেখলাম সুন্দর ফুলের মত একটা শিশু মেঝেতে মাদুরের উপর পড়ে আছে।

আনন্দে বুক আমার ভরে উঠলো, বাচ্চাটাকে কোলে করার জন্য আমি উন্মুখ হয়ে পড়লাম। ভেবে পেলাম না তখন কেন বাবা-মা এমন গোপনভাবে কথাবার্তা বলছেন।

শুনতে পেলাম বাবার গলা—মুখে নুন গুঁজে দাও। মুখে নুন গুঁজে দাও----

মায়ের কণ্ঠ— আমি পারবো না যা করতে হয় তুমিই করো। আমি পারবো না জীব হত্যা করতে---

দেখলাম বাবা চোরের মত চুপি চুপি কক্ষে প্রবেশ করলেন। কেরোসিনের ডিবের আলোতে দেখলাম বাবার এক পৈশাচিক রূপ। বাবা সন্তর্পণে এগিয়ে এলেন দিদি যেখানে মেঝেতে পড়ে আছে। এতোক্ষণে দিদি নীরব হয়ে গেছে, বোধ হয় আরাম পেয়েছে।

দেখলাম বাবা ফুলের মত শিশুটার গলা টিপে ধরলো। একটা শব্দ হলো কোঁ কোঁ করে। শিউরে উঠলাম আমি, হয়তো আমার পাশেই নিদ্রার ভাণকরা দিদিগণও শিউরে উঠলো। দেখলাম বাবার হাতের মুঠায় ফুলের মত ফুটফুটে শিশুটার মুখ কালির মত কাল হয়ে উঠেছে।

বনহুর স্তব্ধ নিশ্বাসে শুনে যাচ্ছে মিসেস শোহেলীর কথাগুলো।

বলে চলেছে মিসেস শোহেলী—তারপর কয়েকদিন দিদি বিছানা থেকে উঠলো না। আমাদের সংসারে আবার অভাব আর অনটন চলেছে। কেটে গেলো কয়েকটা দিন—একদিন রাতে দিদির কান্নার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেলো আমার। চমকে চেয়ে দেখি, সেই লোকটা দিদির খাটে বসে আছে। দিদির আঁচলখানা তার হাতের মুঠায়। দিদি পালানোর চেষ্টা করছে, লোকটা দিদিকে জাপ্‌টে ধরে ফেললো, বাম হস্তে আলোটা নিভিয়ে দিলো সে।

পরদিন মায়ের কান্নার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেলো, শুধু মা-ই নয় আমার অন্যান্য দিদিও বিলাপ করে কাঁদছে। প্রথমে কিছু বুঝতে পারলাম না, পরে দেখলাম দিদিকে মেঝেতে চাদর দিয়ে ঢেকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। আমার বড়টা এক সময় আমাকে জানালো, দিদি গলায় দড়ি দিয়ে মারা গেছে— আর সে জাগবে না। মিসেস শোহেলীর গলা ধরে এলো।

বনহুর বললো —থাক চলুন এবার ফেরা যাক।

মিসেস শোহেলী বনহুরের কথায় কান না দিয়ে বললো—মিঃ আলম ক'দিন পর আবার আমার মেজো দিদির কাছে লোকটা আসা যাওয়া করতে শুরু করলো। শুধু সেই নয়, আরও কয়েকজন লোক আসতো দিদিদের ঘরে। আমার ছোট ভাই-বোনদের মা বাবার ঘরে শোবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আমাদের অবস্থা ক্রমান্বয়ে উন্নতি হতে লাগলো। আমরা দু'বেলা পেট পুরে খেতে লাগলাম। বাবার গায়ে নতুন জামা উঠলো। মা ছেড়া শাড়িখানা পাল্টে নতুন শাড়ি পড়লেন। কিন্তু অবাক হলাম, পাড়া প্রতিবেশীরা আর কেউ আমাদের বাড়ি বেড়াতে আসতো না। কারো সঙ্গে দেখা হলে তারা মুখ ফিরিয়ে নিতো। তখন না বুঝলেও বুঝলাম কয়েক বছর পরে। বড় দিদির মত মেজো-সেজো এরা অমন ঘাবড়ে যেতো না। সব সময়ের জন্য

আমাদের বাড়িটা একখানা পাপপুরী হয়ে উঠলো। আমাদের সামনেই দিদিরা বাইরের লোকগুলোকে নিয়ে আমোদ প্রমোদ করতো। না করে যে উপায়ও ছিলো না কিছু—একদিকে বাবার তাড়না আর একদিকে ক্ষুধার জ্বালা সব লজ্জা-শরমকে ছিনিয়ে নিয়েছিলো।

বছরে দুটো-তিনটে নিষ্পাপ শিশুকে আমাদের বাড়িতে যে হত্যা করা হতো না তা নয়। তারপর একদিন মেজো দিদি উধাও হলো। কোথায় গেলো কেউ জানে না—দিন গেলো রাত হলো আর ফিরে এলো না সে।

বনহুর একটা শব্দ করলো মাত্র—উঃ কি জঘন্য।

হাঁ মিঃ আলম, জঘন্যই বটে। তারপর দু'বছর কেটে গেলো সেজো বোন মারা গেলো জারজ সন্তান প্রসবকালে। চতুর্থবোন পালালো এক মোটর ড্রাইভারের সঙ্গে। নিত্য নতুন পুরুষের নির্যাতন হয়তো সহ্য করা তার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। তারপর আমার পালা। আর সব ছোট ছোট। আমি সবে পনেরো পেরিয়ে ষোল বছরে পা দিয়েছি। আবার সংসারে অভাব রাক্ষসী হানা দিয়েছে। ঘরে উনুন জ্বলে না উনুনে হাড়ি উঠে না। বাবার মুখে কথা নেই—চুল রুক্ষ, চোখ কোঠরাগত।

হাঁ, সেদিন আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি। দিদিরা নেই, সব দিদি হারিয়ে গেছে তাই, মা-বাবা আমাকে আর আমার ছোট কয়েকটি ভাইবোনকে ওঘরে শোবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

হঠাৎ একটা কঠিন স্পর্শে ঘুম ভেঙ্গে গেলো, চিৎকার করে জেগে উঠলাম। দেখি আমার পাশে বসে এক নর শয়তান। আমাদেরই গ্রামের এক মুসলমান কশাই মাতাল। অসহায়ের মত চারিদিকে তাকালাম—একি, আমার ভাইবোন কেউ নেই সে ঘরে। শুধু আমি একা কখন যে আমার ছোট ভাইবোনগুলোকে উঠিয়ে মা-বাবার ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তা বুঝতে পারলাম না। তাকালাম কশাই মাতালটার দিকে। মাতাল তখন আমার দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে পিট্ পিট্ করে হাসছে। আমি জানতাম কশাইটার অনেক টাকা আছে, সে প্রায়ই বাবাকে আমার জন্য প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করতো। মুসলমান বলে বাবা ওকে তেমন প্রশ্রয় দেননি। আজ আর তিনি পারেননি সংযত থাকতে। কয়েকটা টাকার মোহে বাবা আমাকে তুলে দিয়েছেন ওর হাতে।

আমাকে জাপটে ধরতে গেলো কশাই সোনামিয়া। হাঁ, ওর নাম সোনামিয়া ছিলো। আমিও কম মেয়ে ছিলাম না। সোনাকে কামড়ে কাবু করে ফেললাম, কিছুতেই আমি ধরা দিলাম না। বাইরে থেকে বাবা-মার ফিসফাস গলার আওয়াজ পাচ্ছিলাম কিন্তু জানি তাদের ডেকে আমার কোনো লাভ হবে না। আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম। কিছুতেই সোনামিয়া

আমার নাগাল পেলো না, আমি দরজা খুলে উল্কা বেগে অন্ধকারে ছুটলাম। বাবা বোধ হয় আমাকে ধরে ফেলেছিলেন বলে আমার মনে হলো আমি তাঁকে প্রচন্ড এক ধাক্কায় ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। জানিনা তার কি হলো। আমি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছি, দিকভ্রান্ত উন্মাদের মত। চারিদিকে জমাট অন্ধকার বারবার হোচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছি তবু সেদিকে আমার খেয়াল নেই--

থামলো মিসেস শোহেলী মনে হচ্ছে সে যেন এই মুহূর্তেই দৌড়াচ্ছে। হাঁপাচ্ছে সে রীতিমত।

বনহুর তন্ময় হয়ে শুনছে, রমনা পার্ক কখন যে ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে সেদিকে তার খেয়াল নেই।

মিসেস শোহেলী শুকনো ঠোঁট দু'খানা একবার জিভ দিয়ে চেটে ভিজিয়ে নিলো তারপর আবার বলতে শুরু করলো—আমি জানতাম গ্রামে তখন বড় সাহেব এসেছেন। বড় সাহেব কে এবং কেন এসেছেন তা জানতাম না। তিনি যে বাংলোয় থাকেন এটুকু আমি জানতাম। কেউ কোনো অপরাধ করলে বড় সাহেবের কাছে গ্রামের লোক গিয়ে জানাতো এও জানতাম। আমি মনে করলাম এই বিপদ মুহূর্তে ঐ বড় সাহেব ছাড়া আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। বাবা-মা এরাও আমাকে নরকের পথে ঠেলে দিতে চান, যেমন আমার বড় দিদিদের অবস্থা করেছেন।

বাংলোর পথ চিনতাম, তাই অন্ধকারেও ভুল হলো না। কোনোরকমে পৌছে গেলাম বাংলোয়। আমি ছুটে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলাম —বড় সাহেব বাঁচান—বাঁচান আমাকে---

দরজা খুলে গেলো সঙ্গে সঙ্গে।

আমি দমকা হাওয়ার মত বাংলোর মধ্যে প্রবেশ করলাম।

দেখলাম সে এক অদ্ভুত রূপ, অদ্ভুত রূপ---মিসেস শোহেলীর মুখ যেন বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো।

পরবর্তী বই

ঢাকায় দস্যু বনহুর

ঢাকায় দস্যু বনহুর—৩৬

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

বলে চলেছে শোহেলী—দেখলাম এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন, টলছেন তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ঘোলাটে চোখ তার নেশায় ঢুলুঢুলু। পাশের টেবিলে কয়েকটা খালি মদের বোতল।

আমি হতভম্ব হয়ে পড়েছি—একি দেখছি! পালাবার জন্য দরজার দিকে পা বাড়াতে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটা ধরে ফেললেন আমাকে, বললেন— পালাচ্ছো কেন? কি চাও বলো?

লোকটার কথার মধ্যে সহানুভূতির সুর ছিলো; আমি সোজা হয়ে ফিরে দাঁড়ালাম, বললাম—আপনি আমাকে বাঁচান বড় সাহেব, আমাকে বাঁচান। কশাই সোনামিয়ার কবল থেকে বাঁচান......

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটার চোখ দুটোতে ক্রুদ্ধভাব ফুটে উঠলো— কি বললে? কশাই সোনামিয়া?

বললাম—হাঁ, সে আমার সতীত্ব নষ্ট করতে চায়।

বলো কি! আমি ওকে খুন করবো। একটা অসহায়া বালিকার প্রতি তার এই নিমর্ম আচরণ! মিথ্যা নয়, সেই রাতেই সোনামিয়া হানা দিলো বড় সাহেবের কুঠিরে। বড় সাহেবের হাত থেকে আমাকে কেড়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করলো। অবশ্য এতো সাহস পেতো না যদি আমার বাবার প্রশ্রয় সে না পেতো। কারণ বাবা তার কাছে আমার বিনিময়ে অনেকগুলো টাকা নিয়ে ফেলেছিলেন। সেই অধিকারেই রাত দুপুরে সোনামিয়া গিয়েছিলেন বাংলোয়।

বড় সাহেব সোনামিয়াকে উপযুক্ত শাস্তিই দিলেন, কুকুরের মতন তাকে গুলী করে হত্যা করলেন তিনি। কিন্তু খুন—খুনের অপরাধে তার মৃত্যুদণ্ড হবে। সেই রাতেই বড় সাহেব বাংলো ছেড়ে পালালেন। আমাকে তিনি সঙ্গে নিলেন দয়া করে, কারণ আমিও তখন চোখে অন্ধকার দেখছিলাম। বাবা-মা— তাদের উপর আমি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমি জানতাম, তাদের কাছে ফিরে গেলে আমাকে দেহ বিক্রি করে খেতে হবে। না না, তা আমি পারবো না। পতিতার মেয়ে বলে সমাজ আমাদের আশ্রয় দেয়নি। কোনো পুরুষ বিয়ে করে নিতে রাজি ছিলো না কিন্তু তারা সর্বক্ষণ প্রস্তুত ছিলো কেমন করে আমাদের সতীত্ব লুটে নিয়ে আনন্দ উপভোগ করবে। আমি সেই নির্মম মুহূর্তে বড় সাহেবকেই কাণ্ডারী মনে করলাম।

পরে জানতে পারলাম, বড় সাহেব আমাদের গ্রামের মালিক রায় বাহাদুর। প্রচুর অর্থের মালিক তিনি। রায় বাহাদুরের ব্যবহার মন্দ ছিলো না— তিনি আমাকে তার সবকিছু দিলেন— অর্থ ঐশ্বর্য যা আমার মন চাইলো তাই দিলেন আমাকে।

জীবনে আমি এতো অর্থ দেখিনি, আমার মনে হতে লাগলো, আমি বুঝি স্বপ্ন দেখছি! সমস্ত দেহে আমার মণি মুক্তখঁচিত অলঙ্কার। পায়ের তলায় লুটোপুটি খাচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকা। ব্যথা-বেদনা সব ভুলে গেলাম,ভুলে গেলাম নিজের অস্তিত্ব— আমি বিয়ে করলাম বৃদ্ধ রায় বাহাদুরকে। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলো শোহেলী— রায় বাহাদুর মাতাল কিন্তু চরিত্রহীন নয়, তিনি আমাকে স্ত্রীরূপে পেয়ে অনেক খুশি হলেন। কিসে আমি সুখী হবো, কিসে আমার মন সব সময় প্রফুল্ল থাকবে, এটাই তার চিন্তা। রায় বাহাদুর তার যথাসর্বস্ব আমাকে বিলিয়ে দিয়েছেন কিন্তু...

থেমে পড়লো শোহেলী, একটা প্রচণ্ড ব্যথা যেন তার কণ্ঠ রোধ করে দিলো, যা বলতে চায় তা যেন সচ্ছলভাবে বলতে পারছে না। একটু থেমে বললো— মিঃ আলম, আমি বড় একা, বড় অসহায়। সব পেয়েছি আমি— পেয়েছি স্নেহ-ভালবাসা-অর্থ ঐশ্বর্য কিন্তু আমি যা পাইনি তা কোনোদিন পাবো না হয়তো।

বনহুর বললো— দেখুন, মানুষ একাধারে সব কিছু পায় না। মানুষ যদি সব কিছু পেতো পূর্ণভাবে তাহলে এ পৃথিবী তার কাছে হয়ে উঠতো স্বর্গসম। তাই আপনিও সব পেয়েছেন, হয়তো সামান্য কিছু পাননি যার জন্য আপনি ব্যথিত।

সামান্য নয় মিঃ আলম, যা আমি পাইনি তা সামান্য নয়। একদিন ভেবেছিলাম, অর্থ আর ঐশ্বর্য থাকলে মানুষ বুঝি সর্বসুখী হয়, কিন্তু আজ আমি বুঝতে পারছি, অর্থ আর ঐশ্বর্যই মানুষের সব বাসনা পূর্ণ করতে পারে না। হঠাৎ শোহেলী বনহুরের কাঁধে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে— মিঃ আলম!

বনহুর বিস্মিত হয় না শোহেলীর ব্যবহারে, কারণ ওর মনের ব্যথা ও সে বেশ উপলব্ধি করতে পেরেছে। সত্যিই বাঙ্গালি মেয়েদের সমাজে কত বাধা। হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতির মধ্যেই রয়েছে এই সমাজ-বিড়ম্বনা। নিজে নয়, মা নয়— মাতামহীর ত্রুটির জন্য সমাজ থেকে তারা বঞ্চিতা। কতবড় অসহায়া এদেশের নারীকুল। বনহুরের কাঁধে মাথা রেখে শোহেলী ফুঁপিয়ে কাঁদছিলো, বাধা দিতে পারে না বনহুর।

শোহেলীর কান্না দেখে বনহুরের চক্ষুদ্বয় সিক্ত হয়ে উঠে।

কতক্ষণ যে কেটেছে খেয়াল নেই, হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে আসে বনহুরের। শোহেলীর কান্না থেমে গেছে, সোজা হয়ে বসে শোহেলী বলে— মিঃ আলম, জানি না কেন আপনাকে আমি এসব বললাম। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন, করবেন মিঃ আলম......

উঠে দাঁড়ালো শোহেলী।

বনহুরও উঠে পড়লো, কেমন একটা সহানুভূতির সুর হঠাৎ তার কণ্ঠ দিয়ে বেরিয়ে এলো— কি চান আপনি? কি পেলে আপনার মনের দুঃখ লাঘব হবে বলুন?

শোহেলী অন্ধকারে চোখ তুলে তাকালো, বনহুরের মুখখানা বুঝি স্পষ্ট করে দেখতে চাইলো সে একবার। তারপর মাথাটা নত করে নিয়ে বললো পারবেন? আমার মনের দুঃখ লাঘব করতে পারবেন আপনি?

চেষ্টা করবো।

হঠাৎ কথাটা বলে বনহুর নিজেই বেশ বিব্রত বোধ করলো। সে সব বুঝেও কেন এমন অবুঝের মত কথা বললো। সত্যি কি সে পারবে— পারবে শোহেলীকে খুশি করতে? পারবে তার দুঃখ-বেদনা লাঘব করতে?

শোহেলী যেন অন্ধকারে আলের সন্ধান পেলো, বললো—একটু ভালবাসা.....একটু প্রেম পারবেন দিতে আমাকে? বলুন পারবেন? মন্ত্রমুগ্ধের মত বনহুর বললো— পারবো।

সত্যি?

বনহুর চট্ করে কোনো জবাব দিতে পারলো না এবার।

হঠাৎ শোহেলী বনহুরের একখানা হাত মুঠায় চেপে ধরলো— কথা বলছেন না কেন?

উঁ কি বললেন?

শুনতে পাচ্ছেন না?

মিসেস শোহেলী ....না না, সম্ভব নয়। সম্ভব নয়, চলুন ফিরে যাই হোটেলে।

কিন্তু?

আবার আর একদিন আসা যাবে।

আসবেন তো?

আসবো।

পা বাড়ালো বনহুর গাড়িখানার দিকে।

শোহেলী তাকে অনুসরণ করলো।

ড্রাইভিং আসনের দরজা খুলে ধরলো বনহুর— উঠুন।

শোহেলী নীরবে উঠে বসলো।

বনহুর গাড়িতে উঠে বসে ষ্টার্ট দিলো। সমস্ত রমনা পার্ক তখন নীরব হয়ে গেছে। দু'একজন যারা তখনও বসে কথাবার্তা বলছিলো তারাও ফিরে যাবার জন্য উঠে পড়েছে, এগিয়ে চলেছে পার্কের গেটের দিকে।

জনমুখর পথ বেয়ে বনহুরের গাড়িখানা ছুটে চলেছে। বনহুর নিজকে আজ সংযত করতে সক্ষম হয়েছে বলে মনে মনে সান্ত্বনা অনুভব করছে। এমন একটা অবস্থায় আজ পড়েছিলো সে, যে মুহূর্তে কোনো পুরুষ পারে না মনকে কঠিনভাবে সামলে রাখতে। সুন্দরী তরুণী শোহেলীর প্রেম নিবেদনে তার মনেও যে শিহরণ জাগেনি তা নয় কিন্তু সে পাষাণের মত শক্ত হয়ে পড়েছিলো, ভেবেছিলো এতো সহজে তার আনমনা হওয়া চলে না।

গাড়িতে বসে কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব রইলো। শোহেলী কোনো কথা বলছে না, হয়তো তার মনে গভীর বেদনা এখন জমাটভাবে দানা বেঁধে উঠেছে।

বনহুর গাড়ি চালাচ্ছিলো, চোখ ছিলো তার সামনের দিকে। শুধু আজ নয়, বেশ কয়েকদিন হলো এসব রাস্তায় সে গাড়ি চালিয়ে এসেছে। ঢাকা শহরের পথঘাট তার প্রায় সব পরিচিত হয়ে উঠেছিলো। অসংখ্য দ্রুতগামী যানবাহনের ভিড় এড়িয়ে গাড়ি চালাচ্ছিলো বনহুর।

শোহেলী আসনে ঠেশ দিয়ে বসেছিলো, মন হচ্ছে সে যেন ক্লান্ত আর অবসন্ন হয়ে পড়েছে— অন্তরের সব কথা অপকটে আজ ব্যক্ত করতে সক্ষম হয়েছে বলে হাল্কা লাগছে বুঝি তার মনটা। সব কথা যেন তার নিঃশেষ হয়ে গেছে অন্তর থেকে। শোহেলী নিজেই জানে না, কেন সে তার জীবনের ঘটনাগুলো একটা অজানা অচেনা মানুষেরই কাছে প্রকাশ করলো।

বনহুর বললো— শোহেলী!

বলুন মিঃ আলম?

আপনার বাবা-মা-ভাই আর অবশিষ্ট বোনগুলো এখন কোথায়? কোথায় আছে তারা?

জানি না, তবে শুনেছিলাম আমার বাবা পাগল হয়ে গেছেন। পরপর বোনগুলোর অন্তর্ধান, তারপর অভাব রাক্ষসীর তাড়া তিনি সহ্য করতে পারেননি..... বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো শোহেলীর গলা।

বনহুর বুঝতে পারলো, পিতার প্রতি কন্যার গভীর আকর্ষণের অনুভূতি কত গাঢ় যা বিনষ্ট হয়েনি এতো ঝড়-ঝঞ্ঝার প্রচণ্ড আঘাতেও। বললো বনহুর— শোহেলী, আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?

বলুন?

আপনার পিতামাতা আর অসহায় ছোট ভাইবোনদের খোঁজটা আমাকে জানাবেন?

কেন?

এতোটুকু সহায়তা করতে যদি পারি!

না। আমি তাদের দিকে কাউকে ফিরে তাকাতে দেবো না।

সেকি?

যে পিতা আমাদের সর্বনাশের মূল, সেই পিতাকে আমি দেবো সহায়তা করতে? মরে গেলেও না।

আপনি তো জানেন, কেন তিনি আপনাদের উপর এই নৃশংস আচরণ করেছিলেন? ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ হারিয়ে ফেলে তার স্বাভাবিক জ্ঞান। মানুষ পরিণত হয় পশুতে।

মিঃ আলম, আমি কি নিজে পারতাম না আমার পিতা-মাতা ভাই-বোনদের সাহায্য করতে?

পারতে, কিন্তু করোনি, কেন করোনি তা একটু পূর্বেই তুমি নিজেই বলেছো। শোহেলী, তুমি ভুল করেছো...

কখন যে বনহুর শোহেলীকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করে ফেললো খেয়াল নেই। হঠাৎ বললো— মাফ করবেন, আমি আপনাকে-------

না না, আর 'আপনি' বলে নয়, 'তুমি' বলেই আমাকে ডাকবেন, অনেক খুশি হবো মিঃ আলম।

কেন যেন বনহুর ইচ্ছা করেই এপথ-সেপথ ঘুরে ফিরে গাড়ি চালিয়ে নিচ্ছিলো, সোজা হোটেল অভিমুখে না গিয়ে একটু বিলম্ব করছিলো পথের মধ্যে। অবশ্য বনহুরের মনে একটা অভিসন্দি ছিলো, নূরী নিউমার্কেট গিয়েছিলো— সে যেন ফিরে এসে হোটেলে প্রবেশ করে থাকে এবং সেই কারণেই বনহুরের পথে বিলম্ব করা।

শোহেলীর কথায় বললো বনহুর— যদি খুশি হন তাই বলবো।

আচ্ছা মিঃ আলম, ঢাকায় আপনার কি কেউ নেই?

না।

ঐ চাকরটি বুঝি সব সময় আপনার সঙ্গে থাকে?

হাঁ।

ও কিন্তু ভালভাসে আপনাকে।

কেমন করে বুঝলেন?

আপনি হোটেলে আসার পর কয়েকদিনের জন্য না জানি কোথায় উধাও হয়েছিলেন, তখন আমি দেখতাম আপনার চাকরটা সব সময় মুখখানা ভার করে বসে আছে। সর্বক্ষণ কি যেন চিন্তা করছে, বেশ বুঝতে পেরেছি সে আপনার অনুপস্থিতির জন্যই এমন ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিলো।

ওঃ তুমি তাহলে প্রথম থেকেই-------

হ্যাঁ, আমি প্রথম দিন থেকেই আপনাকে অনুসরণ করে আসছি। আপনি আমাকে লক্ষ্য না করলেও আমি প্রতিদিন আপনাকে লক্ষ্য করেছি। রোজ আপনি যখন বাইরে গেছেন আমি হোটেলের জানালায় দাঁড়িয়ে দেখেছি আপনাকে কখন ফিরে আসবেন সেই প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করেছি জানালার পাশে। যখন আপনি হোটেলের বাগানে পায়চারি করেছেন তখন আমি তন্ময় হয়ে দেখেছি আপনাকে। কতদিন ভেবেছি গায়ে পড়ে আলাপ করবো কিন্তু আমার বিবেক বাধা দিয়েছে— না না, তা হয় না— না জানি কোথাকার কে, পরিচয় করতে গেলে যদি কথা না বলে তবে অপমান হব, তাই সাহস হয়নি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে। কিন্তু আর পারিনি, পারিনি নিজকে সংযত রাখতে। আপনি যখন বাগানে বসেছিলেন তখন এসে পড়েছিলাম। একটু থেমে বললো— জানি না, আপনি আমাকে ঘৃণা করছেন কিনা? কিন্তু আমি পারলাম না মিঃ আলম।

শোহেলী আসনে হেলান দিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

বনহুর গাড়ি চালিয়ে চলেছে, সেও নীরব। শোহেলীর শেষ কথার কোনো জবাব সে দেয়নি বা খুঁজে পায়নি।

গাড়ি হোটেলের গেটে প্রবেশ করতেই অবাক হলো বনহুর— হরি দাঁড়িয়ে আছে গেটের অদূরে।

বনহুর দুঃসাহসী বটে কিন্তু আজ সে কেমন যেন ভড়কে গেলো, মনে মনে বেশ বিব্রত বোধ করলো সে। গাড়ি থামলো, অন্যান্য দিনের মতো আজ হরি ছুটে এলো না বনহুরের গাড়ির পাশে। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো সেখানেই রইলো।

বনহুর বুঝতে পারলো হরির মনোভাব। গাড়ি থেকে নেমে দরজা খুলে ধরলো।

শোহেলী নেমে দাঁড়ালো, হাত বাড়িয়ে দিলো বনহুর দিকে।

বনহুর অগ্যতা হাত বাড়ালো শোহেলীর দিকে।

হেসে বললো— গুডনাইট মিঃ আলম, কাল আবার দেখা হবে।

শোহেলী চলে গেলো তার নিজের ক্যাবিনের দিকে।

বনহুর ডাকলো— হরি!

কোনো জবাব না দিয়েই হরি গাড়ির দরজা বন্ধ করে গাড়িতে চাবি আটকালো, তারপর চলে গেলো ক্যাবিনে।

বনহুর মৃদু হাসলো, বুঝতে পারলো, হরি ভীষণ রাগান্বিত হয়ে পড়েছে। নিজের কামরায় এসে বনহুর ড্রেস পরিবর্তন করছিলো। অন্যান্য দিন হরি তাকে সাহায্য করে এসব ব্যাপারে। আজ হরি কামরায় এলো না।

বনহুর ড্রেস পরিবর্তন করে বাথরুমে প্রবেশ করলো। ফিরে এসে দেখলো, হরি তার পরিত্যক্ত জামাকাপড়গুলো গুছিয়ে তুলে রাখছে। ড্রেসিং আয়নাটার সম্মুখে দাঁড়িয়ে চুলগুলো আঁচড়াতে আঁচড়াতে বললো বনহুর— নূরী, কি হলো তোমার?

কি আবার হবে?

কথা বলছো না যে?

তোমার কথা বলার লোকের তো অভাব নেই।

ওঃ মিসেস শোহেলীর কথা বলছো?

হাঁ, কবে থেকে ওর সঙ্গে তোমার আলাপ হলো?

আজ।

মিথ্যে কথা।

না, সত্যি করে বলছি। নূরী? বনহুর নূরীর কাঁধে হাত রাখলো— আমাকে তুমি অবিশ্বাস করো না নূরী।

কোনোদিন করেছি তোমাকে অবিশ্বাস— কিন্তু....আমি দেখছি আজকাল তুমি বেশ পাল্টে গেছো।

মানে?

মানে তুমি যাকে পাও তাকেই সঙ্গিনী করে নাও।

দোষ কি এতে? চাপা একটু হাসলো বনহুর।

নূরীর রাগ আরও চরমে উঠলো, সে ক্রুদ্ধভাবে বেরিয়ে গেলো কামরা থেকে।

বনহুর শয্যায় গা এলিয়ে দিলো। মিছামিছি ঘুমের ভ্যান করে পড়ে রইলো চুপচাপ।

খাবার জন্য ডাক পড়লো, বয় এসে জানালো— খাবার দেওয়া হয়েছে।

তবু বনহুর উঠলো না।

নূরী লক্ষ্য করলো বাইরে থেকে।

রাত বেড়ে আসছে, তবু জাগলো না বনহুর।

নূরী আলগোছে এসে দাঁড়ালো বনহুরের শিয়রে। বনহুরের চোখ বন্ধ থাকলেও সে নূরীর পায়ের শব্দ শুনেই বুঝতে পারলো, নূরী এসেছে। বনহুরের নিশ্বাস পড়ছে বেশ জোরে জোরে। সে যে না ঘুমিয়ে জেগে আছে বুঝার জো নেই।

বনহুরের মাথায় হাত রাখলো নূরী—হুর! হুর ঘুমিয়েছো?

পাশ ফিরলো বনহুর, কোনো জবাব দিলো না।

নূরী আবার ডাকলো— হুর, উঠো খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেলো।

এবার কথা বললো বনহুর—ক্ষিধে নেই।

সেকি? সেই দুপুরবেলা খেয়েছো, বিকেলে নাস্তাও করোনি বুঝি?

যাও বিরক্ত করো না।

উঠো লক্ষীটি।

মোটেই উঠবো না। কথাটা বলে বালিশে মুখ লুকিয়ে হাসে বনহুর।

সে জানে, নূরী তার উপর বেশিক্ষণ রাগ করে থাকতে পারবে না।

নূরী বনহুরের চুলে আংগুল চালিয়ে দিতে দিতে বলে আবার— তুমি যা খুশি করো আর আমি কিছু বলবো না। কিন্তু একটি কথা তোমাকে রাখতে হবে—বলো রাখবে?

উঁ হুঁ কোনো কথাই আমি তোমার রাখবো না।

কি বললো না শুনেই বলছো?

হাঁ, আমি জানি তুমি খেতে বলবে।

হেসে ফেলে নূরী—না খেলে আমার বয়েই যাবে।

বনহুর এবার নূরীর হাতখানা ধরে টেনে নেয় কাছে— তবে যে আমার এতো সখের ঘুমটা নষ্ট করে দিলে?

শোন হুর?

বলো?

এ হোটেল ছাড়তে হবে।

কোথায় যাবে?

ঢাকা শহরের বাড়ির অভাব হবে না।

বেশ, তাই হবে।

এবার তবে খাবে, চলো।

না।

কেন খাবে না?

তুমি আমাকে ভুল বুঝ বা অবিশ্বাস করো তা আমি সহ্য করতে পারবো না।

হুর!

বলো আমাকে তুমি ভুল বুঝবে না?

না।

নূরী খাবারের থালাটা এনে বনহুরের মুখে তুলে দিতে লাগলো।

খাওয়া শেষ হলে বললো নূরী—চলি?

না।

সেকি?

আজ থাকবে আমার কামরায়।

সর্বনাশ, লোকে বলবে কি বলো তো?

না, এমনি করে তোমাকে দূরে রেখে আমি থাকতে পারবো না নূরী।

লক্ষ্মীটি ছেড়ে দাও। কেউ এসে পড়বে যে?

ছাড়বো না।

এমন সময় দরজার বাইরে বয়ের আসার শব্দ শোনা যায়।

বনহুর নূরীকে মুক্ত করে দেয়—যাও হরি।

বয় খাবারের থালা—বাসন নিয়ে যায়, হরিও বেরিয়ে যায় তার পিছনে পিছনে।

❑

ভোরে দৈনিক পত্রিকাখানা নিয়ে চোখ বুলাচ্ছিলো বনহুর, এখনও টেবিলে নাস্তা দেওয়া হয়নি।

হরি বিছানা গুমাচ্ছিলো।

বনহুর সোফায় বসে পত্রিকা পড়ছিলো।

বাইরে মিষ্টি একটা কণ্ঠ ভেসে উঠলো— আসতে পারি?

বনহুর তাকালো নূরীর দিকে, তারপর বললো— এসো।

কামরায় প্রবেশ করলো শোহেলী—কি করছেন মিঃ আলম?

এই তো পত্রিকাখানায় চোখ বুলাচ্ছি। বস।

শোহেলী বসলো, একটু হেসে বললো— আপনি কিন্তু বেশ আছেন—হরি সবসময় আপনার তদারক করে।

হাঁ। আড়নয়নে একবার বনহুর নূরীর দিকে তাকিয়ে দেখে নিলো, নূরী তখন বিছানার চাদরখানা পাল্টে পাতছিলো।

শোহেলী বললো— মিঃ আলম, জানেন কাল অতোরাতে ফিরেও দেখি রায় বাবুর নেশা ছুটেনি। সত্যি, আপনার সঙ্গে যতক্ষণ ছিলাম ততক্ষণ যেন স্বর্গসুখ অনুভব করছিলাম।

বনহুর কিন্তু ভিতরে ভিতরে ঘাবড়ে যাচ্ছিলো, কি বলতে আরও কি বলে বসে শোহেলী কে জানে। বনহুর শোহেলীর কথায় কোনো জবাব না দিয়ে পত্রিকাখানায় দৃষ্টি বুলিয়ে যাচ্ছিলো মনোযোগ সহকারে।

শোহেলী পুনরায় বললো— মিঃ আলম, হোটেলে ফিরে স্বামীর নেশাতুর চেহারা দেখে আমার মনের অবস্থা যে কি হলো তা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না। গোটারাত আমার কেমনভাবে কেটেছে জানিনা।

মাতাল হলেও তিনি আপনার স্বামী, কোনো নারীর উচিত নয় স্বামীকে ঘৃণা করা। বললো বনহুর।

শোহেলী গম্ভীর কণ্ঠে বললো— আপনি পুরুষ মানুষ তাই আমার মনের ব্যথা বুঝতে পারবেন না? মিঃ আলম, আপনি কাল বলেছেন আমার সব ব্যথা-বেদনা আপনি দূর করতে চেষ্টা করবেন?

বনহুর চমকে উঠলো—কাল খেয়ালের বশে কি বলে বসেছে সে নিজেই যে উপলব্ধি করতে পারেনি। বনহুর তাকিয়ে দেখলো, নূরী বেরিয়ে গেছে কক্ষ থেকে। হয়তো শোহেলীর কথাটা তার কানে গিয়েছে।

বনহুর কথার মোড় ফেরাতে চেষ্টা করলো— একটা কথা কাল তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি। আচ্ছা, তুমি হিন্দু মেয়ে অথচ তোমার নামে ঠিক মুসলমানী ঢং আছে—এর কারণ কি?

ওঃ শোহেলী মুসলমানী নাম তাই বলছেন?

হাঁ, শোহেলী নামটা মুসলমানদেরই ঘরে বেশি শোনা যায়।

মিঃ আলম, কাল আপনাকে বলেছি না আমার স্বামী রায় বাবু নর হত্যা করেছেন?

হাঁ বলেছো।

আমি আপনার কাছে কোনো কথা লুকোইনি কারণ আপনাকে আমি প্রথম নজরে দেখেই বিশ্বাস করে ফেলেছি। সেই কারণেই সব কথা অকপটে প্রকাশ করেছি আপনার কাছে। হাঁ, কি বলছিলাম, আমার স্বামী রায় বাবু একজনকে খুন করে পালিয়েছেন। তিনি বাংলো থেকে পালিয়ে নিজের বাড়িতে কয়েক মাস আত্মগোপন করেছিলেন, সেই সময় তার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়। বেশ ভালই ছিলাম ইট-পাথরে গড়া কারাগারসম প্রাসাদের মধ্যে। কিন্তু একদিন পুলিশ কেমন করে জানলো রায় বাবু তার বাড়িতে লুকিয়ে আছেন।

খবরটা রায় বাবুর কানে আসতে বিলম্ব হলো না, তিনি যখন শুনলেন পুলিশ তার সন্ধান পেয়েছে তখন তিনি অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে পড়লেন। সেই দিনই গভীর রাতে আমাকে নিয়ে রায় বাবু ভেলা ভাসালেন। নদীপথে ঘুরেফিরে একদিন দিল্লী গিয়ে হাজির হলাম। তারপর সেখানে গিয়েও স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। না জানি কখন পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে বসে। তাই তিনি নাম পাল্টে নিলেন নিজাম হোসেন নামে আর আমার নাম হলো শোহেলী...

এতোক্ষণে বনহুর বুঝতে পারলো, হিন্দু মেয়ে হয়েও কেন এর নাম শোহেলী। খুনী পলাতক আসামীর পত্নী শোহেলী বনহুরকে ভাবাপন্ন হতে দেখে বললো— আমার মার দেওয়া নাম জ্যোৎস্না রাণী।

বনহুর হেসে বললো— হাঁ, তোমার বাবা-মা ঠিক তোমার চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে নাম রেখেছিলেন। জ্যোৎস্নার মতই সুন্দর তুমি---

কি যে বলেন! একটু হাসলো শোহেলী, তার সে হাসির মধ্যে ছিলো না কোনো আনন্দ-ভরা উচ্ছ্বাস, ছিলো শুধু বেদনা আর বুকভরা নিশ্বাসের হাহাকার।

বনহুরের কথা মিথ্যা নয়, শোহেলীর চেহারা সত্যিই সুন্দর নির্মম জ্যোৎস্নার আলোর মতই স্নিগ্ধ। হঠাৎ বলে উঠে শোহেলী— চলুন না আমার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করবেন?

এখন নয় শোহেলী, পরে হবে।

তা অবশ্য ঠিক, কেননা এখনও রায় বাবুর নিদ্রাভঙ্গ হয়নি।

কথা শেষ হয় না শোহেলীর, একজন বয় শশব্যস্তে ছুটে আসে— মেম সাহেব, শীগ্‌গির চলুন, বাবু বমি করছেন।

সেকি! বলে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো শোহেলী, বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে।

বনহুর পুনরায় পত্রিকাখানা চোখের সামনে তুলে ধরে পত্রিকায় মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করলো কিন্তু শোহেলীর ব্যাথাকরুণ মুখখানা ভাসতে লাগলো তার চোখের সামনে।

শোহেলী বড় অসহায়া মেয়ে। তার রূপ যৌবন-ভরা মনোহরণকারী সৌন্দর্য। তার স্নিগ্ধ কোমল হাস্যোজ্জ্বল মুখ, হরিণীর মত ব্যথাকরণ দু'টি চোখ সত্যিই বড় করুণ।

বয় নাস্তা এনে টেবিলে রাখলো।

বনহুর তাকালো নূরীর সন্ধানে, কিন্তু নূরী কই— তাকে তো দেখছে না আশেপাশে। তবে কি সে অভিমানে করেছে! বনহুরের ঠোঁটের কোনে একটা হাসির রেখা ফুটে উঠলো। নাস্তার টেবিলে বসতে যাবে, এমন সময় পূর্ব বয়টা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো—সাহেব, চলুন আপনাকে মেম সাহেব ডাকছেন।

কেন?

বুড়ো ভদ্রলোক বমি করতে করতে একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন।

বনহুরের আর নাস্তা খাওয়া হলো না, সে উঠে শ্লিপিং গাউনটা পরে নিয়ে বেরিয়ে গেলো বয়ের পিছনে।

শোহেলীদের কামরায় পৌঁছতেই একটা উৎকট গন্ধ প্রবেশ করলো তার নাকে— কি বিশ্রী গন্ধ!

বনহুরকে দেখেই শোহেলী কাঁদ কাঁদ স্বরে বলে উঠলো—মিঃ আলম, শীগ্‌গির ডাক্তার ডাকুন, ডাক্তার ডাকুন। আমার স্বামী হঠাৎ এমন হলো কেন?

বনহুর দেখলো, খাটের উপর কাৎ হয়ে পড়ে আছে বৃদ্ধ রায় বাবু একদিকে পা আর একদিকে মাথা ঝুলছে। খাটের উপর এবং পাশে স্তূপাকার নোংরা জিনিস, বমি করে ভাসিয়ে ফেলেছেন চারিদিকে।

তখনও টেবিলে কয়কেটা মদের বোতল খালি পড়ে আছে।

বনহুর একনজরে কক্ষটা একবার দেখে নিলো, যে-সব আসবাব কক্ষমধ্যে রয়েছে তা মূল্যবান তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আলনায় অনেকরকম মূল্যবান শাড়ি ভাজ করা। ড্রেসিং আয়নার পাশে নানারকম প্রসাধন দ্রব্য। বনহুরের দৃষ্টি ফিরে এলো শোহেলীর ভয়বিহ্বল মুখমণ্ডলে। তাড়াতাড়ি রায় বাহাদুরের হাতখানা তুলে নিয়ে নাড়ী দেখলো বনহুর তারপর আশ্বাস দিয়ে বললো—ভয় নেই শোহেলী। বেশি নেশা পান করায় এমন হয়েছে, সেরে উঠবে এক্ষুণি!

সারবে তো? ব্যথাকরুণ শোহেলীর কণ্ঠস্বর।

হাঁ সারবে।

ডাক্তার ডাকতে হবে না?

না, আমার কাছে একটা ঔষধ আছে, খাইয়ে দাও সেরে যাবে। বনহুর বেরিয়ে গেলো, একটু পরে একটু ছোট্ট ঔষধের শিশি হাতে ফিরে এলো— এটা খাইয়ে দাও।

শোহেলী ঔষধটা খাইয়ে দিলো স্বামীকে।

কিছুক্ষণের মধ্যে সংজ্ঞা ফিরে এলো রায় বাহাদুরের

❑

রায় বাহাদুর সেদিন সুস্থ হবার পর স্ত্রীর মুখে সব শুনে খুশি হলেন— বিদেশে তাদের এমন একজন বন্ধুস্থানীয় লোক আছে, এ যে তার কল্পনার বাইরে। রায় বাহাদুর একসময় বনহুরের কামরায় এসে তাকে অভিনন্দন জানালেন। বনহুরের দেওয়া ঔষধ খেয়ে তিনি বেশ সুস্থ মনে করছেন।

এরপর থেকে বনহুরের সঙ্গে রায় বাহাদুর মানে নিজাম হোসেন একেবারে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়লেন। প্রায়ই বনহুরকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বের হতেন বা বাগানে বসে গল্প সল্প করতেন। সরল-সচ্ছ ভদ্রলোক নিজাম হোসেন। হঠাৎ একটা খুন হওয়ায় তাঁর জীবনে এসেছে এক মহা পরিবর্তন। তিনি ইচ্ছাকৃত এ দোষে দোষী নন।

নিজাম হোসেন আর শোহেলী বনহুরের সঙ্গে যতই গভীরভাবে মিশছে ততই নূরীর মন চঞ্চল হয়ে পড়ছে। বনহুর বুঝি ক্রমান্বয়ে সরে পড়ছে তার কাছ থেকে। আজকাল নূরী অভিমান করলে বনহুর তেমন করে আর ঘাবড়ে

যায় না। তার অভিমান ভাঙ্গানোর জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে আর পড়ে না। সব সময় বনহুর উদাসভাবে কিছু চিন্তা করে।

নূরীও আসে না গায়ে পড়ে কথা বলতে, সেও এড়িয়ে চলে ইচ্ছা করে। বনহুরের পাশের কামরাতেই ঘুমাতো নূরী। সে আজকাল প্রায়ই জেগে জেগে লক্ষ্য করতো বনহুরকে। অনেক রাত পর্যন্ত বনহুরের কক্ষে আলো জ্বলতে দেখে সে—কি করে? বসে বসে কাটায় না বই পড়ে? নিজ মনেই প্রশ্ন করে নূরী। রাগ আর অভিমানে সে উঁকি দিয়েও দেখে না।

একদিন গভীর রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলো নূরীর, কান পেতে শুনলো বনহুরের দরজায় বয়ের কণ্ঠস্বর—সাহেব সাহেব, দরজা খুলুন।

দরজা খোলার শব্দ হলো।

পরক্ষণেই শুনতে পেলো বয়ের গলা—মেম সাহেব আপনাকে ডাকছেন, আজ আবার সাহেব অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

আচ্ছা যাও, আমি আসছি। বনহুরের কণ্ঠস্বর।

একটু পরে বনহুরের বেরিয়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেলো নূরী, মনটা ওর চঞ্চল হয়ে উঠলো—নিজের অজান্তে কেন তার এমন লাগছে ভেবে পেলো না সে। চুপচাপ শুয়ে থাকার চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না।

বনহুর শোহেলীর কক্ষে প্রবেশ করে আজ বিস্মিত হলো, কই আজ তো নেই সেই বিশ্রী উৎকট গন্ধ, নেই কোনো গোঙানির শব্দ। খাটের দিকে তাকিয়ে বনহুর আরও অবাক হলো—রায় বাহাদুর তো সেখানে নেই, কক্ষের চারিদিকে তাকালো সে। দেখলো শোহেলী শয্যায় শুয়ে আছে একা—এলোমেলো চুল, চোখদুটো লাল টকটকে দেহের বসন সংযত নয়। পাশের খাটের উপর পড়ে আছে একটা খালি মদের বোতল আর কাঁচের গ্লাস।

থমকে দাঁড়ালো বনহুর।

শোহেলী উঠে দাঁড়ালো জড়িত কণ্ঠে বললো—মিঃ আলম, এসেছেন? আসুন সরে আসুন—আমার পাশে---

বনহুরের মুখকঠিন হয়ে উঠলো, গম্ভীর কণ্ঠে বললো—শোহেলী, তুমিও---ছিঃ ছিঃ ছিঃ, তুমিও মদ খাও?

শোহেলী শয্যা ত্যাগ করে নেমে দাঁড়ালো টলতে টলতে এগিয়ে এলো বনহুরের পাশে—না খেলে বাঁচবো কি করে বলেন?

শোহেলীর মুখ থেকে তীব্র উৎকট গন্ধ বেরিয়ে এলো, বনহুর রাগতকণ্ঠে বললো—আমাকে কেন ডেকেছো?

মিঃ আলম এই নির্জন নিস্তব্ধ কক্ষে আমি কি করে একা থাকি বলুন?

তবে বয় গিয়ে আমাকে মিথ্যা কথা বলেছে? সাহেব আজ আবার অজ্ঞান হয়ে আছেন বললো—এ কথা মিথ্যা?

খিল খিল করে হেসে উঠলো শোহেলী জড়িয়ে ধরলো বনহুরের দক্ষিণ হাতখানা—মিথ্যা সে বলেনি, আমি ওকে পাঠিয়েছিলাম।

কেন? কেন এভাবে আমাকে মিথ্যা কথা বলে---

মিঃ আলম, আপনি যদি মেয়েছেলে হতেন তবে বুঝতে পারতেন কি অসহ্য ব্যথা আমার বুকে তোলপাড় করছে। না না, কেউ বুঝবে না আমার ব্যথা আমার বেদনা---

রায় বাবু কই?

জানিনা। যেদিন থাকে মদের নেশায় চুরচুর আর যেদিন না থাকে সেদিন কোথায় কাটায় কে জানে। আর আমি একা সম্পূর্ণ একা নির্জন কক্ষে ছটফট করে মরি---হঠাৎ বনহুরের বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে শোহেলী উচ্ছ্বাসিতভাবে।

বনহুর ক্ষণিকের জন্য হতবুদ্ধি হয়ে যায়।

ঠিক সেই মুহূর্তে নূরী উঁকি দেয় দরজার ফাঁকে দেখতে পায় তার বনহুরের বুকে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে তরুণীটি। আর দাঁড়াতে পারে না সে চলে যায় সেখান থেকে।

বনহুর বিব্রত কণ্ঠে বলে—শোহেলী সংযত হও। এসব তোমার অন্যায়।

অন্যায়? কি করেছি আমি যা অন্যায়?

স্বামীর উপর রাগ করে নেশা পান করা---

না, আমি রাগ করে নেশা পান করিনি মিঃ আলম। আমি নিজকে ভুলে থাকার জন্য-----

তাই তুমি মেয়েছেলে হয়ে মদ খাবে?

কি করবো বলুন? আমাকে বলে দিন কি করবো আমি?

ধৈর্য ধারণ করতে হবে।

ধৈর্য--হাঃ হাঃ,হাঃ ধৈর্য ধারণ করবো। কিন্তু আর যে আমি পারছি না ধৈর্য ধরতে মিঃ আলম। বনহুরের জামাটা দু'হাতে চেপে ধরে শোহেলী—বলুন কিভাবে আমি ধৈর্য ধরবো? আবার কেঁদে উঠে হাউমাউ করে। হাসি আর কান্নায় শোহেলীর দেহটা নেতিয়ে পড়ে বনহুরের হাতের উপর।

এতো বেশি নেশা পান করেছিলো শোহেলী যে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। বনহুর ওকে শুইয়ে দেয় খাটের উপর, চাদরখানা দিয়ে ঢেকে দেয় শরীরটা তারপর বেরিয়ে যায় কামরা থেকে।

❑

পরদিন হোটেলে হরিকে আর খুঁজে পাওয়া গেলো না। বনহুর বুঝতে পারলো, সে রাগ বা অভিমান করে কোথাও চলে গেছে। তেমন করে ঘাবড়ে গেলো না বনহুর। কিন্তু মনের কোনায় একটা দুশ্চিন্তা খোঁচা দিতে লাগলো তার। কোথায় গেলো সে, কোথাই বা আছে কে জানে। বনহুর গোপনে অনুসন্ধান চালালো।

শোহেলী আসে, বনহুরের ঘরখানা অগোছালো দেখে বলে—মিঃ আলম, আপনার হরি কোথায়?

বনহুর চট করে জবাব দিতে পারে না, একটু ভেবে বলে—বড্ড বিশ্বাসী ছিলো, কিন্তু আমাকে না বলে পালিয়েছে।

বনহুরের বলার ভঙ্গী দেখে হাসে শোহেলী—বিশ্বাসী ছিলো তবু পালালো! ওঃ বুঝেছি এলে আবার রাখবেন, এজন্যই বুঝি এতো? বনহুর হাসে শুধু।

শোহেলীর স্বামীর সঙ্গে বনহুরের আলাপ হয়েছে। আজকাল অবসর সময়টা নিজাম হোসেন আর শোহেলীর সঙ্গেই কাটে বনহুরের। হরি না বলে চলে গেছে, ওর জন্য মাঝে মাঝে কথা উঠে, বনহুর আনমনা হয়ে যায় কিন্তু উতালা হয় না। জানে, ঢাকা শহরে হরি হারিয়ে যাবে না, নিশ্চয় সে ফিরে আসবে একদিন।

কিন্তু দিনের পর দিন গড়িয়ে যায়—হরি আর ফিরে আসে না। বনহুর বেশ চঞ্চল হয়ে পড়ে, এতোদিন ভেবেছিলো রাগ বা অভিমান করে হরি কোথাও আত্মগোপন করেছে কিন্তু এবার বনহুর সত্যিই ঘাবড়ে যায়—সব সময় হরি থাকতো তার পাশে পাশে, ছায়ার মত তাকে আগলে রাখতো আর আজ ক'দিন তার কক্ষ শূন্য। বিছানা এলোমেলো ঘরের আসবাব বিক্ষিপ্ত ছড়ানো। যেখানে বনহুর স্লিপিং গাউনটা খুলে রাখে সেখানেই পড়ে থাকে। যেখানে জামাটা ছেড়ে ফেলে দেয় সেখানেই লুটোপুটি খায়, গুছিয়ে রাখার যেন কেউ নেই। সর্বক্ষণ বনহুর হরির অভাব অনুভব করে।

শোহেলী বলে—মিঃ আলম আজকাল আপনাকে বড় ভাবাপন্ন লাগে, ব্যাপার কি বলুন তো?

একটু হেসে বলে বনহুর—শরীরটা ক'দিন ভাল যাচ্ছে না।

ওঃ বুঝেছি হরির জন্য মন খারাপ না কি?

হাঁ, ও থাকতে কোনো অসুবিধা ছিলো না, এখন একটু অসুবিধা হচ্ছে, তাই মনে পড়ে ওর কথা।

সত্যি হরি কিন্তু আপনাকে খুব ভালবাসতো।

হয়তো বাসতো।

হয়তো নয় মিঃ আলম, কতদিন তার সঙ্গে আলাপ করে আমি ওর মনের কথা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু ছোকরা গেলো কেন?

তাইতো ভেবে পাই না।

যাক্ সে গেছে নিজের কপাল নিয়ে গেছে, আমার বয়টা আপনার কাজ করে দেবে।

শোহেলী প্রায়ই এসে হানা দেয় বনহুরের ঘরে। আসুন তাস খেলা যাক।

সময় কাটানোর জন্য না করতে পারে না বনহুর, শোহেলীর সঙ্গে মেতে উঠে তাস খেলায়।

এখানে বনহুরকে যখন শোহেলী তার রূপসুধা পানে প্রলুব্ধ করার চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলো তখন নূরী হরি—রূপ পাল্টে ঢাকায় এক ধনবানের গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলো বোন রূপে।

প্রথম দিনের কথা নূরী ভুলবে না কোনোদিন---হোটেল থেকে বিদায় হয়ে সে যেদিন রাতের অন্ধকারে পথে বেরিয়ে এলো তখন তার সম্বল ছিলো মাত্র কয়েকটা টাকা আর বনহুরের দেওয়া একটা আংটি যা সে কোনোদিন কাছছাড়া করেনি। যখন সে হরি বেশে ছিলো তখন আংটিটা হাতের আংগুলে পরতো না। গোপনে লুকিয়ে রাখতো নিজের কাছে।

নূরী রাতের অন্ধকারে ফুটপাত ধরে এগুতে লাগলো।

কে যেন বলে উঠলো—কোন্ হ্যায়?

হরি পিছনে তাকিয়ে দেখলো দু'জন পুলিশ এগিয়ে আসছে।

সে থেমে পড়লো, হাত জুড়ে বললো—হাম মজুর হ্যায়।

মজুর তো এতনা রাতমে কাহা ঘুমতা?

হুজুর কাম করকে ঘর যাতা।

কাহা তোমরা ঘর?

হুজুর ওধার একটু দূরমে।

জল্দি চল্ যা।

বহুৎ আচ্ছা হুজুর।

হরি দ্রুত পা চালালো কিন্তু কোথায় যাবে এই রাতদুপুরে। পথে কতরকম বিপদ যে ওৎ পেতে বসে আছে কে জানে। এভাবে চলে আসাটা তার ঠিক হয়নি হয়তো। কিন্তু হোটেলে থাকাও যায় না—চোখের সামনে তার হুর অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে যাতা করবে আর সে এসব দৃশ্য নিজে সহ্য করবে— না না, তা সে পারবে না, আর পারবে না বলেই সে আজ বেরিয়েছে—কোথায় চলেছে, কেন চলেছে জানে না হরি।

ক্লান্ত অবশ পা দু'খানা নিয়ে আর সে চলতে পারছে না। অনেক দূর এসে পড়েছে হরি—বেশি নূরী।

এবার তার সম্মুখে দুটো লোক এসে পড়ে হুমড়ি খেয়ে তার গায়ে পড়তে পড়তে বেঁচে যায়। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে হরি, একটা বিদঘুটে গন্ধ লাগে তার নাকে। তাড়াতাড়ি নাকে হাতচাপা দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

লোক দুটোর গা থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছিলো, জড়িত তাদের কণ্ঠস্বর একজন বললো—কে রে হারামজাদা?

অন্য আর একজন বলে উঠে ছেঁচড়া চোর।

হেউ করে ঢেকুর তোলে প্রথম লোকটা—ছেঁচড়া---কি বললি ছেঁচড়া চোর?

হাঁ, তাই হবে, নাহলে এতোরাতে পথে বের হয় কেউ?

তাই তো ঠিক বেটা ছেঁচড়া চোর। ধরিয়ে দে বেটাকে পুলিশে।

এ্যাঁ পুলিশ! বলিস কি আব্দুল পুলিশ যদি দেখে তাহলে ছেঁচড়া চোর ছেড়ে আমাদের হাতে হাতকড়া পরাবে, কাজ নেই ওকে পুলিশে দিয়ে। পালা—পালা বাবা ঝটপট পালিয়ে যা---

হরি বুঝতে পারলো এরা তাড়ি খেয়ে মাতাল হয়েছে। যতদূর সম্ভব দ্রুত সরে পড়লো সেখান থেকে।

আর যে চলতে পারছে না, একটা বড় বাড়ি দেখতে পেয়ে সরে এলো গেটে কোনো পাহারাদার নেই। হরি গেটটা ফাঁক করে ভিতরে প্রবেশ করলো। ওপাশেই সুন্দর একখানা বারান্দা হরি বারান্দায় গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়লো, ভাবলো ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে সরে পড়বে।

কিন্তু হরির ঘুম যখন ভাঙলো তখন ঢাকার রাজপথ সরগরম হয়ে উঠেছে।

ড্রাইভারের ডাকে ঘুম ভাঙলো হরির—এই ছোকরা কোন হো তুম?

ধড়মড় করে উঠে বসে হরি, চোখ রগড়ে তাকায়। সম্মুখে একটা সাদা উর্দী পরা লোক দাঁড়িয়ে আছে। হরি চিনতে পারলো, লোকটা ড্রাইভার ছাড়া কেউ নয়। চোখ তুলে তাকালো হরি।

লোকটা রাগত কণ্ঠে বললো—এই তুম হিয়া কেইসে আয়া?

হরি এবার গেটের দিকে আংগুল দেখিয়ে বললো—ঐ ঐ গেটসে আয়া।

জল্‌দি নিকলো হিঁয়াসে। ফিন্ আয়েগা তব কুত্তা লাগা দেগা।

কুত্তা।

হাঁ।

তুম্ তো এক কুত্তা।

কিয়া হাম্ কুত্তা? নিকলো, আভি হিঁয়াসে নিকলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে বেরিয়ে আসে এক যুবক মূল্যবান সার্ট-প্যান্ট টাই পরা। হরি আর ড্রাইভারকে ঝগড়া করতে দেখে অবাক হয়।

হরি একনজরে দেখে নেয়—হাঁ সুন্দর বটে, তার হুরের মতই দেখতে কতকটা। হরি যুবকের পা থেকে মাথা অবধি দেখতে থাকে।

যুবক হরিকে দেখছে নিপুণ দৃষ্টি মেলে।

ড্রাইভার বলে উঠে—সাহাব, এ ছোকরা বহুৎ কম্ বখৎ হ্যায়। গেট ঘুমাকে অন্তর মে আয়া আওর হিয়া নিদ আয়া। ভাগো হিঁয়াসে---

এবার সাহেব কথা বললো—রেহনে দেও। তারপর হরিকে জিজ্ঞাসা করলো —কে তুমি, কি চাও?

হরি আমতা আমতা করে বলে—আমি —আমি—মানে আমার নাম হরি।

হরি!

হাঁ, আমি একটা চাকরি খুঁজছি সাহেব।

সাহেব বলেন—চাকরি? চাকরি করবে তুমি?

দয়া করে যদি দেন একটা চাকরি?

কি কি কাজ পারো তুমি?

সব পারি, যা আপনি বলবেন।

বেশ, আজ থেকে তুমি থেকে যাও আমার বাড়িতে। মাইনে কত দিতে হবে।

যা খুশি দেবেন। বললো হরি....একদিন বনহুর তাকে এমনি করেই প্রশ্ন করেছিলো, কথাটা মনে হতে চোখ দুটো ছলছলে হয়ে উঠলো তার।

সাহেব বললেন—ড্রাইভার, একে ভিতর বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসো। বাবুর্চিকে বলো, আজ থেকে এ আমাদের বাড়িতে থাকবে।

ড্রাইভার ভেবেছিলো, সাহেব তাকে হুকুম করবে, 'ওকে গলা ধাক্কা দিয়ে গেটের বাইরে বের করে দাও' কিন্তু ভিতর-বাড়ি নিয়ে যাওয়ার কথা শুনে অবাক হলো কিছুটা। বললো—সাহাব, একঠো বাহারকে আদ্‌মী......

হোনে দেও, তুম্‌কো যো বাত বলা উসি কাম করো।

সাহেবের হুকুম ফেলতে পারলো না ড্রাইভার, অগত্যা হরিকে সঙ্গে নিয়ে ভিতর-বাড়িতে চললো।

সেদিন হরি আশ্রয় পেলো এ বাড়িতে।

কিন্তু হরি অবাক হলো অন্দরবাড়িতে প্রবেশ করে। কোনো মেয়েমানুষ নেই এ বাড়িতে। চিন্তায় পড়লো হরি কিন্তু এখন চলে যাবার কোনো উপায় নেই।

হরির কাজ বুঝিয়ে দিলো বাবুর্চি।

ড্রাইভার সাহেবকে নিয়ে বেরিয়ে গেলো তখনকার মত।

বাবুর্চি হরিকে কাজ বুঝিয়ে দিলো, সেইভাবে কাজ করতে লাগলো সে।

একসময় হরি বাবুর্চিকে জিজ্ঞাসা করে বসলো—আচ্ছা বাবুর্চি, তোমাদের সাহেবের মেম সাহেব কই?

বাবুর্চি হেসে বললো—সাহেব তো এখনো বিয়ে করেননি।

ওঃ তাই বুঝি কোনো মেয়েমানুষ দেখছি না?

হাঁ।

সাহেব শুধু একা থাকেন?

না, তাঁর এক বন্ধু থাকেন এ বাড়িতে।

বন্ধু?

হাঁ, তাঁর নাম সমীর কুমার বাবু।

সেকি, তোমাদের সাহেব হিন্দু নাকি?

হিন্দু হতে যাবে কেন?

তবে যে তাঁর বন্ধুর নাম সমীর কুমার বাবু বললে?

কেন, মুসলমান লোকের বন্ধু হিন্দু হয় না?

তা হবে না কেন? হয়। আচ্ছা বাবুর্চি, তোমাদের সাহেবের নামটা কি বললে নাতো?

বাঃ ঢাকা শহরে থাকো আমাদের সাহেবের নাম জানো না?

তা জানবো কেমন করে?

শুধু ঢাকা নয়, গোটা পৃথিবীর লোক সবাই তাঁকে চিনে।

সবাই চিনে কিন্তু আমি তো আর চিনি না। বলো না কি তাঁর নাম?

তাঁর নাম মিঃ আহাদ চৌধুরী—প্রখ্যাত ডিটেকটিভ, বুঝলে?

হরি অবাক হয়ে নামটা উচ্চারণ করে মিঃ আহাদ চৌধুরী, প্রখ্যাত ডিটেকটিভ.......

হাঁ, বিখ্যাত ডিটেকটিভ আমাদের সাহেব। মস্ত বড় বড় চোর, ডাকু খুনীকে......হাত দু'খানা গামছা দিয়ে জড়িয়ে ফেলে বলে—এইরকম করে ধরে বেঁধে ফেলেছে। চলো, পরে সব গল্প এক এক করে শোনাবো, এখন কাজ করবে চলো?

হরি বাবুর্চিকে অনুসরণ করে।

অল্পক্ষণ পরেই বাইরে শোনা যায় গাড়ির হর্ণ, পরক্ষণেই কলকণ্ঠ ভেসে আসে—আহাদ, রাতটা কেমন করে কাটালাম তোমাকে কি বলবো বন্ধু?

সাহেবের গলা—ঘরে চলো সব শুনছি।

ড্রইংরুমে এসে বসলেন মিঃ আহাদ আর তার বন্ধু সমীর কুমার।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় গোয়েন্দা মিঃ আহাদ চৌধুরী এবং তাঁর সহকারী মিঃ সমীর কুমারকে কে না চিনে! আহাদ চৌধুরী সব সময় দেশ-বিদেশেই কাটান, যদিও তাঁর মাতৃভূমি পূর্ব-পাকিস্তানের এক বিশিষ্ট পল্লীতে। দেশে তাঁর একমাত্র মা ছাড়া আর কেউ নেই। মস্ত বড় জমিদারের সন্তান তিনি। যদিও এখন জমিদারী প্রথা নেই তবু তাদের যে বিষয়-আসয় আছে তা প্রচুর। অগাধ ঐশ্বর্য আর অর্থের অধিকারী মিঃ আহাদ চৌধুরী।

বয়স হয়েছে তবু তিনি বিয়ে করেননি। দেশে মা নাসিমা খানম খুব করে ধরেছেন, এবার তাকে বিয়ে করতেই হবে। মায়ের অনুরোধ এতোদিন এগিয়ে চললেও এবার আর রেহাই নেই, তাই মিঃ আহাদ ঢাকায় এসে আস্তানা গেড়েছেন। বিরাট এক সমস্যা দেখা দিয়েছে তাঁর সামনে এই বিয়ে ব্যাপারটা নিয়ে।

আহাদ চৌধুরী এ বাড়িটা ভাড়া নিয়েছেন প্রায় মাস কয়েক হবে, মাঝে কয়েকবার দেশে মায়ের কাছেও গিয়েছিলেন। মা বলেছেন—বাবা আহাদ, এবার যদি বিয়ে করে ঘরের লক্ষ্মী ঘরে না আনো তবে আমি আত্মহত্যা করবো।

মিঃ আহাদ সব খুলে বলেছেন তাঁর বন্ধুবর সমীরের কাছে, সমীর চিন্তিত হয়ে পড়েছে—তাই তো, বড় বিপদের কথা! বিয়ে না করলে হবে মাতৃহত্যা আর বিয়ে করলে হবে আত্মহত্যা। কারণ সমীর জানে, তার বন্ধু আহাদ অনেকদিন পূর্বেই দস্যুরাণীকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করেছেন।

ক'দিন হলো সমীর ব্যস্তভাবে রাণীর সন্ধানে ঢাকা শহর চষে ফিরছে। তাকে যে না পেলেই নয়, দস্যুরাণী সম্প্রতি মন্থনা দ্বীপের কাজ শেষ করে ফিরে এসেছে আস্তানায়।

সমীরের বিশ্বাস, মিঃ আহাদ যেখানেই থাকুক না কেন, দস্যুরাণীও সেখানে আগমন করবে। প্রকাশ্যে দেখা না দিলেও সে গোপনে সব সময় লক্ষ্য রেখেছে তাঁর উপর, তাই সমীর নিশ্চিন্ত। কিন্তু দিনের পর দিন গড়িয়ে যাচ্ছে, কই তার পাত্তাটি নেই আজও।

আহাদ চৌধুরীর চেয়ে বেশি ঘাবড়ে গেছে সমীর, যেমন করে হোক রাণীকে তার খুঁজে বের করতেই হবে। গোটা দিন ঢাকা শহরে সে সন্ধান চালিয়ে এসেছে কিন্তু কোথায় দস্যুরাণী! সমীর জানে, রাণীকে একবার দেখলেই সে চিনে নিবে। পথে কত মেয়েকেই সে রাণী বলে ভুল করেছে। শেষ পর্যন্ত ইন্টার কন্টিনেন্টাল হোটেলে গিয়ে আর ফিরে আসতে পারেনি। হঠাৎ পরিচয় হয়ে গেছে তার মিঃ আলমের সঙ্গে। এ কথার-সে কথার মধ্যে রাত বেড়ে গিয়েছিলো তাই ফিরতে আর পারেনি। মিঃ আলমের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলো সে। ভোরে টেলিফোনে জানিয়ে দিয়েছিলো সমীর

আমি হোটেল ইণ্টারকন্টিনেন্টালে আটকা পড়ে গেছি, এসে নিয়ে যাও আমাকে।

মিঃ আহাদ ঘুম থেকে জেগেই ফোন পেয়ে ছুটেছিলেন বন্ধু বরকে নিয়ে আসতে।

ড্রইংরুমে বসে কপালে আঘাত করলো সমীর—কই কোথাও তাকে খুঁজে পেলাম না। বন্ধু এখন উপায়?

মিঃ আহাদ হাতের সিগারেটটা এ্যাসট্রেতে গুঁজে রেখে সোজা হয়ে বসলেন, একটু নীরস হাসি হেসে বললেন—ঘরের ছাদে উষ্ট্রের অন্বেষণের মতই ঢাকা শহরে তোমার রাণীকে খোঁজা, বুঝলে? কোথায় মন্থনা দ্বীপ, শিখান্দ্রী পর্বত আর কোথায় ঢাকা শহর!

সমীর গম্ভীর কণ্ঠে বললো—আহাদ, তুমি বড্ড ছেলেমানুষের মত কথা বললে?

কি রকম?

জানো না, রাণীর অসাধ্য কিছুই নয়। নিশ্চয়ই রাণী এতোদিন আস্তানা থেকে চলে এসেছে তোমার সন্ধানে।

এই ঢাকা শহরে?

হাঁ।

সম্ভব নয়, কারণ রাণী এমন সময় আস্তানা ছেড়ে কিছুতেই আসতে পারে না। জানো তো কত কাজ বাকি আছে ওর আস্তানায়।

জানি। তবু আমার মন বলছে সে আসবে।

মিঃ আহাদ একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলেন, মন তাঁর চলে গেছে দূরে, অনেক দূরে কোনো অজানা দেশে। সমীরের কথায় কোনো জবাব দেন না তিনি।

সমীর বললো—কি হে, চুপ করে রইলে যে? বলো আমার কথা ঠিক কিনা? আমি জানি, সে তোমার সন্ধানে আসবেই আসবে।

বেশ, তুমি তাহলে রোজ একবার করে ঢাকা শহরটা চষে বেড়াও, কি বলো?

কিন্তু কাল থেকে ভাড়াটে ট্যাক্সিতে আর যাচ্ছি না। তোমার গাড়িটা এবার আমাকে দেবে।

আর আমি?

তুমি ভাড়াটে গাড়ি ব্যবহার করবে।

আচ্ছা, তাই হবে। মিঃ আহাদ পুনরায় আর একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলেন, সম্মুখস্থ ধুম্রকুন্ডলির দিকে তাকিয়ে বললেন মিঃ আহাদ—আচ্ছা সমীর?

বলো বন্ধু?

হোটেলে যে ভদ্রলোকটিকে দেখলাম মানে তুমি যার আশ্রয়ে কাল রাত কাটিয়েছো...

মানে মিঃ আলমের কথা বলছো তো?

হাঁ, লোকটাকে কিন্তু সম্পূর্ণ বাঙ্গালি বলে মনে হয় না।

তোমার সন্দিগ্ধ মনে একটুতেই সন্দেহ জাগে।

না না তা বলছি না, বলছি লোকটা অত্যন্ত ভদ্র ও মহৎ।

সত্যি, দেখলে তো অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাদের সঙ্গে কেমন ভাব জমিয়ে নিয়েছিলেন ভদ্রলোক?

সারারাত বুঝি গল্প করে কাটিয়েছো?

হাঁ, কত গল্প করলেন!

আর শুনলেন তোমার কাছে, না?

তা একটু শুনলেন বই কি!

সব কথা তো ফাঁস করে দাওনি? মানে রাণীর কথা?

না না, সমীরকে এখনও তুমি বোকা মনে করো বুঝি? আচ্ছা আহাদ?

বলো?

ভদ্রলোককে তুমি যে দাওয়াত করে এলে, তা হঠাৎ এতো আদর কেন?

তোমাকে একদিন আপ্যায়িত করেছেন কাজেই তাকে একদিন নিমন্ত্রণ না জানালে কেমন দেখায় বলো?

হাঁ ঠিক্ বলেছো আহাদ, ভদ্রলোক কিন্তু বড্ড মিশুক।

মিশুক তো বটেই কিন্তু আর একটি জিনিস লক্ষ্য করেছি তার মধ্যে।

কি?

অদ্ভুত সৌন্দর্যের অধিকারী ভদ্রলোক।

একেবারে নির্ভুল একটা কথা বলেছো আহাদ, যেমন তোমার সৌন্দর্য্যে বিশ্বের লোক বিমুগ্ধ তেমনি ঐ ভদ্রলোকের রূপ!

কি যে বলো, আমার আবার সৌন্দর্য্য দেখলে কোথায়?

যাও অতো ন্যাকা সাজতে হবে না। সত্যি আহাদ, তোমরা দু'জন কিন্তু ভাই-ভাই মনে হয়। যেমন তুমি তেমনি মিঃ আলম।

নাও হয়েছে, এবার উঠো।

কোথাও যাবে নাকি?

না, তোমাকে বেরুতে হবে। ওঃ আর একটা কাজ করেছি সমীর, তোমাকে না বলেই একটা বয় রেখেছি।

বয়?

হাঁ, বেচারা বড্ড গরিব.....

আর তুমি তাকে তাই রেখে দিলে?

না দিয়ে কি করি বলো?

কেন, আমাদের বাড়ি ছাড়া কি আর বাড়ি ছিলো না ঢাকা শহরে?

ছিলো কিন্তু কোথায় অতো খুঁজবে, তাই রেখে দিলাম। দেখবে ছেলেটা বেশ কাজে পাকা।

কাজ না দেখেই খুব যে তারিফ করছো?

চলো, কাজ দেখবে চলো। উঠে দাঁড়ান মিঃ আলম।

সমীরও উঠে পড়তে বাধ্য হয়।

হরি তখন মসলা করছিলো, মরিচের ঝালে হরির রক্তাভ গন্ড আরও রক্তাভ হয়ে উঠেছে। খুব কষ্ট হচ্ছিলো তার।

মিঃ আহাদ আর সমীর এসে দাঁড়ালো।

সমীর বললো—আরে ছোঃ এই বুঝি মসলা করা?

তবে কি মসলা বাটা? হেসে বললেন মিঃ আহাদ।

সমীর ভ্রূ কুঁচকে বললো—এই ছোকরা, তুম্‌কো নাম ক্যা?

আরে বাংলায় বলো, ও খাঁটি বাংলা ভাষী।

এ্যাঁ, বাংলা জানে নাকি? তবে ঠিক পাঞ্জাবী ছোকরার মত লাগছে। তা মাথায় আবার পাগড়ী কেন?

ওটা ওর অভ্যাস।

বল্ ছোকরা, তোর নাম কি?

মসলা করতে করতে হরি হয়রাণ হয়ে পড়েছিলো। মিঃ আহাদ আর সমীরের সামনে আরও বিব্রত বোধ করছিলো সে। বললো—আমার নাম হরি।

হরি! তুই হিন্দু? বললো সমীর।

হরি কিছু বলবার পূর্বেই বললেন মিঃ আহাদ—হাঁ হিন্দু।

যাক্ বাঁচালে, তবুও ভাল পাকিস্তানে হিন্দু চাকরও পাওয়া যায় তাহলে? এই হরি, আজ থেকে তুই আমার চাকর, বুঝলি?

দেখলে কেমন বন্ধুর মত কাজ করেছি? বললেন মিঃ আহাদ।

❑

আজ বাবুর্চি বাজারে গেছে, হরি রান্নাঘরে কি যেন কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছে। হরির মন সব সময় বিষণ্ন ভাবাপন্ন থাকে। কি যেন ভাবে সে সর্বক্ষণ। আত্মগোপন করে সে আশ্রয় নিয়েছে এ বাড়িতে কিন্তু তার অন্তরে সদা-সর্বদা তার হুরের চিন্তা। যার জন্য সে সুদূর কান্দাই থেকে হাজার

হাজার মাইল দূর পূর্ব পাকিস্তানে এসে পড়েছে, তাকে ত্যাগ করে চলে এসেছে সে ক্ষুণ্ন হয়ে। না জানি তার অন্বেষণে হুর ঢাকা শহর চষে ফিরছে কিনা?

সমীর কুমার ড্রাইভারসহ গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছে কোনো কাজে, বাসায় আছেন মিঃ আহাদ চৌধুরী। বাবুর্চি সাহেব আর তার বন্ধুকে নাস্তা খাইয়ে তবে গেছে। এতোবড় বাড়িখানা সম্পূর্ণ নীরব।

হরি কি যেন করছে এমন সময় পিছনে এসে দাঁড়ালেন মিঃ আহাদ, শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে ডাকলেন—হরি!

ফিরে তাকালো হরি, চোখেমুখে একটা বিব্রতভাব ফুটে উঠেছে তার।

মিঃ আহাদ বললেন—কে তুমি?

আজ্ঞে?

বলো কি উদ্দেশ্য নিয়ে তুমি আমার বাসায় এসেছো?

আমি...আমি......

কঠিন কণ্ঠে বললেন মিঃ আহাদ—ন্যাকামি করো না, বলো কি উদ্দেশ্য নিয়ে তুমি এখানে এসেছো?

সাহেব আমি, আমি একজন বয় ছাড়া কিছু নই.....

মিঃ আহাদ একটানে খুলে ফেললেন হরির মাথার পাগড়ীটা। সঙ্গে সঙ্গে কোঁকড়ানো একরাশ রেশমী চুল ছড়িয়ে পড়লো হরির চোখেমুখে। প্রকাশ পেয়ে গেলো তার নারীরূপ।

তুমি পুরুষ সেজে আমাকে ধোকা দিয়ে বয় সেজেছিলে, কিন্তু সবার চোখে ধুলো দিলেও আমার চোখে পারবে না। বলো, কি উদ্দেশ্য নিয়ে তুমি এখানে এসেছো?

নূরীর মুখমন্ডল রক্তাভ আকার ধারণ করলো, মিঃ আহাদের দিকে চোখ তুলে তাকাতে সাহসী হলো না আর সে, নতমুখে বললো—বিশ্বাস করুন, আমি কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আসিনি।

তবে পুরুষের ড্রেসে এ অভিনয় কেন?

মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইলো নূরী। সহসা কোনো জবাব দিতে পারলো না। কিই বা জবাব দেবে সে,তবু বললো—আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না সাহেব। আমি শপথ করে বলছি, আপনাদের কোনো অন্যায় করবো না।

কে তুমি?

আমার নাম নূরী।

কোথায় তোমার বাড়ি? নিশ্চয়ই তুমি বাংলা দেশের মেয়ে নও।

না, আমার দেশ কান্দাই।

কান্দাই? পশ্চিম পাকিস্তানের নিকটে যে কান্দাই আছে?

হাঁ।

তুমি এ শহরে এলে কি করে?

আমার স্বামীর সঙ্গে এসেছিলা, কিন্তু আমার স্বামী........

থেমে গেলো নূরী।

মিঃ আহাদ বললেন—থামলে কেন?

আমার স্বামী আমাকে ভালবাসেন না। 'না' শব্দটা বলতে নূরীর খুব কষ্ট হচ্ছিলো, তারপর বললো—তাই আমি চলে এসেছি।

মিঃ আহাদের মনে একটা মায়ার সঞ্চার হলো, তিনি বললেন—বেশ, তাহলে থাকো। কিন্তু আমার বাসায় তো কোনো মেয়েছেলে নেই, কাজেই তোমার অসুবিধা হতে পারে। একটু চিন্তা করে বললেন—বেশ, তুমি হরির বেশেই থাকবে।

আচ্ছা সাহেব। বললো নূরী!

আহাদ চৌধুরী কিছুক্ষণ নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলেন নূরীর অনাবৃত মুখমন্ডলের দিকে, মুগ্ধ হয়ে গেলেন তিনি নূরীর অপরূপ সৌন্দর্যে।

নূরী দৃষ্টি তুললো, মিঃ আহাদের সঙ্গে চোখোচোখি হতেই মাথা নত করে নিলো।

নূরী বললো—আমার বড় ভাই নেই, আপনি আমার ভাই।

মিঃ আহাদ হেসে বললেন—বেশ, তাই হবে। একটু ভেবে নিয়ে বললেন—হরির বেশ ত্যাগ করে তুমি নতুনভাবে এ বাড়িতে আগমন করো—আমার বোন হয়ে, কেমন?

হরির চোখেমুখে ফুটে উঠলো কৃতজ্ঞতার ছাপ।

আহাদ চৌধুরী বললেন—এসো আমার সঙ্গে।

হরিকে নিয়ে গেট পেরিয়ে পথে এসে দাঁড়ালেন আহাদ চৌধুরী একটা বেবী টেক্সি ডেকে উঠে পড়লেন হরিকে নিয়ে। তারপর যখন ফিরে এলেন, তখন হরি নয়, মিঃ আহাদের সঙ্গে এক তরুণী।

ততক্ষণে সমীর এসে পড়েছে, বন্ধুর সঙ্গে এক যুবতীকে দেখে প্রথমে হতবুদ্ধি হয়ে যায়, পরে সামলে নিয়ে বলে—ব্যাপার কি বন্ধু?

মিঃ আহাদ হেসে বললেন—হঠাৎ রেহানার ফোন পেয়ে চলে গেলাম....ওর আগে পরিচয় করিয়ে দি। এর নাম সমীর কুমার—আমার সহকারী এবং বন্ধু, আর এর নাম মিস রেহানা—আমার মামার মেয়ে মানে মামাতো বোন।

বাঃ বাঃ চমৎকার! সমীর হা করে নূরীর পা থেকে মাথা অবধি দেখতে লাগলো। দু'চোখে তার রাজ্যের বিস্ময়, নির্নিমেষ নয়নে দেখছে। নূরীর দেহে সম্পূর্ণ আধুনিক তরুণীর ড্রেস। ফিকে গোলাপী শাড়ি-ব্লাউজ, হাতে

গোলাপী রুমাল, পায়েও গোলাপী স্যান্ডেল। একটি ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে, তার রংটাও ফিকে গোলাপী। একরাশ সোনালী চুল ছড়িয়ে আছে কাঁধের উপর—অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছে নূরীকে বাঙ্গালি মেয়ের ড্রেসে।

মিঃ আহাদ বললেন— নিয়ে চলো ওকে পথ দেখিয়ে।

হাঁ তাই তো, আসুন আসুন মিস রেহানা, ভিতরে চলুন। ছিঃ ছিঃ এতোক্ষণ মেহমানকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখে! আহাদ আর নূরী সমীরকে অনুসরণ করলো।

সমীর তো ভিতরে প্রবেশ করে ডাকাহাকা শুরু করলো—হরি, ও হরি, কোথা গেলি হতভাগা?

বাবুর্চি রান্নাঘর থেকে গলা বাড়িয়ে বললো—স্যার, হরি পালিয়েছে।

হরি পালিয়েছে—বলো কি!

বাবুর্চি এবার সম্মুখে এসে দাঁড়ায়—স্যার, প্রথমেই বলেছিলাম বাইরের ছোকরাদের বিশ্বাস নেই, দেখলেন তো কেমন করে চোখে বালি দিয়ে পালালো!

মিঃ আহাদ মনে মনে কৌতুক অনুভব করলেও মুখে গাম্ভীর্য টেনে বললেন—যে চলে গেছে তাকে নিয়ে ব্যস্ততা দেখিয়ে আর লাভ হবে না। এসো রেহানা।

হাঁ, ঘরে চলো বোন। দেখো বন্ধুর বোন বলে আমিও কিন্তু তোমাকে 'তুমি' বলবো, মনে কিছু নিও না।

নূরী তো হাবা বনে গেছে—কোথায় চাকর হয়ে এসেছিলো আর কোথায় একেবারে গৃহস্বামীর বোন!

সেদিন থেকে নূরীর জন্য মিঃ আহাদের বাড়িতে একটি কামরা বেছে দেওয়া হলো।

কয়েক দিনের মধ্যেই নূরীর সঙ্কোচ কেটে এলো ধীরে ধীরে। মিঃ আহাদ আর সমীরের কাছে হয়ে এলো সে সচ্ছ-স্বাভাবিক। একসঙ্গে বসে খাওয়া, একসঙ্গে গল্প করা, একসঙ্গে বেড়াতে অভ্যস্ত হয়ে গেলো নূরী।

প্রায়ই মিঃ আহাদের সঙ্গে নূরী নিউমার্কেট যেতো, সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করে আনতো দু'জনে মিলে। কোনোদিন সমীরও যেতো তাদের সঙ্গে। নূরীর সঙ্গে আহাদের পবিত্র ভ্রাতৃত্ব ভাব জমাট বেঁধে উঠেছিলো দিন দিন গভীরভাবে। ছোট বোনের মতই আব্দার করে নূরী তাঁর সঙ্গে।

অবশ্য নূরীর মনে একটা অভিসন্ধি ছিলো, নিউ মার্কেট গেলেই সে মিঃ আহাদের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকতো। আর চারিদিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করতো বনহুরের সাক্ষাৎ পায় কিনা!

একদিন নূরীর অভিসন্ধি পূর্ণ হলো......নিউ মার্কেটে একটা দোকান থেকে বের হচ্ছে মিঃ আহাদ আর নূরী, ঠিক সেই মুহূর্তে অদূরে এগিয়ে আসছে বনহুর। নূরীর দৃষ্টি গিয়ে পড়লো তার উপর। বনহুরের হাতে একটা প্যাকেট ছিলো, সে গম্ভীর ভাবাপন্নভাবে এগিয়ে আসছে।

নূরী ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ বলে উঠলো—ভাইজান উঃ বড্ড মাথা ঘুরছে। পড়ে গেলাম, ধরুন আমাকে......

মিঃ আহাদ নূরীকে ধরে ফেললেন।

নূরী মিঃ আহাদের হাতের মধ্যে হাত রেখে চলতে লাগলো।

ঠিক সেইদন্ডে বনহুরের দৃষ্টি এসে পড়লো মিঃ আহাদ আর নূরীর উপর। মুহূর্তে তার মুখ কঠিন হয়ে উঠলো, একবার শুধু তাকিয়ে দেখে নিয়ে দ্রুত বিপরীত দিকে চলে গেলো।

নূরী ইচ্ছা করেই এই দৃশ্যটা বনহুরের দৃষ্টিপথে তুলে ধরলো। বনহুর চলে যেতেই নূরী বললো—এখন অনেকটা ভাল লাগছে। একাই চলতে পারবো।

পড়ে যাবে না তো?

না।

বাসায় ফিরে নূরীর মনে আজ আনন্দ ধরে না। কেমন একটা ধোকা আজ সে লাগিয়ে দিয়েছে তার বনহুরের মনে। এমনি একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো নূরী।

মনোবাসনা সফল হওয়ায় নূরী যখন খুশি হয়েছে তখন বনহুর হোটেলে ফিরে নিজকে কিছুতেই সংযত রাখতে পারছিলো না। কক্ষমধ্যে পায়চারি করছিলো আর ভাবছিলো, নূরী এমন হয়ে গেছে! সে আর একজনকে ভালবাসতে পারলো! এতোটুকু লজ্জা বোধ হলো না তার। কিছুতেই বনহুরের বিশ্বাস হচ্ছিলো না ব্যাপারটা। না না, এ কখনও হতে পারে না—কিন্তু নিজের চোখকে সে কি করে অবিশ্বাস করবে! বনহুর অধর দংশন করে, যে ভদ্রলোকটির সঙ্গে নূরীর এতো মাখামাখি দেখলো সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে ক'দিন আগে পরিচয় ঘটেছিলো বনহুরের হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে। বনহুরের সঙ্গে যখন তাঁর আলাপ হয়েছিলো তখন সে তো তাকে মহৎ ব্যক্তি বলেই মনে করেছিলো কিন্তু নূরীর সঙ্গে এতোদূর ঘনিষ্ঠতা হলো কি করে!

বনহুর ইচ্ছা করলে ওদের ফলো করতে পারতো কিন্তু তার মনে সে প্রবৃত্তি জাগেনি, একটা অসহ্য দ্বন্দ্ব মনকে অস্থির করে তুলেছিলো।

বনহুর কক্ষমধ্যে পায়চারি করে চলেছে, এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করে শোহেলী—গুড নাইট মিঃ আলম!

গম্ভীর কণ্ঠে বলে বনহুর—গুড নাইট।

চলুন না নাইট শো দেখে আসি?

সম্ভব নয় আজ।

কেন?

বনহুর শোহেলীকে এড়াবার জন্য বললো—বড্ড মাথা ধরেছে।

তাহলে চলুন রমনা পার্কে।

এ'সময় রমনা পার্কে—বলেন কি!

মিঃ আলম, আমার বড় খারাপ লাগছে, চলুন না কোথাও?

রায় বাবু কোথায়? তিনি বুঝি বাইরে গেছেন? বললো বনহুর।

শোহেলী একটা দীর্ঘশ্বাস গোপনে চেপে নিয়ে বললো—আজকাল উনি প্রায় রাতই বাইরে থাকেন।

ভ্রূ কুঁচকে তাকালো বনহুর—প্রায় রাতই উনি বাইরে থাকেন?

হাঁ।

কিন্তু আপনি একদিন বলেছিলেন, আপনার স্বামী মাতাল কিন্তু চরিত্রহীন নন?

হাঁ, আমি তাই জানতাম। তাছাড়া তার যে অবস্থা তাতে তাকে চরিত্রহীন ভাবাটা আমার মনের বিরুদ্ধে ছিলো।

আপনার কি সন্দেহ হয় তিনি কোনো নাইট ক্লাব বা কোনো সন্দেহজনক স্থানে যান?

না, আমার তেমন কোনো সন্দেহ হয় না।

আপনি তাকে এ সম্বন্ধে কোনোদিন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন?

করেছিলাম, কিন্তু উনি কোনো জবাব দেননি। আমিও তাই তেমন করে আর জানতে চাইনি। অবশ্য ওর প্রতি আমার আর কোনো আপত্তি নেই। যেখানে খুশি যাক থাক তাতে আমার কিছু যায় আসে না। মিঃ আলম, আমি ঐ বৃদ্ধের হাত থেকে পরিত্রাণ চাই। বাঁচতে চাই......ধপ্ করে বসে পড়ে শোহেলী বনহুরের শয্যার উপর।

বনহুর হাতঘড়ির দিকে তাকায় রাত আটটা বেজে গেছে। টেবিলে খাবার দেওয়ার সময় প্রায় হয়ে এসেছে। বললো বনহুর—খেয়ে নিয়ে 'মধুমিতা' হলে যাওয়া যাক।

হঠাৎ মতের পরিবর্তন হলো কেন?

মনেই ছিলো না মধুমিতা হলে একটা ভাল ছবি হচ্ছে। ক'দিন ভেবেছি যাবো-যাবো কিন্তু হয়েই উঠেনি।

মিঃ আলম!

বনহুর চোখ তুলে তাকালো—একি, শোহেলীর চোখেমুখে এক করুণ বেদনার ছাপ ফুটে উঠেছে! সহসা বনহুর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারে না, শোহেলীর দৃষ্টি যেন তাকে আকর্ষণ করছে। বনহুর নিজের শিরায় শিরায় অনুভব করলো এক শিহরণ। বুকের মধ্যে হৃদপিন্ডটা টিপটিপ করছে, বনহুর এগিয়ে গেলো দরজার দিকে, লঘু হস্তে দরজার খিল বন্ধ করে দিলো। তারপর কয়েক পা সরে এসে দাঁড়ালো শোহেলীর পাশে। নিশ্বাস দ্রুত বইছে বনহুরের। একটা কু'প্রবৃত্তি দানবের মত জেগে উঠলো তার মধ্যে। ধীরে ধীরে কোনো অতলে তলিয়ে যাচ্ছে যেন বনহুর। শোহেলীর দক্ষিণ হাতখানা দৃঢ়ভাবে চেপে ধরলো হাতের মুঠায়। তারপর এক ঝাঁকুনি দিয়ে টেনে নিলো নিজের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে কে যেন বনহুরের কানে কানে বলল.....ছিঃ এ তুমি কোথায় নামতে যাচ্ছো বনহুর! তুমি না কঠিন সংযমী পুরুষ। আনমনা হয়ে যায় বনহুর, উজ্জ্বল ইলেকট্রিক আলোতে তার ললাটে ঘর্মবিন্দুগুলো ঠিক মুক্তাবিন্দুর মত ঝকঝক করছে। প্রশস্ত ললাটে কয়েক গুচ্ছ চুল লেপটে আছে কৃষ্ণরেখার মত।

শোহেলী নিষ্পলক চোখে তাকায় বনহুরের পৌরুষদীপ্ত মুখমন্ডলের দিকে, উন্মত্ত এক নেশায় তার সমস্ত দেহখানা যেন শিথিল হয়ে আসছে। একি সে স্বপ্ন দেখছে না জেগে আছে—মিঃ আলমের বাহুবন্ধনে শোহেলী—নিজের অস্তিত্ব যেন হারিয়ে ফেলছে সে!

বনহুর ওকে টেনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিবেক তাকে বাধা দিলো। নিজকে সংযত করে নিলো সে শক্তভাবে, তারপর বললো—শোহেলী, আপনি চলে যান, চলে যান এই মুহূর্তে আমার ক্যাবিন থেকে। না না, এ অসম্ভব—অসম্ভব......

শোহেলীকে একরকম প্রায় ধাক্কা দিয়েই সরিয়ে দেয় বনহুর নিজের বাহুবন্ধন থেকে। বিরক্তি আর ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত হয়ে উঠে তার।

শোহেলী অসংযত আঁচলখানা কোনোরকমে তুলে দেয় কাঁধের উপর। সমস্ত মুখমন্ডল তার লজ্জায়, ক্ষোভে রাঙা হয়ে উঠেছে। একটি কথাও সে উচ্চারণ করতে পারলো না মুখ দিয়ে। আস্তে আস্তে দরজার পাশে এসে দাঁড়ালো।

বনহুর দরজা মুক্ত করে দিয়ে বললো—আর কোনোদিন এভাবে আসবে না।

শোহেলী কোনো জবাব দিলো না, বেরিয়ে যাবার সময় একবার তাকালো শুধু বনহুরের মুখের দিকে, তারপর চলে গেলো সে নিজের কামরার দিকে।

পরদিন বনহুর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল ত্যাগ করে চলে গেলো, কোথায় গেলো কেউ জানে না।

❑

গ্রীন হাউস নাইট ক্লাব।

ঢাকা শহরের বিশিষ্ট এক ক্লাব, এ ক্লাবে শহরের নামকরা গণ্যমান্য ব্যক্তি ছাড়া কেউ পদার্পণ করতে সক্ষম হয় না। এ ক্লাবের মেম্বারদের মধ্যে সবাই প্রায় কোটিপতি। সন্ধ্যার পর এ ক্লাব উজ্জ্বল নীলাভো আলোয় আলোকিত হয়ে উঠে।

গ্রীন হাউসের রং গাঢ় সবুজ না হলেও ফিকে সবুজ রং করা। কোথাও সাদা বা গোলাপীর চিহ্ন নেই। সন্ধ্যার পর এই ক্লাবটাকে স্বপ্নপুরী বলে মনে হয়। সাধারণ জনগণ এ ক্লাব দর্শন করা তো দূরের কথা, কোনোদিন নামটাও বুঝি শুনেছে কিনা সন্দেহ। ঢাকাবাসিগণ এ ক্লাবের নাম অনেকেই জানে না। জানলেও চেনে না কোথায় এ ক্লাব।

সন্ধ্যার পর তেমন ভিড় না হলেও বেশ রাতে এ ক্লাবের সম্মুখে রাস্তায় নানা বর্ণের গাড়ির লাইন জমে উঠে। নতুন ঝকঝকে গাড়ি—প্রেসিডেন্ট, প্লিমাউথ, ষ্টুডি কমান্ডার, ওপেলকার, কুইনকার, মাষ্টার বুইক, আরও কতরকম গাড়ি এসে জমে তার সংখ্যা বলা যায় না। যেমন সব গাড়ি তেমনি তার সব আরোহী। গাড়ির মতই ঝকঝকে চাকচিক্যময় পোশাকধারী সব আগন্তুকের আগমনে সরগরম হয়ে উঠে গ্রীন হাউস।

একখানা ষ্টুডি কমান্ডার গাড়ি এসে থামলো গ্রীন হাউসের সামনে। গাড়ি থেকে নেমে এলো একজন লোক। গ্রীন হাউসের আলোতে স্পষ্ট দেখা গেলো। লোকটা ঢাকার এক মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী। হাতে তার একটি ব্যাগ। মাড়োয়ারী গাড়ি থেকে নেমে প্রবেশ করলো গ্রীন হাউসের মধ্যে।

সোজা সে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলো উপরে।

সিঁড়ির মুখেই দাঁড়িয়ে ছিলো দুটো সাহেবী পোশাক-পরা ভদ্রলোক। মাড়োয়ারী বাবুকে দেখে তারা অভ্যর্থনা জানালো, তারপর নিয়ে গেলো সঙ্গে করে।

উপরে গিয়ে আর একটা সিঁড়ি নেমে গেছে নীচের দিকে। সেই সিঁড়ি বেয়ে তিনজন নামতে লাগলো নীচে। ওদিকে সিঁড়ির মুখেই ছোট্ট একটা কক্ষ। কক্ষমধ্যে একটা বড় টেবিল। কয়েকজন লোক সেই টেবিলে বসে আলাপ-আলোচনা করছে। মাড়োয়ারী বাবুকে দেখে সবাই দাঁড়ালো।

মাড়োয়ারী বাবু ও তার সঙ্গীদ্বয় সে কক্ষে না দাঁড়িয়ে ওদিকের দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেলো, দেয়ালে চাপ দিতেই দেয়ালের এক অংশে একটি

ছোট্ট দরজা বেরিয়ে এলো। মাড়োয়ারীবাবু আর ভদ্রলোক দু'জন প্রবেশ করলো সেই দরজার মধ্যে। আশ্চর্য, দরজাটা সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেলো।

কিছু পরে দরজা খুলে গেলো—আবার একজন বেরিয়ে এলো ভিতর থেকে, টেবিলে যে লোকগুলো বসে গল্পগুজব করছিলো তাদের লক্ষ্য করে বললো—আজকের প্লেনে কারা যাচ্ছো?

দু'জন উঠে দাঁড়ালো—শরীফ আর মদন।

এসো তোমরা।

শরীফ আর মদন উঠে ভিতরে চলে গেলো। লোকটিও তাদের সঙ্গে গেলো।

ওপাশে কক্ষ বা সিঁড়ি নেই—একটা লিফ্ট। লোক দু'টিসহ লোকটা লিফ্টে চড়ে দাঁড়ালো। লিফ্ট এবার সা সা করে নেমে চললো নীচে।

কেউ কল্পনা করতে পারবে না এতো নীচে কোনো গোপন কক্ষ থাকতে পারে গভীর মাটির তলায়। কক্ষটা বেশ বড়সড়, কক্ষের চারপাশে অসংখ্য মেশিন আর কলকব্জা। । কতরকম ছোটবড় মেশিন রয়েছে এখানে তা বুঝা মুস্কিল। কতরকম যন্ত্রপাতি আছে সেই কক্ষে। নানারকম ঔষধপত্রের শিশিও আছে সাজানো। কক্ষের মাঝখানে একটা বড় সেক্রেটারী টেবিল। পাশে তিনখানা মাত্র চেয়ার সাজানো, ওপাশের বড় আর উঁচু চেয়ারটায় বসে আছে জমকালো পোশাক-পরা একটা লোক। মুখে মুখোস, হাতে গ্লাব্স, পায়ে বুট। মুখোসে মুখখানা তার সম্পূর্ণ ঢাকা। এতোটুকু শরীর তার বাইরে দেখবার উপায় নেই। কালো মুখোসের মধ্যে খুদে দু'টি চোখ যেন পিট পিট করছে।

ভয়ঙ্কর আর অদ্ভুত লাগছে লোকটাকে। পাতালপুরীর মেশিনময় কক্ষটার মধ্যে যেন সে একটা দানব বসে আছে। তার পাশে বসে আছে মাড়োয়ারী লোকটা।

ভদ্রলোকটি শরীফ আর মদনসহ এসে দাঁড়ালো অদ্ভুত লোকটার সামনে।

অদ্ভুত পোশাক-পরা লোকটা বললো—তোমরা দু'জন যাচ্ছো আজ।

হাঁ হুজুর! বললো একজন।

অদ্ভুত লোকটা কি যেন ইংগিত করলো, সঙ্গে সঙ্গে ভদ্র-বেশি লোকটা ওদের দু'জনাকে ওদিকে একটা মেশিনের পাশে নিয়ে দাঁড় করালো।

মেশিনটার পাশে কালো এপ্রন-পরা দু'টি লোক অপেক্ষা করছে, এরা দু'জন গিয়ে দাঁড়াতেই এপ্রন করা লোক দুটো এদের একজনকে মেশিনটার উপর শুইয়ে দিলো, একটা পাইপের মত রবার প্রবেশ করিয়ে দিলো তার মুখের মধ্যে। প্রায় হাতখানেক পাইপ চলে গেলো লোকটার গলার ভিতরে,

তারপর পাইপের মুখ দিয়ে কয়েকটা লম্বা-মত বস্তু প্রবেশ করিয়ে দিলো গলার মধ্যে। দ্বিতীয় ব্যক্তির গলার মধ্যেও এইভাবে কিছু লম্বা আকারের বস্তু প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হলো মেশিনের সাহায্যে।

পাইপ দুটো বের করে নিতেই লোক দু'জন উঠে দাঁড়ালো। সম্পূর্ণ সুস্থ সবল দেহ, কোনো অসুস্থতার লক্ষণ নেই তাদের মধ্যে। শুধু আজ নয়, এদের গলায় এইভাবে অনবরত পাইপ প্রবেশ করিয়ে মেশিনের সাহায্যে সোনা প্রবেশ করানো হয়ে থাকে এবং তাদের পাঠানো হয় দেশ-বিদেশে।

লোক দু'জনার একজনকে একটা মেশিনের সম্মুখে দাঁড় করানো হলো। মেশিনটা এক্স-রে যন্ত্রের মত কতকটা দেখতে। আসলে এক্স-রে যন্ত্র নয় সেটা। এবার মুখোসধারী লোকটা বাইনোকুলারের মত কিছু একটা যন্ত্র চোখে লাগিয়ে যে লোকটাকে মেশিনের সামনে দাঁড় করানো হয়েছে তার পিছনে এসে দাঁড়ালো।

মেশিনে যে লোক কাজ করছিলো তার দেহে ছিলো রবারের জমকালো ড্রেস। লোকটা মেশিনের সুইচ্ টিপলো, সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত আলোকরশ্মি বেরিয়ে এলো। লোকটা বাইনোকুলার লাগিয়ে স্পষ্ট দেখতে পেলো, লোকটার পেটের মধ্যে সোনার টুকরোগুলো স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে।

দ্বিতীয় জনকেও এইভাবে অদ্ভুত রশ্মি দ্বারা পরীক্ষা করে দেখার পর ছেড়ে দিলো।

লোক দুটো জামাকাপড় পরে ভালভাবে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। মাড়োয়ারী লোকটা একগাদা টাকা বের করে লোক দু'জনকে দিলো আর দু'টো প্লেনের পাস দিলো—নিয়ে যাও, বোইং-এর পাস রইলো। দেখো সাবধানে যেও, কেউ যেন কোনোরকম সন্দেহ করতে না পারে।

হুজুর, আজ কি নতুন যাচ্ছি; কতবার গেলাম আর এলাম, একটুও ভুল হয়নি। কথাগুলো বললো শরীফ নামক লোকটা।

তারপর লোক দু'জন মুখোস-পরা লোকটাকে সেলুট করে বেরিয়ে গেলো। আবার সেই লিফ্ট, তারপর সিঁড়ি, সিঁড়ির শেষে কঠিন পাথরের মজবুত দেয়াল, তারপর ছোট্ট কক্ষ। কক্ষমধ্যে গোলটেবিল, সেই টেবিলের চারপাশ ঘিরে বসে আড্ডা মারছে কয়েকজন জোয়ান বলিষ্ঠ লোক। এদের দ্বারাই গ্রীন হাউস নাইট ক্লাব থেকে গোপনে সোনা চালান হয়ে থাকে।

এক-একদিন এক-এক বেশে এরা প্লেনের যাত্রী সেজে দেশ হতে দেশান্তরে পাড়ি জমায়। কখনও যায় ট্রেনযোগে, কখনও যায় এরা সদরঘাট হয়ে ষ্টিমার, লঞ্চে বা জাহাজে।

কে এরা, কি করে এরা, কেউ জানে না। গ্রীন হাউসের এরা মালিক ও সর্বেসর্বা।

মূল্যবান খানাপিনা আর নানারকম বাদ্যযন্ত্রের ঐক্যতালে মুখর হয়ে থাকতো গ্রীন হাউসের অভ্যন্তর। কতলোক আসতো আর যেতো তার ইয়ত্তা নেই—এ সবের পিছনে চলেছে সোনা চালানীর গোপন কারবার।

লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পদ চলে যায় দেশ হতে দেশান্তরে, কেউ এর সন্ধান জানে না বা পায় না। গ্রীন হাউসের মালিক কে, তারও কেউ খবর রাখে না!

অদ্ভুত রবারের পোশাক-পরা লোকটাই যে এই গ্রীন হাউসের মালিক এবং সর্বেসর্বা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মাড়োয়ারী লোকটা বিদেশী ব্যবসায়ী, তার দেশ বা বাড়ি কোথায় কেউ জানে না। সম্প্রতি ঢাকায় একটা ব্যবসা খুলে বসেছে। অল্পদিনের মধ্যেই নামও করেছে লোকটা ঢাকা শহরে। ইতিপূর্বে ঢাকায় তেমন কোনো মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী ছিলো না, তাই শশাঙ্ক নারায়ণ দেওজীকে সবাই চেনে।

অদ্ভুত মুখোস-পরা লোকটা দেওজীর সঙ্গে কি যেন সব আলাপ করলো, তারপর দেওজীর নিকটে কয়েক ফাইল টাকা রেখে বললো—পঞ্চাশ হাজার নিয়ে যান দেওজী বাবু।

আচ্ছা! দেওজী টাকার ফাইলগুলো হাতের এ্যাটাচী ব্যাগের মধ্যে উঠিয়ে নিলো তারপর বেরিয়ে গেলো দ্রুত পদক্ষেপে!

মাড়োয়ারী ভদ্রলোক গাড়িতে উঠে বসে পাশের আসনে হাতের ব্যাগটা রাখলো তারপর গাড়িতে ষ্টার্ট দিলো সে। গাড়ি উল্কা বেগে ছুটতে শুরু করলো।

গাড়িখানা এ-পথ সে-পথ করে করে তেজগাঁ অভিমুখে চলেছে। একটা নির্জন পথে গাড়িখানা প্রবেশ করতেই তিনি তার পিঠে একটা শক্ত কিছু অনুভব করলো, সঙ্গে সঙ্গে চাপা গম্ভীর কণ্ঠস্বর—গাড়ি রুখো।

দেওজী চমকেই উঠলো না শুধু, আতঙ্কে শিউরে উঠলো—তার পিঠে শক্ত বস্তুটা যে কি সে অনুভবেই বুঝতে পেরেছে। ভয়-বিহ্বল কণ্ঠে বললেন—কে তুমি? কি চাও?

গাড়ি রুখো, সব দেখতে পাবে।

দেওজী গাড়ি রুখতে বাধ্য হলো, ফিরে তাকাতেই তার নজরে পড়লো একটা সাহেবী পোশাক-পরা লোক-মাথায় ক্যাপ, মুখে কালো রুমাল জড়ানো, দক্ষিণ হস্তে তার রিভলভার। ভয়ে বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো তার মুখমন্ডল, হতভম্ব হয়ে বললো—কি চাও? কে তুমি?

লোকটা ততক্ষণে দেওজীর হাত থেকে ব্যাগটা এক ঝটকায় কেড়ে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়লো, একটা কাগজের টুকরা তার হাতে দিয়ে বললো—নাও, এর মধ্যে আমার পরিচয় পাবে—যাও এবার।

দেওজীর কণ্ঠ দিয়ে কোনো কথা বের হলো না, সে ভয়কম্পিত হস্তে গাড়ির হ্যান্ডেল চেপে ধরলো।

সোজা দেওজী পুলিশ অফিসে এসে হাজির হলো। ভয়-বিহ্বলভাবে হন্তদন্ত হয়ে অফিসে প্রবেশ করে হাঁপাতে লাগলো। কিছুক্ষণ তার কণ্ঠ দিয়ে কোনো কথা বের হলো না।

পুলিশ অফিসের কর্মব্যস্ত অফিসারগণ সবাই দেওজীকে এভাবে হাঁপাতে দেখে আশ্চর্য হলেন। পুলিশ ইন্সপেক্টর মিঃ হাফিজ উদ্দিন তাকে বসার জন্য অনুরোধ জানালেন।

দেওজী আসন গ্রহণ করলো, তারপর বললেন—স্যার, হামার সব গিয়াছে! হামার সব গিয়াছে......

কি হয়েছে খোলাসা বলুন? জিজ্ঞাসা করলো মিঃ হাফিজ।

অন্যান্য পুলিশ অফিসার বিস্মিতভাবে প্রতীক্ষা করছেন কি বলবেন ভদ্রলোক তাই শোনার জন্য।

দেওজী শুকনো ঠোঁট দু'খানা জিভ দিয়ে চেটে নিয়ে অসহায় কণ্ঠে বললো—ডাকু হামার সব নিয়াছে ইন্সপেক্টর বাবু। হামার পঞ্চাশ হাজার রূপেয়া......কথা বলার ফাঁকে পকেট থেকে একটা কাগজের টুকরা বের করে ইন্সপেক্টারের হাতে দিলেন।

ইন্সপেক্টার কাগজের টুকরাটা মেলে ধরলেন উজ্জ্বল ইলেকট্রিক আলোর সম্মুখে, সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুটধ্বনি করে উঠলেন তিনি—দস্যু বনহুর!

পুলিশ অফিসের মধ্যে আচমকা একটা প্রতিধ্বনি জাগলো—দস্যু বনহুর? কি বললেন, ঢাকায় দস্যু বনহুর.....

সবাই ঝুঁকে পড়লো কাগজের টুকরাখানার উপর। শুধু আশ্চর্য নয়, এ যেন এক প্রচন্ড বিস্ময়কর ব্যাপার। এতোদিন ঢাকার অধিবাসিগণ দস্যু বনহুরের নামই শুধু শুনে এসেছে, কল্পনার চোখে তার চেহারার প্রতিচ্ছবি এঁকেছে, তার অস্তিত্ব অনুভব কেউ করেনি। এবার স্বয়ং দস্যু বনহুর ঢাকায় আবির্ভূত হয়েছে!

সমস্ত ঢাকা শহরে কথাটা ছড়িয়ে পড়লো বিদ্যুৎগতিতে। পত্রিকায় পত্রিকায়, লোকের মুখে মুখে। সকলের মনেই ভয়-ভীতি আর স্পন্দনের অনুভূতি।

সাড়া পড়ে গেলো গোটা শহরময়—ঢাকা শহরে দস্যু বনহুর!

কু'কর্ম দ্বারা যারা ধনবান অর্থশালী হয়েছেন তাদের পিলে চমকে গেলো, হৃদকম্প শুরু হলো তাদের। এতোদিন বেশ আরামে গোপনে ব্ল্যাক মার্কেট চালিয়ে এবং নানারকম জঘন্য উপায়ে পয়সা কামিয়ে লক্ষপতি হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন—এবার একি জ্বালা হলো! এতোদিন চিন্তা ছিলো না কিছু, গরিবদের বুকের রক্ত শুষে নিলেও প্রতিবাদ করবার কেউ ছিলো না। যদিও কেউ করতো—তার মুখ বন্ধ করতে কতক্ষণ! গলা টিপে কণ্ঠরোধ করে দেওয়া হতো, নয় রাইফেলের গুলীতে।

কিন্তু যারা মহৎ, যারা সত্যিকারের দেশপ্রেমিক, ন্যায়নীতি যাদের উদ্দেশ্য, তারা আনন্দে আপ্লুত হলেন। এমন কি ছোটবড় সবাই খুশিতে দীপ্ত হয়ে উঠলেন, দস্যু বনহুর তাদের দেশে আগমন করেছে—এ যেন তাদের সৌভাগ্য। সকলেরই ইচ্ছা, একবার যদি তার ভাব-গম্ভীর মিষ্টি কণ্ঠস্বর শুনতে পেতো তাহলে হয়তো ধন্য হয়ে যেতো। বয়স্ক মহিলারা দস্যু বনহুরকে স্নেহ আর প্রীতির চোখে দেখেন। মধ্যবয়স্ক মহিলাগণ তাকে ভালবাসে সহোদরের মত। আর অবিবাহিতা তরুণীগণ বনহুরকে শ্রদ্ধা জানায় অন্তরে অন্তরে। এমন একজনকে কে না কামনা করে!

দস্যু বনহুর তার ভাড়াটে বাড়ির দ্বিতল একটি কক্ষে বসে সব শুনতে পায়, সব জানতে পারে পত্রিকার পাতায়। গতরাতে সে দেওজীকে ফলো করেছিলো কিন্তু হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে থাকাকালীন শোহেলীর স্বামী রায় বাহাদুরকে ফলো করে একদিন পৌঁছে গিয়েছিলো গ্রীন হাউস নাইট ক্লাবে। নতুন আগণ্তুকের বেশেই সে এ ক্লাবগৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলো।

তারপর বনহুর সরে পড়েছিলো একদিন ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল থেকে।

দেওজীর পঞ্চাশ হাজার লুট হবার দু'দিন পর মগবাজার এক ধন কুবেরের বাড়িতে হানা দিয়ে দস্যু বনহুর প্রায় বিশ হাজার টাকা আর বহু সোনা নিয়ে উধাও হয়।

পরপর দু'টি অদ্ভুত ডাকাতিতে পুলিশমহলে চাঞ্চল্য দেখা দিলো। শুধু পুলিশমহলেই নয়, ঢাকা শহরে সৃষ্টি হলো এক ভীতি-ভাব।

বনহুর যেন উন্মাদ হয়ে উঠলো—তেজগাঁ বিমান বন্দর থেকে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বাসায়-ফিরছিলেন, সঙ্গে ছিলো তার অনেক টাকা-পয়সা আর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র। পথের মধ্যে হানা দিয়ে বনহুর সব লুটে নিলো।

পরদিন সংবাদপত্রে খবরটা ছড়িয়ে পড়লো ভীষণ আকারে।

ঢাকায় এভাবে দস্যুতা কোনোদিন হয়নি—একি শুরু হলো এবার! রাস্তা-ঘাটে, পথে-মাঠে, স্কুটারে, বাসে, ট্রেনে, সব জায়গায় ঐ এক কথা—দস্যু বনহুর ঢাকায় এসেছে, সব শয়তান এবার জব্দ হবে। যেমন একদিকে

ভয়-ভীতি আর আতঙ্ক, তেমনি অন্যদিকে খুশির উচ্ছ্বাস। যারা দুঃস্থ অসহায় তাদের মনে অফুরন্ত আনন্দ।

বনহুর যেমনভাবে পয়সা লুটে নিতে লাগলো তেমনিভাবে ছড়িয়ে দিতে লাগলো অসহায় গরিব দিনহীন অনাথদের মধ্যে। পথের ধারে ফুটপাতে পড়ে ধুকে ধুকে যারা মরছে, যারা খর রৌদ্রতাপ বিদগ্ধ পিচঢালা পথে সামান্য পেরিওয়ালা হয়ে গলাফাটা চিৎকার করে মরছে দু'টো পয়সার জন্য, যারা কাঁধে থলে নিয়ে আনাচে-কানাচে 'শিলপাটা ধার কাটাও' বলে আকুল আহ্বান জানাচ্ছে, হয়তো বা সারাটা দিনে একটি টাকাও কামাতে পারছে না। একটু একটু করে তারা গোটা দিনে হয়তো দশ মাইল পথ হেঁটেছে, কামিয়েছে মাত্র একটি টাকা। ঘরে পাঁচটি ছেলেমেয়ে আর স্ত্রী—একটি বা দু'টি টাকায় কি-ই বা হবে তাদের! শহরের ভদ্রসমাজে আশ্রয় না পেয়ে যারা ঘর বেঁধেছে রেললাইনের দু'পাশে জলার মধ্যে—এই-সব গরিব বেচারাদের বনহুর মুক্তহস্তে দান করে চলেছে। কিভাবে কখন সে এদের সাহায্য করতো কেউ বুঝতো না, কেউ জানতো না। এমন সময় একদিন ঢাকা শহরের আশেপাশের অঞ্চল কালবৈশাখীর প্রচন্ড দাপটে চুরমার হয়ে গেলো, শত শত বাড়ি-ঘর ধসে পড়ে নিহত আর আহত হলো অগণিত মানুষ।

এসব এলাকায় এমন কোনো বাড়ি রইলো না যাদের কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। কোনো পরিবার একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। কোনো পরিবারে সব মারা পড়লো, হয়তো বা বেঁচে রইলো একটি প্রাণী। কোনো বাড়িতে মা-বাবা সব মরেছে, বেঁচে আছে একটি শিশু। পিতা হারালো পুত্র, পুত্র হারালো পিতা। স্ত্রী হারালো স্বামী-সন্তান। স্বামী হারালো স্ত্রী-পুত্র-কন্যা। সে এক মর্মান্তিক বীভৎস লীলা—কালবৈশাখীর এক ভয়ঙ্কর ধ্বংস খেলা!

যারা সর্বহারা হলো তারা প্রায় সকলেই গরিব অসহায়। যাদের পেটে অন্ন জোটে না, পরনে কাপড় জোটে না, মাথায় তেল পড়ে না, এরাই হলো কালবৈশাখী রাক্ষসীর প্রথম শিকার।

শুধু তারা সর্বস্বান্তই হলো না, হারালো তাদের সবকিছু। মাথা গুজার মত আশ্রয়টুকুও রইলো না তাদের। কালবৈশাখী সব নিঃশেষ করে নিয়ে গেছে—ধুয়ে-মুছে নিয়ে গেছে সব। কারো ঘরে একমুঠি অন্ন নেই যা তারা ভক্ষণ করে বেঁচে থাকবে। সবাই তো মরেছে—যারা বেঁচে আছে তাদের অবস্থা অবর্ণনীয়। একদিন দু'দিন নয়, কেউ কেউ চার-পাঁচদিন অনাহারে রয়েছে। এক গেলাস পানিও তাদের ভাগ্যে জুটছে না। ছোট ছোট শিশুগুলো আকুল হয়ে কাঁদছে, মা-বাবা-ভাই-বোন হারিয়ে ভাঙ্গাচুরা শূন্য ভিটায় দাঁড়িয়ে খুঁজছে হারানো বাপ-মাকে। হায়, আর কি সে কোনোদিন ফিরে পাবে তার বাপ-মা-ভাইবোনদের!

কোনো ধ্বংসস্তূপের পাশে বসে কাঁদছে বৃদ্ধা মা, সন্তান তার গিয়েছিলো মিলে কাজ করতে—আর সে ফিরে আসেনি। শুধু বৃদ্ধার একমাত্র সন্তানই নয়, এমনি কত বৃদ্ধা মাতার শত শত সন্তান এই প্রচন্ড ঝড়ে প্রাণ হারিয়েছে, কে তার হিসাব সঠিক বলতে পারবে!

সরকার সহানুভূতি জানিয়েছেন, এসব অঞ্চলের জন্য সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন। কিন্তু কবে আসবে তাদের হাতে এই টাকা, আর কবে তারা মাথা গোঁজার আশ্রয় করে নেবে, খাবে দু'টি অন্ন পেট পুরে। শত শত মৃতদেহের স্তূপের পাশে বসে বিলাপ করে চলেছে তারা।

যেদিকে তাকাও দেখবে শুধু মৃতদেহ। কি নৃশংস ভয়ানক করুণ দৃশ্য!

অগণিত দেশসেবক ছড়িয়ে পড়েছে এসব বিধ্বস্ত এলাকায়। তারা প্রাণপণে সাহায্য করে চলেছে, শত শত শ্রমিক ধ্বংসস্তূপের মধ্য হতে উদ্ধার করে চলেছে বিকৃত গলিত মৃতদেহগুলো। চারিদিকের আকাশ-বাতাস দুর্গন্ধে বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। লোকজন এসব লাশের সৎকার করতে ব্যস্ত, এক-এক কবরে তিন-চারটির বেশি লাশ দাফন চলেছে তবু শেষ নেই। আহতদের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হচ্ছে—কত মরছে, কত জীবিত থাকছে তার হিসাব নেই।

দস্যু বনহুরও এগিয়ে এসেছে কালবৈশাখী রাক্ষসীর করাল গ্রাসে বিধ্বস্ত এলাকায়, সে অন্যান্য জনসাধারণের সঙ্গে মিশে গেছে এক হয়ে। কখনও বৃদ্ধ শ্রমিকের বেশে, কখনও চাষী কিষাণ মজুরের বেশে, কখনও সাধারণ নাগরিক বেশে সে প্রত্যেকটা অসহায় নরনারীর পাশে এসেছে বন্ধু সেজে। কেউ তাকে চিনতে পারেনি, কেউ বুঝতে পারেনি কে সে। সরকারের অর্থ তখনও এসে পৌঁছায়নি, বনহুর সরকারের পক্ষ হয়ে তাদের মধ্যে অর্থ বিতরণ করে চলেছে। কার কি প্রয়োজন যথাসাধ্য চেষ্টায় তার প্রয়োজন মেটাতে সে দ্বিধা বোধ করেনি। কার আশ্রয় নেই, কার মুখে খাবার নেই, কার ঔষধের প্রয়োজন সব অভাব বনহুর মোচন করার জন্য উন্মুখ। সরকারের অর্থ এসে পৌঁছতে এখনও বিলম্ব আছে—ততদিন কি করে বাঁচবে এরা? জনসাধারণ তারাও মুক্ত হস্তে ঝড়-বিধ্বস্ত এলাকার দুঃস্থ ভাই-বোনদের জন্য দান করে চলেছেন, কিন্তু এতো বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এসব অঞ্চলে যা প্রচুর অর্থেও পূর্ণ হবার নয়।

বনহুর তার লুণ্ঠিত অর্থ সব বিলিয়ে দিতে লাগলো এইসব দুঃস্থ লোকজনদের মধ্যে। সবাই জানে, সেও সরকারের প্রেরিত একজন মহৎ হৃদয় ব্যক্তি।

নিঃস্ব-রিক্ত-অসহায় যারা, তারা সবাই বনহুরকে বন্ধু বলে গ্রহণ করে। কেউ জানে না তার আসল পরিচয়।

❑

সমীরের আনন্দভরা কণ্ঠস্বর শোনা যায়—আহাদ, দেখো কাকে ধরে এনেছি।

মিঃ আহাদ মনোযোগ সহকারে সেদিনের ইংরেজি পত্রিকাখানা দেখছিলেন। পর পর কয়েকটা দস্যুতার খবরই তিনি পেয়েছেন। ঢাকা শহরে দস্যু বনহুরের আবির্ভাব তাকে শুধু আশ্চর্যই করেনি, বিস্ময়াহত করে তুলেছে। কোথায় সুদূর কান্দাই শহর আর কোথায় পূর্ব-পাকিস্তান-ঢাকা। দস্যু বনহুর এখানেও আগমন করেছে, এ কম কথা নয়। ঢাকার পুলিশ সুপার মিঃ রফিকুল আলম স্বয়ং মিঃ আহাদ চৌধুরীকে দস্যু বনহুরকে গ্রেফতার করতে আহ্বান জানিয়েছেন। আজকের পত্রিকা দেখছিলেন আর ভাবছিলেন দস্যু বনহুর সম্বন্ধে নানা কথা।

সমীরের উচ্ছলকণ্ঠে চোখ তুলে তাকালেন, সমীরের সঙ্গে মিঃ আলমকে দেখে উঠে অভ্যর্থনা জানালেন—আসুন, আসুন মিঃ আলম......

বনহুর প্রথম দিনের মত হাস্যোজ্জ্বল দীপ্ত নয়, তার মুখমন্ডলে গাম্ভীর্যের ছাপ বিদ্যমান। সেদিন সেই ভদ্রলোকের হাতে হাত রেখেই নূরীকে সে নিউমার্কেটে চলতে দেখেছে। একটা ক্ষুব্ধভাব জমাট বেঁধে আছে তার মনের মধ্যে।

মিঃ আহাদ হাত বাড়ালেন মিঃ আলমের দিকে, হ্যান্ডশেক করলেন তিনি তার সঙ্গে।

বিশ্ববিখ্যাত ডিটেকটিভ আর বিশ্ববিখ্যাত দস্যুর হলো অপূর্ব মিলন। কেউ কম নয়—মিঃ আহাদ তাঁর ন্যায়-নীতি আর কর্মে অটল, দস্যু বনহুরও তেমনি তার দুর্ধর্ষ কর্মব্যস্ততায় অবিচল।

আসন গ্রহণ করলো ওরা দু'জনা।

সমীর ওপাশের সোফায় বসে পড়ে বললো—আহাদ, তুমি সেদিন উনাকে দাওয়াত করে আসার পর আমি ঠিক সময় তাঁকে আনতে গিয়েছিলাম, কিন্তু হোটেলে গিয়ে দেখি উনি উধাও। ম্যানেজারের কাছে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, উনি হোটেল ত্যাগ করে চলে গেছেন। বাস্, আমার মনটা গেলো খারাপ হয়ে—ভদ্রলোক এমন করে কোথায় ডুব মারলেন আচম্বিতে! যাক্, ফিরে এসে আহাদ তোমাকে কিছু বললাম না, কারণ তুমিও হয়তো মনে আমার মতই ব্যথা পাবে। ভদ্রলোক কথা দিলেন,

না—এ কেমন......একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলো সমীর—আজ হঠাৎ পথের মধ্যে দেখা তাই ধরে আনলাম.......

হেসে বললেন মিঃ আহাদ—তোমার কাছে আজ পর্যন্ত কেউ পালিয়ে বেঁচেছেন যে উনি বাঁচবেন। দেখুন মিঃ আলম, সমীর কিন্তু বড্ড রসিক মানুষ, ওর কথায় আপনি কিছু মনে করবেন না।

বনহুরের ঠোঁটের কোনে একটু হাসি ফুটে উঠলো মাত্র।

বললো সমীর—তোমরা আলাপ করো, আমি ভিতরে চা-নাস্তার আয়োজন করতে বলে আসি।

বেরিয়ে গেলো সমীর।

মিঃ আহাদ সিগারেট-কেসটা মেলে ধরলেন বনহুরের সামনে—নিন।

বনহুর আলগোছে একটা সিগারেট তুলে নিলো।

মিঃ আহাদই সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলেন মিঃ আলমের পরে নিজের! একরাশ ধুম্র নির্গত করে বললেন—মিঃ আলম, আপনি এসেছেন, অনেক খুশি হয়েছি।

বনহুর ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললো—সত্যি আমি দুঃখিত যে, সেদিন আপনাকে কথা দিয়েও আসতে পারিনি।

আমি জানতাম, আপনি ভীষণ কোনো অসুবিধায় পড়েছিলেন।

হাঁ, আপনি যা বলেছেন অত্যন্ত সত্য, যে অসুবিধা আমাকে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ত্যাগে বাধ্য করেছে।

হাসলেন মিঃ আহাদ—আপনার কামরায় বসেই সেদিন আমি বুঝতে পেরেছিলাম। অবশ্য আপনার অপরূপ সৌন্দর্যই এর মূল কারণ।

মিঃ আহাদের কথায় বনহুরের মুখমন্ডল গম্ভীর হয়ে উঠলো, দৃষ্টি নত করে নিয়ে কিছু ভাবলো সে। বুঝতে পারলো, সেদিন মিঃ আহাদ যখন তার কামরায় বসে আলাপ করছিলেন তখন মিসেস শোহেলী প্রবেশ করেছিলো—শুধু প্রবেশই করেনি তার পাশে এমন ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছিলো যার জন্য বনহুর নিজেও লজ্জাবোধ করছিলো তখন। অবশ্য পরিচয় করে দিয়েছিলো বনহুর মিসেস শোহেলীর সঙ্গে মিঃ আহাদের। এই মুহূর্তে আহাদ যে মনোভাব নিয়ে কথা বললো তা সম্পূর্ণ ইংগিতপূর্ণ।

বনহুরও একটু বিদ্রূপ-ভরা গলায় বললো—মিঃ চৌধুরী, আপনিও এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেয়েছেন বলে মনে হয় না। কারণ.....যাক্ কেমন আছেন বলুন দেখি?

মিঃ আহাদ বুঝতে পারলেন, মিঃ আলম এ প্রসঙ্গ থেকে সরে পড়তে চান, কাজেই শান্তকণ্ঠে বললেন—ভাল আছি, তবে মনের অবস্থা মোটেই ভাল নয়।

হাঁ, বছরের প্রথমেই কালবৈশাখী রাক্ষসীর প্রচন্ড থাবা চুরমার করে দিয়ে গেছে কতকগুলো অসহায় জনগণকে। যাদের হাহাকার আর করুণ রোদনে ভরে উঠেছে আকাশ-বাতাস।

মিঃ আলম, আপনি ঠিক্ বলেছেন, নব বৎসরের আগমনী আনন্দে দেশের মাটি যখন আত্মহারা সেই মুহূর্তে কালবৈশাখীর নির্মম পদক্ষেপ সব আনন্দ-হাসি-গান নিভে গেছে দপ করে। সত্যিই এই নৃশংস দৃশ্য সহ্য করা অত্যন্ত কঠিন।

আনমনা হয়ে যায় বনহুর, তার চোখের সামনে ভেসে উঠে এক নিদারুণ করুণ মর্মস্পর্শী দৃশ্যের প্রতিচ্ছবি।

মিঃ আহাদ সিগারেটের ধুম্ররাশির ফাঁকে নিপুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন মিঃ আলমের মুখে। তীক্ষ্ণ তীব্র সে দৃষ্টি।

এমন সময় বাবুর্চির হাতে চা-নাস্তার সরঞ্জামসহ কক্ষে প্রবেশ করলো সমীর, মিঃ আহাদ ও মিঃ আলমকে গম্ভীর ভাবাপন্নভাবে বসে থাকতে দেখে বললো—কি ভাবছো বন্ধুদ্বয়? বড় যে উদাস লাগছে তোমাদের? ব্যাপার কি?

মিঃ আহাদ এ্যাসট্রেতে হাতের সিগারেটটা গুঁজে রেখে সোজা হয়ে বসলেন।

বনহুর সত্যিই একটু উদাস হয়ে পড়েছিলো, সে চট করে নিজকে সংযত করে নিয়ে হাসলো।

সমীর বাবুর্চির হাত হতে চা-নাস্তার ট্রেটা নিয়ে মাঝখানের টেবিলে নামিয়ে রাখলো—নাও বন্ধু শুরু করো। মিঃ আলম, একটু চা পান করুন।

মিঃ আহাদ সামান্য চানাচুর মুখে ফেলে চিবুতে চিবুতে বললেন—কালবৈশাখীর মৃত্যু ছোবলে শত শত লোক যখন চরম অবস্থার সম্মুখীন, সেই মুহূর্তে আর একটা অলৌকিক বিস্ময়কর ঘটনার উদ্ভব ঘটেছে—সে হলো দস্যু বনহুরের আবির্ভাব।

হাঁ, দস্যু বনহুরের আবির্ভাব অলৌকিক বিস্ময়করই বটে। স্থিরকণ্ঠে কথাটা বললো মিঃ আলম।

সমীর বলে উঠলো—এখন একটু চুপ করো দেখি। 'দস্যু বনহুর, দস্যু বনহুর' বলছো—হঠাৎ এখানে যদি তার আবির্ভাব ঘটে তখন কি হবে বলোতো? মানও যাবে, জানও যাবে! নাও, চা-নাস্তা খেতে খেতে যত পারো গল্প করো, আপনিও নিন মিঃ আলম।

বনহুরও খেতে শুরু করলো।

সমীরও খেতে খেতে বললো—আমি আর বাদ যাই কেন।

মিঃ আহাদ হেসে বললেন—ডাক্তার না তোমাকে মিষ্টি খেতে বারণ করেছেন?

সর্বনেশে কথা বলো না বন্ধু, মিষ্টি আমার তোমার চেয়েও প্রিয়।

বনহুরও খেতে খেতে হাসিতে যোগ দিলো।

সমীর বললো—আজকের খাবারগুলো যেন অমৃত হয়েছে।

বাবুর্চিকে ধন্যবাদ দিতে হয়। বললেন মিঃ আহাদ।

সমীর বলে উঠে—আমার বোন, আমার বোন তৈরি করেছে আজ খাবারগুলো, বুঝলে? ভারী খাসা হয়েছে কিন্তু......

বনহুর চুপচাপ খাচ্ছিলো, ভাবলো নিশ্চয়ই এসব নূরীর তৈরি, মনে মনে ক্ষুব্ধভাব জেগে উঠলেও তাকে বাধ্য হয়ে কিছুটা মুখে করতে হলো।

এমন সময় বাইরে গাড়ি থামার শব্দ হলো।

একটু পরেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলেন পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ হাফিজ।

মিঃ আহাদ উঠে অভ্যর্থনা জানালেন—আসুন মিঃ হাফিজ, বসুন।

মিঃ হাফিজ আসন গ্রহণ করলেন।

মিঃ আহাদ পরিচয় করিয়ে দিলেন মিঃ আলমের সঙ্গে পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ হাফিজের। তারপর চা-নাস্তা খাওয়ার জন্য অনুরোধ জানালেন।

মিঃ হাফিজ জানালেন, এইমাত্র তিনি চা পান করে এসেছেন, কাজেই সম্ভব নয়।

খাওয়া শেষ হলো, সমীর বাবুর্চিকে আদেশ দিলো সব নিয়ে যেতে। তারপর শুরু হলো আলাপ-আলোচনা।

মিঃ হাফিজ বললেন—মিঃ চৌধুরী, দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারে আপনি আমাদের সহায়তা করছেন কিনা, জানতে চাই?

মিঃ আহাদ একটু চিন্তিত সুরে বললেন—ঠিক কথা দিতে পারছি না, তবে যতদূর সম্ভব আপনাদের সঙ্গে থাকতে চেষ্টা করবো।

করবো নয় করতে হবে, আপনি যখন এ সময় ঢাকায় এসেছেন তখন আপনাকে ছাড়ছি না আমরা। মিঃ হাফিজের কথার মধ্যে বেশ জোর ছিলো।

মিঃ আহাদ প্রাইভেট ডিটেকটিভ, তিনি সখের গোয়েন্দা। খেয়ালের বশে তিনি এ কাজ করেন, এসব কাজে তিনি কোনোদিন পারিশ্রমিক নেন না।

মিঃ আহাদ শেষ পর্যন্ত দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন বলে কথা দিলেন।

ইন্সপেক্টর মিঃ আলমের সামনে এসব ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে একটু ইতস্ততঃ করছিলেন, সমীর হেসে বলে—আরে, ইনিও আমাদের একজন বন্ধুলোক। এর সামনে আপনি সবকথা অকপটে বলতে পারেন।

সমীরের কথায় মিঃ আহাদের মুখমন্ডল গম্ভীর হলো, কিন্তু কোনো উত্তর দিলো না তিনি।

আলাপ-আলোচনা শেষ করে চলে গেলেন মিঃ হাফিজউদ্দিন। যাওয়ার সময় তিনি মিঃ আলমের হ্যান্ডশেক করলেন।

মিঃ আহাদ আর আলম যখন মিঃ হাফিজকে গাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে ড্রইংরুমে ফিরে আসছিলেন তখন নূরী আড়াল থেকে সব লক্ষ্য করছিলো। বনহুর এসেছে দেখে তার মন আনন্দে আপ্লুত হয়ে উঠছিলো, খুশিতে বুক ভরে উঠেছিলো তার।

সেদিনের মত বনহুর যখন বিদায় চাইলো তখন মিঃ আহাদ তাকে স্বয়ং পৌঁছে দেবার জন্য উঠে পড়লেন। অল্প সময়েই তাদের মধ্যে এক গভীর বন্ধুত্ব ভাব গড়ে উঠেছিলো।

অবশ্য মিঃ আহাদ মিঃ আলমের সঙ্গে একটু বেশি জড়িয়ে পড়ার জন্য আগ্রহশীল ছিলেন।

গাড়িতে বসে বললেন মিঃ আহাদ—মিঃ আলম, দস্যু বনহুর সম্বন্ধে আপনার ধারণা কেমন?

ভ্রূকুঞ্চিত করে ফিরে তাকালো বনহুর মিঃ আহাদের দিকে—আমি ঠিক আপনার কথাটা বুঝতে পারছি না?

মানে দস্যু বনহুর সম্বন্ধে আপনি যা শুনলেন তাতে আপনার কি মনে হয়?

একটু করা হাসির রেখা ফুটে উঠলো বনহুরের মুখে, বললো—আমি দস্যু বনহুর সম্বন্ধে অত্যন্ত চিন্তাশীল হয়ে পড়েছি মিঃ চৌধুরী। কারণ ঢাকার মত শহরে সে বেশিক্ষণ আত্মগোপন করে থাকতে সক্ষম হবে বলে মনে হয় না।

আপনি নির্ভুল সত্য কথাই ব্যক্ত করেছেন মিঃ আলম। দস্যু বনহুর ঢাকা শহরে যে বেশিদিন নিজকে লুকিয়ে রাখতে পারবে না, তা জানি।

হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়।

কিছুক্ষণ উভয়ে নীরব।

মিঃ আহাদ বললেন—দস্যু বনহুরকে লোকে যতই যা ভাবুক আমি কিন্তু মনে মনে শ্রদ্ধা করি।

আচমকা চোখ দুটো তুলে ধরলো বনহুর মিঃ আহাদের মুখের দিকে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাঁর অন্তরটা দেখতে চাইলো মিঃ আহাদের কথাটা গভীর না হাল্কা।

মিঃ আহাদ বলে চলেছেন, তিনি নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন—পুলিশমহল বা লোকসমাজ তাকে যতই মন্দ চোখে দেখুক, আমি পারি না।

বনহুর বললো—মিঃ চৌধুরী, দস্যু বনহুর সম্বন্ধে আপনি বিশেষভাবে জ্ঞাত নন বলেই আপনি তার প্রতি এতো সদয় হতে পারছেন। জানেন না আসল রূপ কেমন?

হঠাৎ হেসে উঠলেন মিঃ আহাদ হা হা করে—বনহুরের আসল রূপ আমি স্বচক্ষে না দেখলেও তার সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ জ্ঞাত। শুনেছি সে একজন দেশপ্রেমিক।

হতে পারে সে দেশপ্রেমিক কিন্তু তবু সে অপরাধী, একথা আপনি অস্বীকার করতে পারেন না।

তা তো বটেই।

এই আমার বাসা এসে গেছে।

মিঃ আহাদ গাড়ি রাখলেন।

নেমে পড়লো বনহুর। বললো সে—মিঃ চৌধুরী, আসুন না গরীবালয়ে।

আজ নয়, দেখা হবে আবার। বললেন মিঃ আহাদ চৌধুরী।

বনহুর হাত নেড়ে তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানালো।

❑

গভীর রাতে কক্ষমধ্যে পায়চারি করে চলেছেন মিঃ আহাদ। সমীর বসে আছে একটা চেয়ারে, মুখমন্ডল তার গম্ভীর। দেয়ালে ঘড়িটা শুধু টিক্‌টিক্ শব্দ করে চলেছে। মিঃ আহাদের জুতোর শব্দ আর ঘড়ির কাঁটার শব্দ মিলে অদ্ভুত এক পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে চলেছে।

পাশের কামরায় হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলো নূরীর—শুনতে পেলো মিঃ আহাদ চৌধুরীর গম্ভীর কণ্ঠস্বর—সমীর, তুমি যাই বলো দস্যু বনহুর আমার চোখে ধূলো দিতে পারবে না। আমি তাকে খুঁজে বের করবোই।

তা এই গভীর রাতে কোথায় যাবে?

দস্যু বনহুরের সন্ধানে।

আহাদ, এতোকাল গোয়েন্দাগিরি করে আসছো, এবার দস্যু বনহুরের পাল্লায় পড়ে তোমার গোয়েন্দাগিরির যবনিকা না ঘটে।

কি বলছো তুমি?

বলছি হুশিয়ার হয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। এ দস্যু শুধু দস্যুই নয় বুঝলে? পৃথিবীর কোনো গোয়েন্দাই আজ পর্যন্ত তাকে গ্রেফতারে সক্ষম হয়নি।

হঠাৎ মিঃ আহাদ হেসে উঠলেন—হাঃ হাঃ হাঃ বন্ধু তুমি আমাকে হাসালে! যতবড় দস্যুই হোক তাকে আমার কবলে আসতেই হবে।

কি জানি আমার কিন্তু বড্ড ভয় করছে।

কারণ?

দস্যু বনহুর নামটাই যেন কেমন ভয়াল।

নামটা ভয়াল নয় সমীর, তোমার মনটাই ভীতু। নাও আর বিলম্ব করো না চলো বের হতে হবে।

রাতদুপুরে এভাবে ঘোরাফেরা করলে কবে তোমাকেই পুলিশ দস্যু বনহুর বলে গ্রেফতার করে বসবে, তখন হবে মজাটা!

কথা বাড়িও না, সমীর। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে—ঠিক রাত দু'টোর মধ্যেই আমি রওয়ানা দেবো।

আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলো নূরী, শিউরে উঠলো—আজ ক'দিন হলো এ বাড়িতে এসেছে তার মধ্যেই সে মিঃ আহাদের সম্বন্ধে বেশ ভালভাবেই জ্ঞাত হয়েছে। মিঃ আহাদ যে একজন প্রখ্যাত ডিটেকটিভ তা নূরী বুঝতে পেরেছে। আজ গভীর রাতে মিঃ আহাদ আর সমীর যখন দস্যু বনহুর সম্বন্ধে আলোচনা করছিলো তখন নূরীর মনটা ভীত আশঙ্কিত হয়ে উঠছিলো।

নূরীর কানে এলো এবার সমীরের ভয়বিহ্বল সুর—ওটা সামলে রেখো ভায়া।

নূরী তাকালো, অন্তরটা কেঁপে উঠলো তার, দেখতে পেলো মিঃ আহাদ টেবিলের ড্রয়ার খুলে রিভলভারে গুলী ভরে নিচ্ছেন।

না না, তার বনহুরকে হত্যা করতে দেবে না সে, বনহুর তাকে যতই অবহেলা করুক, ওকে রক্ষা করবে, বাঁচাবে যেমন করে হোক—কিন্তু কি করবে, কি করে বনহুরকে উদ্ধার করবে ভেবে অস্থির হয়ে পড়লো নূরী।

নূরী যখন গভীর চিন্তায় অস্থির তখন মিঃ আহাদ আর সমীর বেরিয়ে গেলো বাইরে। নূরী অন্ধকারে শুনতে পেলো ভারী জুতোর শব্দ।

পরক্ষণেই গাড়ি ছাড়ার আওয়াজ পাওয়া গেলো।

নূরী নিজের কক্ষে গিয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়লো—ওগো দয়াময়, তুমি ওকে বাঁচিয়ে নিও।

মিঃ আহাদ গাড়ি চালিয়ে চলেছে, পাশে বসে সমীর।

বলে উঠে সমীর—কোথায় চলেছো এখন?

মিঃ আলমের ওখানে।

মানে?

মানে তাকে সঙ্গে নেবো।

মিঃ আলমকে সঙ্গে নেবে?

হাঁ, কারণ সে কথা দিয়েছে আমাকে দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারে সাহায্য করবে।

রাতদুপুরে তাকে বিরক্ত করা উচিত হবে?

চুপচাপ বসে দেখো।

মিঃ আহাদ বনহুরের বাড়ির গেটে এসে গাড়ি রাখলেন। নেমে পড়লেন উভয়ে। ছোট্ট বাংলা প্যাটার্ণের বাড়ি। সামনে মাঝারি একটা বাগান। বাগানের মধ্য দিয়ে বাড়ির প্রবেশপথ।

মিঃ আহাদ আর সমীর উঠে গেলো বারেন্দায়।

মিঃ আহাদ টোকা দিলেন দরজায়—ঠক্ ঠক্ ঠক্ ---

কক্ষ্যমধ্য হতে শোনা গেলো মিঃ আলমের কণ্ঠ—কে? পরক্ষণেই দরজা খুলে গেলো, বেরিয়ে এলো মিঃ আলম—আরে আপনারা?

মিঃ আহাদ হেসে বললেন—আপনাকে আমাদের সঙ্গে আসতে হচ্ছে।

অপেক্ষা করুন, এক্ষুণি আসছি।

মিঃ আহাদ বললেন—ধন্যবাদ।

মিঃ আলম কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে ড্রেস পাল্টে নিলো, তারপর বেরিয়ে এসে দরজা তালাবন্ধ করে বললো—চলুন কোথায় যেতে হবে?

মিঃ আলমের বাড়ি সংলগ্ন বাগানের মধ্য দিয়ে এগুতে এগুতে বললেন মিঃ আহাদ—এতোরাতে আপনাকে বিরক্ত করা ঠিক হলো না। মিঃ আলম, কিন্তু না করে উপায় ছিলো না। আমি জানি, আপনি আমাকে দস্যু বনহুরকে গ্রেফতার করায় সহায়তা করতে পারবেন।

মিঃ আলম প্রশ্নভরা দৃষ্টি তুলে তাকালো মিঃ আহাদের দিকে।

বললেন মিঃ আহাদ—আজ একটা চিঠি পেয়েছি, তাতে লেখা আছে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে খোঁজ করলে দস্যু বনহুরের সন্ধান পাবেন।

ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে এলো মিঃ আলমের—চিঠি?

হাঁ চিঠি।

মিঃ আহাদ বললেন—এ হোটেলে আপনি ছিলেন কিনা, তাই আপনাকে সঙ্গে করে আনলাম—এতোরাতে কোনো অসুবিধা হতে পারে, আপনার সঙ্গে ম্যানেজারের যখন ভাল পরিচয় আছে তখন --কথা শেষ না করে চুপ করলেন মিঃ আহাদ।

মিঃ আহাদের হেয়ালিপূর্ণ কথাগুলো মিঃ আলমের কাছে অদ্ভুত লাগলো। তার বুঝতে বাকি রইলো না, মিঃ আহাদ অত্যন্ত সুচতুর বুদ্ধিমান, কৌশলে তার আত্মপরিচয় জানতে চান। এতোরাতে তার বাড়িতে হঠাৎ আগমনের কারণও এখন সচ্ছ হয়ে এলো তার কাছে। মৃদু হাসলো বনহুর।

হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে পৌঁছে মিঃ আহাদ কিছুক্ষণ ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেন, তাতে সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া গেলোনা।

ফিরে চললেন এবার মিঃ আহাদ।

মিঃ আলমকে তিনি পৌঁছে দিলেন তার বাড়িতে।

পথে সমীর জিজ্ঞাসা করে বসলো—ব্যাপার কি বন্ধু, হঠাৎ মিঃ আলমকে নিয়ে এভাবে টানাটানি করছো কেন?

আহাদ চৌধুরী গাড়ির সম্মুখভাবে দৃষ্টি রেখে বললেন—দেখলাম ভদ্রলোক এতোরাতে বাসায় আছেন কিনা।

হো হো করে হেসে উঠলো সমীর—বুঝেছি, তুমি মিঃ আলমকে দস্যু বনহুর বলে সন্দেহ করছো।

অসম্ভব কিছুই নয় সমীর।

কিন্তু মিঃ আলমকে সন্দেহ করার মত কি দেখলে তার মধ্যে?

তার অপরূপ সৌন্দর্য আর মহৎ ব্যবহার।

অবাক হয়ে বললো সমীর—আশ্চর্য গোয়েন্দা তুমি।

তার চেয়েও আশ্চর্য দস্যু বনহুর, বুঝলে?

কি জানি, আজও আমি তোমাকেই বুঝলাম না।

চাপা একটা হাসির রেখা ফুটে উঠলো মিঃ আহাদের ঠোঁটে।

মিঃ আহাদ আর সমীর যখন কথা বলছিলো তখন গাড়ির পিছন আসনের নীচে কেউ হামাগুড়ি দিয়ে লুকিয়েছিলো। সমীর টের না পেলেও মিঃ আহাদ টের পেলেন, তিনি ড্রাইভ আসন থেকে নেমে পিছন আসনের দরজা খুলে ধরলেন—নেমে এসো নূরী।

সেকি! নূরী? কোথায় নূরী? বললো সমীর।

সত্যি সে অবাক হয়ে দেখলো, পিছন আসন থেকে নেমে এলো নূরী, মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইলো সে পুতুলের মত স্থির হয়ে।

সমীর নূরীর পা থেকে মাথা অবধি নিরীক্ষণ করে বললো—এ্যাঁ তুমি! বোন তুমি কখন গিয়েছিলে আমাদের সঙ্গে?

বললেন মিঃ আহাদ—আমি ওকে গোপনে সঙ্গে নিয়েছিলাম।

কখন, আমি তো জানিনা?

তুমিই যদি জানলে তাহলে ওকে গোপনে নেওয়ার কি দরকার ছিলো?

কি জানি, তোমাকে বুঝা মুস্কিল আহাদ।

মিঃ আহাদ নূরীর কাঁধে হাত রাখলেন—চলো বোন।

নূরী লজ্জিত হতভম্ব, যন্ত্রচালিতের ন্যায় পা বাড়ালো সামনের দিকে।

পরদিন।

নূরী নিজ হস্তে মিঃ আহাদের খাবার নিয়ে এলো তার ঘরে।

একটা কোনো বই পড়ছিলেন মিঃ আহাদ।

নূরী পাশের টেবিলে খাবার রেখে চলে যাচ্ছিলো, অন্যদিন হলে বলতো—ভাইজান, খেয়ে নিন।

আজ কোনো কথাই তার মুখ দিয়ো বের হলো না। কারণ কাল রাতে সে এমনভাবে ধরা পড়ে যাবে ভাবতে পারেনি। নূরী যখন শুনেছিলো মিঃ আহাদ বললেন—দস্যু বনহুর সকলের চোখে ধূলো দিয়ে লুকিয়ে থাকলেও আমার চোখে সে ধূলো দিতে পারবে না। তখন নূরী দেখেছিলো তাঁর হাতে জমকালো রিভলভারখানা, শিউরে উঠেছিলো সে মনে মনে। কিছুতেই সে নিজকে ধরে রাখতে পারেনি, আলগোছে গাড়ির পিছন আসনের নীচে লুকিয়ে পড়েছিলো।

নূরীর উদ্দেশ্য ছিলো আত্মগোপন করে এদের কার্যকলাপ দেখা—কোথায় যায় এরা, কি করে। যখন মিঃ আহাদ ও সমীর বাংলো প্যাটার্ণের ছোট একটা বাড়ির দরজায় এসে টোকা দিচ্ছিলেন তখন নূরী আশ্বস্ত হয়েছিলো; সে জানতো তার হুর এখন ইন্টার কন্টিনেন্টাল হোটেলে, এ কার বাসা কে জানে! কিন্তু একটু পরেই যখন দরজা খুলে বেরিয়ে এলো হুর তখন শুধু চমকেই উঠলো না সে, আতঙ্কে শিউরে উঠলো—তাহলে কি তার হুরকে চিনতে পেরেছেন মিঃ আহাদ চৌধুরী। শেষ পর্যন্ত কি ঘটে দেখবার জন্য উদ্বিগ্ন হৃদয় নিয়ে অপেক্ষা করছিলো।

নূরী সবই লক্ষ্য করেছিলো প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত। কিন্তু সে তখন ভাবতেও পারেনি মিঃ আহাদ তার অস্তিত্ব জানতে পেরেছেন। পরে যখন মিঃ আহাদ তাকে গাড়ি থেকে নামার জন্য বললেন তখন নূরী শুধু স্তব্ধ বিস্মিত হয়নি, ভড়কে গিয়েছিলো ভীষণভাবে। লজ্জায় মরিয়া হয়ে উঠেছিলো নূরী।

রাতের এই ঘটনার পর নূরীর মাথাটা যেন নত হয়ে এসেছিলো, সহসা সে মিঃ আহাদের সামনে আসতে লজ্জাবোধ করছিলো।

নূরী খাবার টেবিলে রেখে দরজার দিকে পা বাড়াতেই মিঃ আহাদ বললেন—শোনো।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো নূরী, মনে মনে ভয় পেয়ে গেলো। কাল রাতের ঘটনাটার জন্য সে ভড়কে গেলো ভীষণভাবে। নিশ্চয়ই তাকে কৈফিয়ত তলব করে বসবেন তিনি। অপরাধীর মত মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো সে।

মিঃ আহাদ হস্তস্থিত বইখানা বন্ধ করে টেবিলে রেখে দাঁড়ালেন এগিয়ে এলেন নূরীর পাশে।

নূরী নতদৃষ্টি তুলে একবার মিঃ আহাদ চৌধুরীর মুখমন্ডল দেখে নিলো। না, সে মুখে নেই কোনো কঠিনতার ছাপ। নূরী কতকটা আশ্বস্ত হলো।

মিঃ আহাদ সচ্ছকণ্ঠে বললেন—ধন্যবাদ নূরী।

চমকে মুখ তুললো নূরী, হঠাৎ ধন্যবাদে একটু হতবুদ্ধি হয়ে গেলো সে।

মিঃ আহাদ হেসে বললেন—একটা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি নূরী, আমি জানি, তুমি পারবে আমাদের সাহায্য করতে।

প্রশ্নভরা চোখে তাকালো নূরী, মিঃ আহাদের কথা সে যেন ঠিক বুঝতে পারলো না, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালো।

মিঃ আহাদ নূরীর হাত ধরে সরে নিয়ে এলেন তারপর সোফায় ওকে বসিয়ে দিয়ে নিজেও বসলেন তার পাশে।

নূরী চিত্রার্পিতের মত বসে রইলো।

মিঃ আহাদ বললেন—প্রথম দিনই আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি সাধারণ নারী নও। তোমার মধ্যে একটা বিরাট প্রতিভা লুকিয়ে আছে। নূরী,তোমাকে আমি বোন বলে গ্রহণ করেছি, তুমি আমার কাজে সহায়তা করবে।

হাঁ করবো।

ধন্যবাদ।

নূরী বিস্মিত আঁখি দুটি তুলে ধরলো আর একবার মিঃ আহাদের মুখে। দৃষ্টি বিনিময় হলো মিঃ আহাদের সঙ্গে নূরীর।

হেসে বললেন মিঃ আহাদ—যাও নূরী, সময় হলে আবার ডাকবো। নূরী মন্থর গতিতে বেরিয়ে গেলো।

❑

পুলিশমহলে যখন দস্যু বনহুরকে গ্রেফতার নিয়ে ভীষণভাবে আলোড়ন চলেছে, সমস্ত শহরময় যখন একটা গভীর আতঙ্কভরা ভীতি-ভাব তখন কালবৈশাখী-বিধ্বস্ত শ্মশানপুরীতে দস্যু বনহুর দুর্গতদের সেবা যত্ন নিজ হস্তে করে চলেছে। কারো চোখের পানি মুছিয়ে দিচ্ছে, কারো মুখে খাবার তুলে দিচ্ছে, যার মাথা গুঁজার আশ্রয় নেই তার আশ্রয় তৈরি করে দিচ্ছে। অন্যান্য সেচ্ছাসেবক দলের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেছে যেন সে।

প্রখর রৌদ্রদগ্ধ দ্বিপ্রহরে পৃথিবী যখন গনগনে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়াচ্ছে তখন বনহুর সাবধানে শ্রমিকের বেশে দুঃস্থ অসহায় জনগণের মধ্যে বিচরণ করে ফিরছে। কারও ঘর তৈরি এখনও হয়নি, কারও ঘরে এখনও খাবার এসে

পৌঁছায়নি, কারও পরনে কাপড় নেই—অর্থ দিয়ে, ঔষধ পথ্যাদি দিয়ে, নিজ হস্তে আশ্রয় তৈরি করে দিয়ে সাহায্য করে চলেছে।

সরকারের সাহায্য এসেছে, হয়তো তা দিয়ে সব অভাব পূর্ণ হচ্ছে না। হয়তো খাবার কিনতে ঔষধের দাম ফুরিয়ে যাচ্ছে। চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন অনেক পয়সার। কালবৈশাখী ঝড় যা ধুয়ে মুছে নিয়ে গেছে তা যে সহজে পূর্ণ হবার নয়।

এমনি একদিন বনহুর এক বৃদ্ধার মাথা গুঁজবার জন্য একটা ছোট্ট চালা তৈরি করে দিচ্ছিলো নিজ হস্তে। তার শরীরে তখন মজুরের বেশ। খালি পা, একটা ছেড়া পায়জামা পরা, গায়ে হাফ-হাতা শার্ট। মুখে কিছু কাঁচা-পাকা নকল দাঁড়ি, মাথায় একটা গামছা বাঁধা সাবল দিয়ে মাটি খনন করে খুঁটি পুঁতছিলো সে। তাকে দেখলে চিনবার কোনো উপায় নেই। নিখুঁত ছদ্মবেশ ধারণ করেছে দস্যু বনহুর।

অদূরে বৃদ্ধা বসে বসে ধুকছে।

একমাত্র সন্তান ছিলো, কোনো এক মিলে শ্রমিকের কাজ করতো—সে মিলের ছাদ চাপা পড়ে মরেছে। এক নাতনী ছিলো, ঝড়ের মধ্যে কোথায় যে হারিয়ে গেছে, সেও আর ফিরে আসেনি। এও বলে—বুড়ী, তোর নাতনী পুকুরে পড়ে ডুবে মরেছে। হাউ মাউ করে কাঁদে বুড়ী। কেঁদে কেঁদে বুড়ীর চোখে ঘা হয়ে গেছে। আজ ক'দিন হলো ঝড় তার সর্বস্ব লুটে নিয়ে গেছে—সেদিন থেকে হাড়ি চড়েনি উনুনে। আর রাঁধবেই বা কে—নাতনীটা ছিলো, সে-ই কোনোরকমে চারটি চাউল সিদ্ধ করতো। হয়তো বাপ মিলে কাজ করে ফেরার পথে গামছায় চাল-ডাল-আলু বেঁধে আনতো; তাই বাপ-বেটি মিলে রাঁধতো, নিজেরা খেতো আর বুড়ী মাকে দিতো। ছেলে আর নাতনী হারিয়ে বুড়ি উন্মাদিনী হয়ে পড়েছে, বিলাপ করছে কিন্তু তার কথা বুঝা যাচ্ছে না।

আজ দস্যু বনহুর স্বয়ং বৃদ্ধার মাথা গুঁজবার কাছে ব্যস্ত।

যদিও শতশত লোকজন অসহায় দুর্গতদের সহায়তা করে চলেছে যদিও সরকার প্রচুর অর্থ সাহায্য করে এসব এলাকার দুঃখকষ্ট দূর করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছেন, তবুও এখনও এমন কত নিরাশ্রয় অসহায় অনাথ রোগক্লিষ্ট ব্যক্তি মৃত্যুর জন্য তিল তিল করে ধুকছে।

বনহুর তাদের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে, দান করছে মুক্তহস্তে। মুখে খাবার তুলে দিচ্ছে, অশ্রু মুছিয়ে দিচ্ছে রুমালে।

বনহুর যখন বৃদ্ধার ঘরখানা তুলে দেওয়ার জন্য খুঁটি গাড়ছিলো তখন অদূরে একটা গাড়ি এসে থামলো।

হঠাৎ বনহুরের দৃষ্টি চলে গেলো সেইদিকো চমকে উঠলো বনহুর গাড়ি থেকে নামলেন প্রখ্যাত ডিটেকটিভ মিঃ আহাদ চৌধুরী সমীর আর তার শিশুকালের সাথী-সঙ্গিনী নূরী। মুহুর্তের জন্য বনহুর আনমনা হয়ে গেলো, ভাগ্যিস চালটা তার মাথার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েনি। তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে আপন কাজে মন দিলো সে।

নূরীসহ মিঃ আহাদ এগিয়ে আসছেন, দেখছেন চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। ঝড়বিধ্বস্ত এলাকার নির্মম অবস্থা স্বচক্ষে দেখতে এসেছে মিঃ আহাদ সঙ্গে রয়েছে নূরী আর সমীর কুমার।

বনহুর আপন মনে কাজ করছিলো।

প্রখর রৌদ্রতাপে তার দেহের বসন ভিজে চুপছে গেছে। গন্ড রক্তাভ হয়ে উঠেছে কিন্তু নকল দাড়ি-গোঁফে ঢাকা পড়ে গেছে তার সুন্দর মুখশ্রী।

বনহুরের পাশ কেটে চলে গেলেন মিঃ আহাদ এবং তার সঙ্গীদ্বয়।

বনহুরের কানে পৌঁছলো মিঃ আহাদের গাম্ভীর্যপূর্ণ কণ্ঠ—এইসব দুর্গত এলাকার মধ্যেই লুকিয়ে আছে এক অদ্ভুত মানুষ!

সমীরের কণ্ঠ শোনা গেলো—অদ্ভুত মানুষ!

হাঁ।

সে আবার কি রকম?

বলবো পরে---

আর কিছু শুনতে পেলো না বনহুর, সে কাজে মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলো, কিন্তু পূর্বের মত উৎসাহ আর এলো না তার মধ্যে। অদূর থেকে ভেসে এলো নূরীর কণ্ঠস্বর কি করুণ দৃশ্য, আমি সহ্য করতে পারছি না।

বনহুর অধর দংশন করলো।

মিঃ আহাদ সমীর আর নূরী ঘুরে ফিরে দেখছেন সব।

আর একটু হলেই বনহুরের কাজ শেষ হয়। তার সঙ্গে আরও দু'জন শ্রমিক তাকে কাজে সাহায্য করছিলো। এরাও মজুর। বনহুর বললো—ভাই, বাকিটুকু তোমরা করে ফেলো।

আর তুমি কোথায় যাবে?

বড্ড খারাপ লাগছে আমার।

তা হবে না। পয়সা নেবে সমান সমান আর কাজ করবে না? বললো অন্য একজন মজুর।

বনহুর বললো—আমার পয়সাটাও তোমাদের দু'জনাকে দিয়ে দেবো।

এ্যা, কি বললে? তোমার পয়সাও আমাদের দু'জনাকে ভাগ করে দেবে।

হাঁ তাই দেবো।

তাহলে যেতে পারো।

বনহুর আলগোছে সরে পড়তে যাচ্ছিলো, সেই মুহূর্তে পিছনে এসে দাঁড়ালেন মিঃ আহাদ—কাজ শেষ হয়েছে?

ফিরে তাকালো বনহুর, হাতের পিঠে কপালের ঘাম মুছে বললো—অল্প বাকি আছে।

তবে চলে যাচ্ছো কেন?

সে আমার ইচ্ছা! কথাটা বলে বনহুর দ্রুত চলে গেলো সেখান থেকে।

হাসলেন মিঃ আহাদ।

নূরী বললো—ভাইজান, অমন করে হাসছেন কেন?

সেও আমার ইচ্ছা।

সমীর অবাক হয়ে বললো—লোকটা কাজ বাকি রেখে চলে গেলো তার ইচ্ছায়, তুমি হাসছো তাও তোমার ইচ্ছা। এসো বোন, আমরাও চলতে শুরু করি আমাদের ইচ্ছায়।

নূরী বললো—তাই চলুন এসব দৃশ্য আমি আর দেখতে পারছি না।

যাও, তোমরা গাড়িতে দিয়ে বসো, আমি আসছি। বললেন মিঃ আহাদ।

নূরী আর সমীর এগুলো অদূরে থেমে থাকা তাদের গাড়িখানার দিকে।

মিঃ আহাদ মজুরদের একজনকে লক্ষ্য করে বললেন—এখানে যে তোমরা তিনজন কাজ করছিলে তাদের মধ্যে আর একজন কই?

হুজুর, তার বড্ড মাথা ধরেছে, তাই চলে গেছে। মকবুল বড় ভাল হুজুর, এতো বেলা কাজ করেছে তবু এক পয়সা নেবে না—সব দিয়ে দিবে আমাদের।

মিঃ আহাদ ভ্রূকুঁচকে কিছু ভাবলেন, তারপর ফিরে চললেন গাড়ির দিকে।

গাড়িতে বসে বললেন মিঃ আহাদ—এই যে অগণিত দেশ সেবক আর শ্রমিক দেখছো, এদের মধ্যেই লুকিয়ে আছে এমন একজন যাকে আমি খুঁজে ফিরছি। শুধু আমি নয় সমস্ত পুলিশমহল।

এ্যা কি বললে? দস্যু বনহুর এই ঝড়-বিধ্বস্ত এলাকায় হানা দিতে এসেছে?

হানা দিয়ে নিতে নয়—দিতে। বললেন মিঃ আহাদ।

নূরী বনহুরের নাম শুনেই প্রথমে চমকে উঠেছিলো, পর মুহূর্তে আশ্বস্ত হলো তবু মুখে ভীতভাব টেনে বললো—দস্যু বনহুর এখানে এসেছে? শীগ্‌গির চলুন পালিয়ে যাই ভাইজান।

না না, ভয় নেই নূরী দস্যু বনহুর দস্যু হলেও অমানুষ নয়। অনেক ভদ্র সে। গাড়িতে ষ্টার্ট দিতে দিতে বললেন মিঃ আহাদ।

সমীর বললো—দস্যু কোনোদিন ভদ্র হয়? এতো চালাক হয়েও বোকার মত কথা বললে কিন্তু।

গাড়ি তখন ছুটতে শুরু করেছে।

সমীরের কথায় কোনো জবাব দিলেন না মিঃ আহাদ। গাড়ি এগিয়ে চলেছে। পথের দু'ধারে যে দৃশ্য তা সত্যিই মর্মান্তিক।

বিশ্বনিয়ন্তার একি নির্মম পরিহাস। ঝড়বিধ্বস্ত এলাকার দিকে তাকিয়ে মিঃ আহাদ ভুলে গেলেন তার অস্তিত্ব। চারিদিকে শুধু করুণ হাহাকার আর অন্তর্ভেদী দীর্ঘশ্বাস। অসংখ্য ধসে পড়া ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষের পাশে অগণিত মৃতদেহ। শুধু মানুষেরই নয়—জীবজন্তুর পশু পাখীর লাশ বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে পড়ে আছে।

সেচ্ছাসেবকের দল এবং সরকারের পাঠানো লোকজন এসব মৃতদেহের সংকারের ব্যবস্থা করে চলেছে। ঝড় হয়েছে বেশ কয়েকদিন আগে কিন্তু আজও সবগুলো মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব পর হয়ে উঠেনি। বড় বড় দালান-কোঠা আর মিল কারখানার নীচে চাপা-পড়া লাশগুলো সবেমাত্র উদ্ধার করা হচ্ছে। কারণ বহু ইট-পাথরের স্তূপের নীচে চাপা-পড়া এইসব লাশ উদ্ধার করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, কাজেই বিলম্ব হচ্ছে বা হয়েছে।

ইট-পাথরের স্তূপের তলা থেকে গলিত বিকৃত মৃতদেহগুলো থেকে দুর্বিষহ দূর্গন্ধ নির্গত হচ্ছে। শ্রমিক এবং সেচ্ছাসেবকগণ নাকে গামছা বেঁধে এবং রুমাল চাপা দিয়ে কাজ করে চলেছে।

গাড়িতে বসেও নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিলো তাদের।

নূরীর চোখ ফেটে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিলো, নাকে রুমাল চাপা দিয়ে গাড়ির একপাশে বসেছিলো চুপচাপ।

গাড়ি রেখে মাঝে মাঝে নেমে হেঁটে হেঁটে দেখছিলেন মিঃ আহাদ, সমীর ও নূরী। কাউকে সহানুভূতি জানাচ্ছিলেন, কাউকে বা পকেট থেকে টাকা বের করে দিচ্ছিলেন, কিন্তু টাকা নেবার লোকও যেন নেই। সবাই প্রায় ঘর-চাপা পড়ে মরেছে যারা বেঁচে আছে তারা আহত হয়ে হসপিটালে আছে।

নিস্তব্ধ দুপুরে শ্মশানের মতই খা খা করছে যেন চারিদিক। সবুজের চিহ্ন যেন হারিয়ে গেছে কোথায়।

ঝড়বিধ্বস্ত এলাকাগুলো দেখলে মনে হয় যেন কোনো দানব এপথ দিয়ে চলে গেছে, যার নিশ্বাসের অগ্নি হল্কায় সব পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। বড় বড় গাছগুলো যেন সে মুচড়ে দুমড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, পথের আবর্জনার মত দূরে, বহুদূরে। বিরাট বিরাট দালান-কোঠাগুলোকেও যেন সে পা দিয়ে মাড়িয়ে চলে গেছে খেলনা ঘরগুলোর মত। শুধু তাই নয়, কত ঘরের চালা

গিয়ে লট্‌কে আছে লাইটপোষ্ট আর টেলিফোনের থামের সঙ্গে। কত গাছপালার অবস্থাও তাই।

বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে দেখছে নূরী, হঠাৎ সে বলে উঠে—চলুন ফিরে যাই।

সমীর গলিত বিকৃত লাশগুলো লক্ষ্য করে বলে উঠলো—এই সুন্দর পৃথিবীতে সুন্দর মনুষ্য দেহগুলোর কি ভয়ঙ্কর পরিণতি। মানুষ মরে গেলে তার এতো সুন্দর দেহটার এমন বিদঘুটে অসহনীয় গন্ধ হয়, আগে জানতাম না। সত্যি বেঁচে থাকতে দেহটার কত যত্ন কত আদর স্নেহ আর পরিশেষে---

একটা ব্যথাকরুণ হাসির রেখা ফুটে উঠলো মিঃ আহাদের মুখে তিনি বললেন—সুন্দর সুগন্ধময় ফুলগুলোও শুকিয়ে গেলে গন্ধহীন হয়ে পড়ে, তখন লোকে তুচ্ছ বলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তেমনি মানুষের দেহ, প্রাণ বেরিয়ে গেলেই উচ্ছিষ্ট আবর্জনার মতই হয়ে পড়ে নিষ্প্রয়োজনীয়। চলো।

মিঃ আহাদ সমীর ও নূরী ফিরে চললো ঢাকা অভিমুখে।

❑

হঠাৎ এক সময় মিঃ আহাদ বনহুরের বাংলোয় এসে উপস্থিত হলেন। আজকাল প্রায়ই তিনি আসেন তার বাংলোতে। মিঃ আলমের সঙ্গে মিঃ আহাদের বন্ধুত্ব আরও জমে উঠেছে গভীরভাবে। মাঝে আরও কয়েকদিন মিঃ আহাদ অকস্মাৎ এসে হাজির হয়েছেন।

আজও তাই মিঃ আহাদের আগমনে কিছুমাত্র বিস্মিত হলো না, তাকে অভ্যর্থনা জানালো—হ্যালো মিঃ চৌধুরী, কি খবর আজ বলুন তো?

মিঃ আহাদ আসন গ্রহণ করে বললেন—খবর নতুন কিছু নেই, তবে পুলিশমহল একটা নতুন খবর ঘোষণা করেছেন---

বনহুর একটু হেসে বললেন—দস্যু বনহুরকে যে গ্রেফতার করতে সক্ষম হবে তাকে দশ হাজার টাকা দেওয়া হবে।

হাঁ, আপনি দেখছি ঘোষণাটি ইতিমধ্যে জেনে নিয়েছেন মিঃ আলম।

জানা আর এমন কঠিন কি বলুন?

এখনও সংবাদপত্রে প্রকাশ পায়নি কিনা তাই বলছিলাম ---বললেন মিঃ আহাদ।

সংবাদপত্র অফিসে আমি দেখেছি। বললো মিঃ আলম।

মিঃ আহাদ সিগারেট-কেসটা বের করে বাড়িয়ে ধরলেন মিঃ আলমের সম্মুখে।

মিঃ আলম আলগোছে একটা সিগারেট তুলে নিলো আংগুল দুটো দিয়ে।

মিঃ আহাদ দেখলেন মিঃ আলমের একটা আংগুলে ব্যান্ডেজ বাঁধা বললেন—মিঃ আলম আপনার আংগুলে কি হয়েছে?

ও সামান্য একটু কেটে গিয়েছিলো মাত্র।

ঝড়-বিধ্বস্ত এলাকায় দুর্গতদের সহায়তা করতে গিয়েই বনহুরের আংগুলটা অনেকখানি কেটে গিয়েছিলো, বনহুর সামান্য বলে এড়িয়ে যেতে চাইলেও মিঃ আহাদের বুঝতে বাকি রইলো না। সিগারেটের ধুম্রকুন্ডলির ফাঁকে তাকালেন তিনি মিঃ আলমের মুখের দিকে।

কিছুক্ষণ মৌন থেকে বললেন মিঃ আহাদ—আমি কিন্তু আপনার আতিথ্য প্রায়ই গ্রহণ করে থাকি---

এটাতো আমার সৌভাগ্য মিঃ চৌধুরী।

আপনি কিন্তু আমাদের ওখানে মোটেই যেতে চান না। সারাটা দিন ঘরে বসে করেন কি? আসুন না একদিন আমার বোনের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেবো, খুব খুশি হবে সে আপনার সঙ্গে আলাপ করে।

আপনার বোন!

হাঁ, আমার একটি বোন আছে, বড্ড মিশুক মেয়ে। সেদিন আপনি চলে আসার পর নূরী আপনার কথা শুনে অভিমান-ভরা কণ্ঠে বলে ছিলো—ভাইজান, আপনার বন্ধু এলেন, কই আমার সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিলেন নাতো? তাই কথা দিয়েছি, এবার ওর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেবো।

বোন! আপনার বোন?

হাঁ।

মিঃ আহাদ লক্ষ্য করলেন, মিঃ আলমের চোখ দুটো যেন অকস্মাৎ আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠেছে। বুঝতে পারলেন যে ঔষধ তিনি প্রয়োগ করতে চান তা কার্যকরী হবে। তরুণ মিঃ আলমকে তিনি কৌশলে আয়ত্তে এনে তার ভিতরের রহস্য উদ্ঘাটন করতে চান।

সেদিন আর বেশি বিলম্ব না করে মিঃ আহাদ উঠে পড়লেন। ফিরে এলেন বাসায়।

গভীর রাতে পায়চারি করছেন, সিগারেটের পর সিগারেট নিঃশেষ করে চলেছেন মিঃ আহাদ। কি তিনি ভাবছেন তিনিই জানেন। কয়েকখানা কাগজ তিনি বের করে টেবিলে মেলে ধরলেন, দেওজীর পঞ্চাশ হাজার টাকা লুট হবার ঠিক তিনদিন পর হয়েছিলো হাফিজ চৌধুরীর বাড়িতে ডাকাতি। তারপর আরও দু'তিন জায়গায় যে-সব দস্যুতা হয়েছে, সব জায়গাতেই দস্যু বনহুরের নিজ হস্তে লেখা চিঠি পাওয়া গেছে।

মিঃ আহাদ কি যেন ভাবছেন, তারপর কাগজপত্রগুলো ভাঁজ করে পকেটে রেখে সমীরের কক্ষের দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিলেন—সমীর, সমীর--

আচমকা ঘুম ভেঙ্গে গেলো সমীরের, চটপট দরজা খুলে হন্তদন্ত হয়ে বললো—কি ব্যাপার এতোরাতে ঘুমাওনি?

তুমি ঘুমিয়েছো সেই ভাল, শীগ্গির তৈরি হয়ে নাও, বেরুবো।

না, তুমি আমায় জ্বালিয়ে মারলে আহাদ। নিশ্চিন্ত মনে যে একটু ঘুমাবো তাও হবে না।

দস্যু বনহুরকে গ্রেফতার করে যদি দশহাজার পেতে চাও তাহলে উঠে পড়ো।

ওঃ বুঝেছি দশ হাজারের লোভে তোমার চোখে ঘুম হচ্ছে না।

টাকার লোভ কার না আছে বন্ধু, কিন্তু তার চেয়ে বেশি লোভ আমার দস্যু বনহুরকে গ্রেফতার করা। নাও, চটপট তৈরি হয়ে নাও।

কোথায় যাবে এখন? বললো সমীর।

মিঃ আহাদ বললেন—গেলেই বুঝতে পারবে। এসো আমার সঙ্গে।

তারপর মিঃ আহাদ আর সমীর ড্রেসিং রুমের মধ্যে প্রবেশ করলেন। যখন তারা বেরিয়ে এলেন তখন তাদের দেহে সম্পূর্ণ মারোয়াড়ীদের ড্রেস। মিঃ আহাদ হাতঘড়িটা দেখে নিলেন—রাত একটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট হয়েছে।

গাড়িতে চেপে বসলেন মিঃ আহাদ আর তার সহকারী সমীর।

গাড়ি ঢাকা শহরের রাজপথ বেয়ে ছুটতে শুরু করলো।

সমীর বললো—তোমার হেয়ালীপূর্ণ ভাবধারা বুঝবার জো নেই। মেহেরবানী করে বলবে কি এখন এই মাড়োয়ারী বাবুর ড্রেসে কোথায় চলেছো?

দেওজী বাবুর ওখানে।

দেওজীবাবু! যার পঞ্চাশ হাজার টাকা হরণ করে নিয়েছে দস্যু বনহুর?

হাঁ। আমি তার ভাই সীতারাম দেওজী আর তুমি আমার একজন সহকারী রামসিং, বুঝলে?

কিন্তু ---

কোনো কিন্তু নেই, তোমাকে যেভাবে চলতে বলবো সেইভাবে চলবে।

আমার কিন্তু খুব ভাল লাগছে না তোমার কার্যকলাপ।

কেন?

দেশে এলে বিয়ে করবে বলে, কিন্তু বিয়ের মহরৎ বন্ধ রেখে আবার কাঁধে নিলে দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারের দায়িত্বভার।

মন্দ কি, বিয়ের আগে যদি দশহাজার টাকা পেয়ে যাই।

ক্ষুব্ধস্বরে বললো সমীর—ও আমি জানি, টাকার মোহ যে তোমার কত আছে আমাকে বলতে হবে না। নিজের সম্পত্তির লক্ষ লক্ষ টাকা তুমি হাসিমুখে বিলিয়ে দাও অপরের উপকারে আর কিনা দস্যু বনহুরকে গ্রেফতার করে তুমি টাকা নেবে---হাসালে বন্ধু হাসালে।

চুপ। আমাদের পিছনে আর একটা গাড়ি আসছে না?

হাঁ, একটা গাড়ির আলো দেখা যাচ্ছে, কিন্তু অনেক দূরে গাড়িটা আছে।

খুব দ্রুত গাড়িখানা এগিয়ে আসছে বলে মনে হচ্ছে। যেন দুটো আলোর বল ছুটে আসছে তীরবেগে।

মিঃ আহাদ এবার গাড়ির স্পীড আরও বাড়িয়ে দিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হবার পর গাড়িখানাকে একটা গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে নিলেন তিনি। গলিপথটা ছিলো বেশ অন্ধকার। মিঃ আহাদ গাড়ি থামিয়ে আলো নিভিয়ে ষ্টার্ট বন্ধ করে দিলেন। স্তব্ধ নিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন তিনি। স্পষ্ট দেখলেন একখানা গাড়ি চলে গেলো সম্মুখ রাস্তা দিয়ে।

গাড়িখানা চলে যেতেই মিঃ আহাদ নিজের গাড়িখানাকে বের করে আনলেন গলিপথ থেকে।

সম্মুখস্থ গাড়িখানা তখন অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

মিঃ আহাদ গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে সম্মুখের গাড়িখানাকে ফলো করলেন।

বেশ দূরত্ব রেখে গাড়ি চালাচ্ছিলেন মিঃ আহাদ।

এবার হঠাৎ গাড়িখানা সামনের বাঁকে অদৃশ্য হলো। মিঃ আহাদ হতাশ কণ্ঠে বললেন—সামনের গাড়ির চালক টের পেয়েছে।

মানে আমরা তাদের ফলো করছি জানতে পেরেছে।

হাঁ।

এটাই কি দস্যু বনহুরের গাড়ি?

না।

তবে কার?

দেওজীর।

বলো কি, দেওজী পঞ্চাশ হাজার টাকা হারিয়েও এতোরাতে গাড়ি নিয়ে ঢাকা শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন?

না বেড়িয়ে যে উপায় নেই।

মিঃ আহাদের গাড়ি এবার এসে একখানা বাড়ির সম্মুখে দাঁড়িয়ে পড়লো।

বাড়ি নয়, পাশাপাশি কয়েকখানা গুদামঘর যেন।

একটা গাড়ি কেবলমাত্র ওদিকে ভাঙ্গাচুরো একটা টিনের গ্যারেজের মধ্যে উঠছিলো।

এমন সময় মিঃ আহাদের গাড়ি এসে বাড়িটার সামনে থামলো।

কে একজন ভিতর থেকে বললো—তুমলোক কোন্ হ্যায়?

সমীর কোনো জবাব দিতে যাচ্ছিলো।

মিঃ আহাদ মুখে হাতচাপা দিলেন. তারপর বললেন—হামলোক দেওজী বাবু কা ছোটা ভাই।

লোকটা এবার শশব্যস্তে এগিয়ে এলো—আইয়ে ছোটা বাবু! আইয়ে আপলোক---

মিঃ আহাদ আর সমীর অগ্রসর হলো লোকটার পিছুপিছু। একটা মস্তবড় ঘরের মধ্যে লোকটা প্রবেশ করে বললো—আপলোক কা নাম বলিয়ে হাম বাবুজীকো সামঝাইঙ্গে।

বলো সীতারাম দেওজী আয়া আওর রামসিং। যাও, জলদী বলো।

লোকটা চলে গেলো।

মিঃ আহাদ আর সমীর আসন গ্রহণ করলো।

চুন-বালি খসে-পড়া পুরোনকালের বাড়ি। ঘরখানা একেবারে স্যাঁতসেতে ধরনের। মস্তবড় ঘর অথচ মাত্র ছোট্ট দু'টি জানালা । তাও জানালায় মোটা কাপড়ের পর্দা ঝুলছে।

দেয়ালে কতকগুলো দেবদেবীর পুরোন ছবি। একপাশে একটা তাকে সিঁদুর মাখা গণেশ ঠাকুর রাখা হয়েছে। ঘরখানার প্রায় বারো-তেরোখানা চেয়ার রয়েছে। চেয়ারগুলো নতুন না হলেও মজবুত বটে। হাতল আর পিছন দিকগুলো তেলে তেলে পেকে উঠেছে যেন। একপাশে একটা তোষক পাতা তাতে একটা চাদর বিছানো আছে। কিন্তু আসলে চাদরখানার কি রং বুঝা মুস্কিল তবে মনে হয় সাদাই ছিলো এখন চাদরখানার রং তৈলচিটে হতে হতে প্রায় হলদে কালচে হয়ে উঠেছে। বিছানার উপর কয়েকটা বালিশ গোছানো রয়েছে, বালিশগুলোর অবস্থাও তাই। সাদা কভার তৈলচিটে হয়ে উঠেছে।

সমীর বললো—শালা মাড়োয়ারী জাতটাই নেষ্টি--

ঠিক সেই মুহূর্তে শোনা গেলো একটা আনন্দভরা কণ্ঠ—আরে তুমলোক আগিয়া ভাই সীতারাম---

একটা ভুড়ি-মোটা লোক এসে দাঁড়ালো তাদের সামনে। লোকটার চোখে ঘুমের জড়তা নেই। মিঃ আহাদ আর সমীর বুঝতে পারলো, এই লোকটাই এক্ষুণি গাড়ি নিয়ে ফিরে এলো শহর থেকে এবং এই লোকটার নামই দেওজী, যার পঞ্চাশ হাজার এখন দস্যু বনহুরের করায়ত্তে।

মিঃ আহাদ এবং সমীরের দেহেছিলো নিখুঁত মাড়োয়ারীর ড্রেস। দেওজীর মনে কোনো সন্দেহ জাগলো না এদের দেখে। দেওজী প্রায় বিশ বছর হলো দেশছাড়া—সে বিভিন্ন দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য নিয়ে মেতে থাকে, তাই দেশে যাওয়া আর হয়ে উঠে না। পুরো আঠারো বছর সে ভারতে ব্যবসা করতো, সম্প্রতি দু'বছর হলো ঢাকায় এসে বসেছে। দেওজীর জন্মস্থান দিল্লীর ওদিকে কোনো এক শহরে কিন্তু তার বাপ-মা-ভাই-বোন সবাই নাকি লাহোরে বসবাস করেন প্রায় বহুদিন থেকে। কাজেই দেওজীর সঙ্গে আপনজনদের দেখা সাক্ষাৎ অনেকদিন যাবত হয় না। ছোট ভাই সীতারামকে সে দেখে এসেছিলো তখন তার বয়স ছিলো চার কিংবা পাঁচ বছর। তারপর কেটে গেছে বহুদিন—সেই সীতারাম আজ তার সম্মুখে এসে হাজির হয়েছে, এ কম কথা নয়। আত্মহারা দেওজী জড়িয়ে ধরলো—ভাই, তোম্ বলো মাতাজী পিতাজীকা তবিয়ৎ ভালাতো?

মিঃ আহাদ যেন খুশিতে আনন্দ-অশ্রু ফেলছেন তেমনি বাষ্পভরা গলায় বললেন—পিতাজীকা তবিয়ৎ আচ্ছি নেহি ভাইয়া তুম্‌কো দেখনে কেলিয়ে বহুত পেরেশান হায়। আওর মাতাজীভি উইছি। একবার দেহাদমে চলো না ভাইয়া?

হাঁ সীতারাম এবার দেহাদমে যানে কে লিয়ে হামারা বহুৎ জরুরি হ্যায়।

এ কথা-সে কথার মধ্যে দিয়ে মিঃ আহাদ দেওজীর ভিতরে গভীরভাবে প্রবেশ করলেন।

দেওজী জিজ্ঞাসা করে বসলো তার চিঠিখানা পেয়েছিলো কিনা।

মিঃ আহাদ জানালেন—হাঁ ভাইয়া আপকা দিয়া হুয়া খত্ তো হাম পালিয়া।

মিথ্যা নয়, মিঃ আহাদ দেওজীর একখানা চিঠি কৌশলে সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, এবং সেই চিঠিখানাই হলো দেওজী তার ভাইকে চলে আসার জন্য অনুরোধ করে লিখেছিলো।

সেদিন রাতে বেশিক্ষণ আর আলাপ-আলোচনা হলো না, দেওজী দেশের আর দু'চার কথা জিজ্ঞাসা করে চাকরকে ডেকে তাদের খাবার ও শোবার ব্যবস্থা করে দিয়ে চলে গেলো।

একজন লোক এলো খাবার কথা বলতে, সমীর নাক ধরে বলে উঠলো—তুম্ যাও তো আমি কিছু খাবো না--

এই সেরেছো ! চাপাকণ্ঠে বললেন মিঃ আহাদ, পরক্ষণেই হিন্দি ভাষায় বললে—যাও তুম খানা লে আও।

চলে গেলো লোকটা।

সমীর মুখ ভেটকে বললো—ছিঃ ছিঃ ছিঃ তুমি খাবে?

না খেয়ে কোনো উপায় নেই, বুঝলে?

কি বিশ্রী বিদঘুটে গন্ধ লোকটার গায়ে, আর তার হাতের খাবার খাবে? আমার তো পেটের নাড়ীভুড়ি সব বেরিয়ে আসতে চাইছে বিদঘুটে গন্ধে। কতদিন এরা গোসল করে না---

চুপ করে মুখ বুজে চারটি মুখে গুঁজে দাও।

সন্ধ্যায় পেট পুরে খেয়ে ঘুমিয়েছি, খাবো কোন পেটে।

আজকের প্লেনে এলে না খেলে চলবে কি করে?

তার মানে?

মানে পরে শুনো, খেয়ে নাও দড়বড়।

একটু পরেই লোকটা খানকয়েক আটার রুটি আর আলু-বেগুনের লাব্‌রা তরকারি এনে রাখলো তাদের সম্মুখে।

সমীরের চোখ তো ছানাবড়া হা হয়ে গেছে তার মুখমন্ডল ভয়ে আঁতকে উঠে বলে—নাও এবার খাও--

চট্ করে মিঃ আহাদ বাম হাতে তার মুখ চেপে ধরে—তুম্ সবকুছ মাটি করনে কেলিয়ে বাংলা বাত বোল্তা। দেখো বয় ইছিকো বাত তুম্ সাম্ঝাতা নেহি?

হাঁ হামভি থোরা থোরা বাংলা বলনে শিখা। দাঁত বের করে হাসলো লোকটা।

মিঃ আহাদ স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন, যাক, লোকটা তাহলে তেমন বুদ্ধিমান নয়।

কোনোরকমে খানিকটা রুটী নাকেমুখে গুঁজে শুয়ে পড়লেন মিঃ আহাদ আর সমীর।

সেকি বিছানায় গন্ধ, যেন নাড়ী ভুড়ি বেরিয়ে আসতে চাইছে।

মিঃ আহাদ আর সমীর শুয়ে পড়লেন, চাকরটা আলো নিভিয়ে চলে গেলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নাক ডাকতে শুরু করলো সমীরের।

মিঃ আহাদ চাদর সরিয়ে উঠে পড়লেন, অন্ধকারে এগিয়ে চললেন দেওজীর কক্ষের দিকে। কক্ষমধ্যে তখনও আলো জ্বলছে। কিন্তু কক্ষের চারপাশের দরজা-জানালা ভালভাবে বন্ধ করা। সামান্য ফাঁক দিয়ে যে আলোকরশ্মি বেরিয়ে আসছিলো সেই ফাঁকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন মিঃ আহাদ। কক্ষমধ্যে আলোটা ডিম জ্বলছে, কাজেই স্পষ্ট কিছু দেখতে পেলেন না, শুধু শুনতে পেলেন কার সঙ্গে যেন আলাপ আলোচনা হচ্ছে।

সব শুনে নিলেন মিঃ আহাদ, অন্ধকারে তাঁর মুখমন্ডল গম্ভীর কঠিন হয়ে উঠলো। ফিরে এলেন তিনি নিজ শয্যার পাশে। সমীরের গায়ে ধাক্কা দিয়ে চাপাকণ্ঠে ডাকলেন—সমীর, উঠে পড়ো।

সমীর সবেমাত্র আরামে ঘুমিয়েছে, বিরক্তিপূর্ণভাবে বললো—আঃ আবার জ্বালাতন করছো?

উঠে পড়ো, কাজ শেষ হয়েছে।

কাজ শেষ হয়েছে মানে?

মানে পরে বলবো। নাও চলো ।

মিঃ আহাদ আর সমীর ফিরে এলো তাদের গাড়িতে। গাড়ি ছুটে চলেছে, হাতঘড়িতে দেখলেন মিঃ আহাদ—রাত তখন পাঁচটা বেজে গেছে।

বাসায় ফিরে ড্রেস পাল্টে নিয়ে যখন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলেন তখন ভোর হয়ে গেছে।

মুখোমুখি দুটো সোফায় বসলেন মিঃ আহাদ আর সমীর। উভয়ের চোখমুখ নিদ্রা জাগরণে কিছুটা রুক্ষ লাগছে। মিঃ আহাদ এতোটুকুও ঘুমাননি, তাঁর চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে।

সমীর বললো—বলো অহেতুক রাতদুপুরে মাড়োয়ারী বাবু সেজে দেওজীর বাড়ি অতিথি হবার কি কারণ ছিলো?

শুধু দেওজী নয় সমীর, আজ ক'দিন হলো আমি প্রতি রাতে বাইরে বেরিয়েছি।

বুঝেছি—রাণীর খোঁজে?

না তা নয়।

তবে দস্যু বনহুরের সন্ধানে?

না।

তবে?

দস্যু বনহুর যাদের অর্থ হরণ করেছে তাদের গোপন রহস্য উদ্ঘাটনে।

এ তুমি কি বলছো আহাদ? দেখছি গোয়েন্দাগিরী করতে গিয়ে তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করে মিঃ আলম—বন্ধু মাথা খারাপ হলে সবার মাথাই যে ঘোল হয়ে যাবে।

আরে মিঃ আলম, আসুন আসুন---

মিঃ আহমদ আর সমীর হ্যান্ডশেক করলেন মিঃ আলমের। সাথে আসন গ্রহণ করলো মিঃ আলম।

মিঃ আহাদ ও সমীর পুনরায় আসন গ্রহণ করলেন।

মিঃ আলমই বললো—হঠাৎ এসে আপনাদের আলাপে ব্যাঘাত ঘটালাম না তো?

মিঃ আহাদ একটু হেসে বললেন—মোটেই না, বরং এসেছেন যখন ভালোই হলো, একসঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা যাবে।

সমীর বললো—চা-নাস্তার অর্ডার দিয়ে আসি।

মিঃ আহাদ বললেন—যাও, চা-নাস্তার অর্ডার দিয়ে এসো আর বোনকে ডেকে এনো, মিঃ আলমের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো।

মনে মনে খুশি হলো আলম, কারণ সে জানতে পেরেছে নূরীর সঙ্গে মিঃ আহাদের সম্পর্ক ভাই-বোনের—শুধু তাই নয়, সে নিজেও গোপনে সন্ধান নিয়ে জেনেছে। মিঃ আহাদ সত্যিই একজন মহৎ ও সৎ ব্যক্তি। পূর্বদিনের মত আজ মিঃ আলমের মুখ গম্ভীর ভাবাপন্ন নয়, সচ্ছভাবে হেসে হেসে কথাবার্তা বলছে সে।

একটু পরেই সমীর আর নূরী প্রবেশ করলো কক্ষমধ্যে। পিছনে বয়ের হাতে চা-নাস্তার ট্রে।

নূরী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করতেই দৃষ্টি বিনিময় হলো।

নূরীর মনে একটা দ্বিধা আর সংকোচ ভাব ছিলো, তার জন্য চট্ করে চোখ দুটো নত করে নিলো সে।

মিঃ আহাদ বললেন—নূরী, লজ্জার কিছু নেই, ইনি আমাদের বন্ধু মিঃ আলম।

নূরি আস্তে হাতখানা তুলে আদাব করলো।

মিঃ আলম বেশে দস্যু বনহুরও মাথা নত করে আদাব গ্রহণ করলো।

সমীর চা তৈরি করতে যাচ্ছিলো।

মিঃ আহাদ বললেন—সমীর, আজ তুমি নও বোন নূরী আমাদের চা-নাস্তা পরিবেশন করে খাওয়াবে।

নূরীই চা তৈরি করতে এগিয়ে এলো।

মিঃ আহাদ বললেন—আমার বোনের নাম মিস নূরী।

হাসলো মিঃ আলম।

নূরীর মুখে অবশ্য হাসি ফুটলো না, কারণ সে অপরাধী। মাথা নিচু করে চা নাস্তা পরিবেশন করছিলো।

সমীর বললো—আমাদের বোনটি বড় লজ্জাবতী কিন্তু!

মিঃ আলম চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললো—লজ্জা নারীর ভূষণ মিঃ কুমার।

ঠিক বলেছেন মিঃ আলম, মেয়েদের লজ্জাই অলঙ্কার।

চা নাস্তা পান চলেছে, এমন সময় ফোনটা বেজে উঠলো সশব্দে ক্রিং ক্রিং করে।

মিঃ আহাদ ফোন ধরলেন—হ্যালো, স্পিকিং আহাদ চৌধুরী। কি বললেন আজ রাতে দেওজীর বাড়িতে দস্যু বনহুর হানা দিয়েছিলো? হ্যালো--হ্যালো কি বললেন অতিথি ---এ্যাঁ, ভাই সেজে অতিথি হয়ে ছিলো দস্যু বনহুর--কিছু নিয়ে যায়নি তো আজ---নেয়নি কিছু? যাক বাঁচালেন তবু---আচ্ছা আসছি--আচ্ছা আচ্ছা, এখুনি তৈরি হয়ে আসছি, ধন্যবাদ।

রিসিভার রেখে দিলেন মিঃ আহাদ।

নূরী আর মিঃ আলম এবার দৃষ্টি বিনিময় হলো। নূরী দেখলো তার হুরের মধ্যে নেই কোনোরকম অভিমান-ক্ষুব্ধ ভাব। সরল সচ্ছ স্বাভাবিক সে চাহনী। নূরীর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কেটে গেলো যেন ধীরে ধীরে। শোহেলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার জন্যই নূরী রাগ করেনি, যে দিন সে নিজের চোখে দেখেছিলো শোহেলী তার বনহুরের বুকে মাথা রেখে দাঁড়িয়ে আছে তাইতো সে সহ্য করতে পারেনি—চলে এসেছিলো যেদিকে দৃষ্টি যায় চলে যাবে বলে। কিন্তু সবই দয়াময়ের ইচ্ছা, চলে এলেও একটি দিনের জন্য নূরী মনে শান্তি পায়নি। অহরহঃ সে দগ্ধীভূত হয়েছে তুষের আগুনে। আজ তার হুরকে পেয়ে আনন্দে আপ্লুত হয়েছে সে।

মিঃ আহাদ রিসিভার রেখে বললেন—পুলিশ অফিস থেকে ফোন করেছিলেন পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ হাফিজ। আজ আবার নাকি দেওজীর বাড়িতে দস্যু বনহুর অতিথি হয়েছিলো।

সমীর কিছু বলতে যাচ্ছিলো, মিঃ আহাদ তাকে ইংগিতে থামিয়ে দিলেন। বললেন মিঃ আহাদ—আজ দস্যু বনহুর দেওজীর বাড়িতে অতিথি হলেও কেনো উপদ্রব করেনি। দেওজী নাকি ভয়ানক ঘাবড়ে গেছেন এ ব্যাপারে। মিঃ আলম,চলুন না দেওজীর মুখে সব শুনে আসি।

আমি।

হাঁ চলুন, দেওজী এখন পুলিশ অফিসে অপেক্ষা করছেন।
তা চলুন।
সমীর বলে উঠলো—উনি এলেন বসে দু'চারটে গল্পসল্প করবো তা না-
হবে হবে, আবার আসবে উনি। তারপর নূরীর দিকে তাকিয়ে বললেন—বোন, তুমিও যাবে কি আমাদের সঙ্গে?
নূরী বললো—যদি অসুবিধা না হয়---
বেশ বেশ চলো। যাও, তৈরি হয়ে চলে এসো। বললেন মিঃ আহাদ।
সমীর একটু ক্ষুব্ধ হলো, এই সকালটা আবার ছুটোছুটি করে কাটাতে হবে বলে।
নূরী মনে মনে খুশি হলো, তার হুরকে যেতে হচ্ছে, কাজেই তারও যাওয়া একান্ত প্রয়োজন।
অল্পক্ষণের মধ্যেই নূরী তৈরি হয়ে ফিরে এলো।
মিঃ আহাদ নূরীকে তার পাশে বসিয়ে নিলেন সমীর চড়ে বসলো মিঃ আলমের গাড়িতে।
পুলিশ অফিসে পৌঁছাতে বেশি বিলম্ব হলো না তাদের। অফিসে পৌঁছতেই মিঃ হাফিজ সসম্মানে অভ্যর্থনা জানালেন।
ইন্সপেক্টার মিঃ হাফিজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন মিঃ আহাদ মিঃ আলমের এবং বললেন—ইনি আমাকে দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারে সহায়তা করবেন।
ইন্সপেক্টার অত্যন্ত খুশি হলেন, হ্যান্ডশেক করলেন তিনি মিঃ আলমের সঙ্গে। সমীরের সঙ্গে পূর্ব হতেই আলাপ পরিচয় ছিলো কাজেই মিঃ আলম এবং নূরীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।
দেওজী মিঃ আহাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন তিনি এদের দেখে প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন—আজ রাতে আমার ভাই সেজে এক লোক গিয়ে হাজির হয়েছিলো, সঙ্গে তার আর একজন ছিলো। আমি বহুদিন দেশে যাইনি, আমার ছোট ভাইকে দেখিনি প্রায় বিশ বছর, কাজেই আমি সেই লোককে ভাই বলে মনে করি এবং আদর -যত্নে আমার বাড়িতে আশ্রয় দেই কিন্তু ভোরে দেখি কেউ নেই—উধাও।
মিঃ আহাদ গম্ভীর মুখে বলেন—আশ্চর্য বটে!
স্যার, দস্যু বনহুর ছাড়া এ অন্য লোক নয়।
সে যে দস্যু বনহুর তা কেমন করে বুঝলেন?
তাদের চাল-চলন, আচার-ব্যবহারে আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি। দস্যু বনহুর আমার বাড়িতে অতিথি সেজে আমার সবকিছু গোপনে জেনে এসেছে।
হুঁ, বললেন মিঃ আহাদ।
মিঃ আলম কথাগুলো মনোযোগে সহকারে শুনছিলো, তার মুখমন্ডল গম্ভীর হলো, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকালো সে মিঃ আহাদের মুখে। মিঃ

আলম দেখলো মিঃ আহাদের ললাটে মিশে যাওয়া একটা চন্দনের টিপের দাগ। অত্যন্ত ভালভাবে লক্ষ্য না করলে কেউ দাগটা বুঝতে পারবে না।

বনহুরের ঠোঁটের কোনো একটা ক্ষীণরেখা ফুটে উঠে মিশে গেলো।

দেওজী তখন ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলে চলেছেন—দেখুন ইন্সপেক্টার সাহেব, নিশ্চয়ই দস্যু বনহুর পুনরায় আমার বাড়িতে হানা দেবে হাতে কোনোসন্দেহ নেই, আপনারা আমাকে রক্ষা করবেন। পঞ্চাশ হাজার টাকা হারিয়েছি আবার যদি দস্যু হানা দিয়ে আমার সব নিয়ে যায় তাহলে আমি বাঁচবো না স্যার।

মিঃ আহাদ অবাক হলেন তিনি এর পূর্বে জানতেন না দেওজী মাড়োয়ারী এতো সুন্দর বাংলায় কথা বলতে পারে।

সব শুনে নিয়ে মিঃ আহাদ ভরসা দিলেন—দস্যু বনহুর যাতে পুনরায় আপনার অর্থ হরণ করতে না পারে সেদিকে পুলিশবাহিনী সতর্ক খেয়াল রেখেছেন এবং রাখবেন।

দেওজীকে আশ্বাস দিলেন মিঃ আহাদ। পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ হাফিজও যতদূর সম্ভব ভরসা দিলেন, দস্যু বনহুর যাতে আর কোনো রকম হামলা চালাতে না পারে সেদিকে তাঁদের নিপুণ দৃষ্টি থাকবে।

এমন সময় পুলিশ সুপার স্বয়ং এলেন পুলিশ অফিসে। মিঃ আহাদ মিঃ আলম, সমীর কুমার ও নূরীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চললো। মিঃ আহাদ যখন জানালেন দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারে মিঃ আলম তাদের সাহায্য করবেন তখন তিনি খুশি হলেন।

কিন্তু শত চেষ্টা করেও পুলিশবাহিনী বা মিঃ আহাদ চৌধুরী দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারে সক্ষম হলো না।

সেইদিন রাতে পুনরায় হানা পড়লো গ্রীন হাউসে। প্রায় লক্ষ টাকা হরণ করে নিয়ে গেলো দস্যু বনহুর। এতো পাহারা মোতায়েন থেকেও পুনরায় দস্যুর হানা—ভীষণ এক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো শহরময়।

শহরে যখন গ্রীন হাউস নাইট ক্লাবের লক্ষ টাকা লুণ্ঠন নিয়ে তোড়জোড় পড়ে গেলো তখন বনহুর ঘূর্ণি-বিধ্বস্ত এলাকাগুলো নিয়ে মেতে উঠেছে। শুধু ঢাকার আশেপাশেই নয়, বিভিন্ন জেলার ঘূর্ণি-বিধ্বস্ত এলাকায় বিভিন্ন রূপ নিয়ে সে দুগর্ত জনগণের মধ্যে অর্থ সাহায্য করে চলেছে।

সেকি মহান মহৎ অপূর্ব হৃদয়ের পরিচয়।

শত শত অর্থ বনহুর বিলিয়ে দিচ্ছে এইসব অসহায় লোকদের মধ্যে। তখন তার কোনোদিকে চাইবার সময় নেই, ভাববার সময় নেই কিছু। অসহায় নিঃসঙ্গ দুঃস্থদের পাশে বন্ধু হয়ে কাজ করে চলেছে।

❑

মিঃ আহাদ একসময় নূরীর কক্ষে প্রবেশ করে স্থিরকণ্ঠে ডাকলেন —বোন।

বলুন ভাইজান?

একটা কাজ তোমাকে করতে হবে, জানি তুমি পারবে।

বলুন?

তোমাকে অভিনয় করতে হবে।

অভিনয়! চমকে উঠলো নূরী—অভিনয় সে একবার করেছিলো চিত্রজগত সম্বন্ধে তার কিছুটা অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু অভিনয় সে আর করবেনা, তার হুর পছন্দ করে না এসব।

মিঃ আহাদ হেসে বললেন—চিত্রজগতের অভিনয় নয় বোন, বাস্তব অভিনয়।

বিস্মিত চোখ দুটো তুলে তাকালো নূরী মিঃ আহাদের মুখের দিকে। মিঃ আহাদ বললেন—মিঃ আলমকে তোমার কেমন মনে হলো বোন?

মাথা নিচু করে বললো নূরী—আপনার বন্ধু, আপনার মতই সৎজন হবেন বলেই মনে হলো।

হাঁ, আমিও তাই মনে করি, তবে আমার একটু কেমন যেন সন্দেহ হয়---থামলেন মিঃ আহাদ, তারপর অতি নিম্ন স্বরে বললেন—নূরী, তোমাকে একটা মিথ্যা অভিনয় করতে হবে, গভীরভাবে প্রবেশ করতে হবে মিঃ আলমের মধ্যে জানতে হবে তার আসল পরিচয়। বলো পারবে? পারবে তুমি আমাকে এটুকু সাহায্য করতে।

পারবো। বললো নূরী।

মিঃ আহাদ নূরীর হাত মুঠায় চেপে ধরলেন—বোন, তোমার উপকারের কথা আমি কোনোদিন তাহলে ভুলবো না।

ভাইয়া, মনে রাখবেন আমি আপনার বোন, বিশ্বাস রাখবেন আমার উপর।

হাঁ তোমাকে বিশ্বাস করি বলেই আজ এতোবড় একটা দায়িত্ব আমি তোমার উপর ছেড়ে দিচ্ছি। দেখো নূরী, মিঃ আলম কিন্তু অত্যন্ত চালাক এবং বুদ্ধিমান লোক।

যত বুদ্ধিমানই হোক আমি তার ভিতরের রহস্য উদ্ঘাটন করবোই করবো।

নূরী!

ভাইজান!

চলো বোন একবার ঘুরে আসি।

কোথায় যাবেন?

মিঃ আলমের ওখানে।

চলুন! খুশি হলো নূরী।

আজ ক'দিন হলো নতুন ড্রাইভার এসেছে। পাঠান ড্রাইভার—অত্যন্ত বিশ্বাসী, প্রভুভক্ত।

গাড়িতে চড়ে বসে মিঃ আহাদ বললেন—চলো কমলাপুর।

মিঃ আলমের বাসাটা কমলাপুর এলাকায়।

ড্রাইভার পূর্বে একদিন মিঃ আলমের বাসায় গাড়ি নিয়ে গিয়েছিলো তাই সে এপথ চেনে, অসুবিধা হলো না কিছু।

কিন্তু আলম সাহেবের বাসায় পৌঁছে মিঃ আহাদ আর নূরী বিমর্ষ হলো ঘরের দরজায় তালা লাগানো রয়েছে।

গম্ভীর হলো মিঃ আহাদের মুখমন্ডল।

তখনকার মত ফিরে চললেন মিঃ আহাদ নূরীসহ।

গাড়িতে বসে বললেন মিঃ আহাদ—আমার যা সন্দেহ হয়েছিলো তাই সত্য হলো। জানো নূরী,সে এখন কোথায়?

আমি কেমন করে জানবো ভাইজান।

তোমাকে জানতে হবে।

নূরী অবাক হয়ে তাকালো।

মিঃ আহাদ বললেন—কয়েকদিন আগে গ্রীন হাউস নাইট ক্লাবে দস্যু বনহুর হানা দিয়ে লক্ষ টাকা নিয়ে গেছে।

হাঁ শুনেছি, আরও শুনেছি দেওজীর বাড়িতে দস্যু বনহুর নাকি অতিথি সেজে একরাতে আশ্রয় নিয়েছিলো।

কোনো জবাব না দিয়ে হাসলেন মিঃ আহাদ।

নূরী বললো—দস্যু বনহুর কি ভয়ঙ্কর মানুষ, এমন দুর্দান্ত ডাকুর নাম আমি কোনোদিন শুনিনি। লক্ষ লক্ষ টাকা লুটে নিয়েও যার তৃপ্তি হয় না।

মিঃ আহাদ বললেন—নূরী, তুমি দস্যু বনহুর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত নও তাই এ কথা বলছো। এই সুন্দর পৃথিবীর বুকে সে একটি মহান সৃষ্টি।

তবে সে দস্যুতা করে কেন?

নিজের প্রয়োজনে নয়, দশের কল্যাণে।

ভাইয়া---অস্ফুট ধ্বনি করে উঠে নূরী বিশ্ববিখ্যাত ডিটেকটিভ্ মিঃ আহাদ চৌধুরীর মুখে তার হুরের সম্বন্ধে এমন একটা উক্তি তার অন্তরে অনাবিল এক আনন্দ এনে দেয়, খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠে সে। বলে নূরী—দশের কল্যাণই যদি তার উদ্দেশ্য তবে সে---

নূরীর কথা শেষ হয় না, তাদের গাড়ির সম্মুখে এসে হাত তুলে দাঁড়িয়েছে তার বাড়ির চাকরটা।

গাড়ি থামিয়ে ফেলে ড্রাইভার।

মিঃ আহাদ বললেন—আরে তুমি।

হাঁপাতে হাঁপাতে বললো চাকরটা—হুজুর পুলিশ অফিস থেকে ফোন এসেছে।

মিঃ আহাদ গম্ভীর রাগতকণ্ঠে বললেন—তা ফোন এসেছে সে জন্যই এমন দৌড়ে জানাতে আসছো?

হুজুর, দস্যু বনহুর নাকি গ্রেফতার হয়েছে।

দস্যু বনহুর গ্রেফতার হয়েছে? বলো কি?

তাইতো ছুটে আসছি---

চমকে উঠলো নূরী, ফ্যাকাশে বিবর্ণ হলো তার মুখমন্ডল।

মিঃ আহাদ বললেন—উঠে পড়ো হামিদ।

মিঃ আহাদের চাকরের নাম হামিদ ছিলো।

ড্রাইভারের পাশে হামিদ উঠে বসলো।

মিঃ আহাদ বললেন—ড্রাইভার, চলো পুলিশ অফিসে।

গাড়িখানা এবার পুলিশ অফিস অভিমুখে ছুটে চললো।

পুলিশ অফিসে পৌছে মিঃ আহাদ আর নূরী অফিসের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

মিঃ হাফিজ মিঃ আহাদের সঙ্গে করমর্দন করে বললেন—মিঃ চৌধুরী দস্যু বনহুর সন্দেহে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে; সেই দস্যু বনহুর কিনা এখনও সঠিক সিদ্ধান্তে আমরা পৌছতে পারিনি।

মিঃ আহাদ বললেন—কোথায় তাকে রাখা হয়েছে?

মিঃ হাফিজ বললেন—হাজতকক্ষে।

হঠাৎ মিঃ আহাদের দৃষ্টি চলে গেলো ওদিকের চেয়ারে বসে আছেন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক এবং তার পাশে এক যুবতী।

মিঃ হাফিজ বললেন—মিঃ চৌধুরী এদের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেই আসুন।

নূরীর দৃষ্টি ওদের উপর পড়তেই চমকে উঠলো, এ যে সেই মিসেস শোহেলী আর তার স্বামী রায় বাবু অর্থাৎ নিজাম হোসেন। মিসেস শোহেলীর উপর নজর পড়তেই নূরীর সমস্ত দেহে যেন আগুন ধরে গেলো। মেয়েটার জন্যই সে তার হুরকে ত্যাগ করে পালিয়েছিলো। নির্লজ্জ বেহায়া কোথাকার। নূরীর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠলো—সে মনে করলো, নিশ্চয়ই তার হুরকে এরা চিনতে পেরেছে এবং দশ হাজার টাকার লোভে তাকে ধরিয়ে দিয়েছে পুলিশের হাতে। অতিকষ্টে নূরী নিজকে সংযত করে রাখলো।

কখন যে তাদের পিছনে পাঠান ড্রাইভার এসে দাঁড়িয়েছে, সে অবাক হয়ে শুনছে। দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারের কথা শুনে সে কিছুতেই ধৈর্য ধরতে পারেনি, দেখতে এসেছে একনজর এই দুর্দান্ত দস্যুকে।

মিঃ হাফিজ মিঃ নিজাম হোসেনের সামনে এসে দাঁড়ালেন, বললেন—ইনি বিখ্যাত ডিটেকটিভ মিঃ আহাদ চৌধুরী আর ইনি বিদেশী ব্যবসায়ী দনকুবের জনাব নিজাম হোসেন। আর ইনি মিসেস হোসেন।

মিঃ আহাদের ভ্রূকুঞ্চিত হলো, বন্ধু সমীরকে যেদিন ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে তিনি আনতে গিয়েছিলেন সেইদিন এই তরুণীকে তিনি দেখেছিলেন মিঃ আলমের কক্ষে, ক্ষণিকের জন্য এসেছিলো কোনো কারণ বশতঃ। সমীরকে জিজ্ঞাসা করায় জেনেছিলো তার পরিচয়। আজ এখানে এই পুলিশ অফিসে মিসেস শোহেলী আর তার স্বামীকে দেখে কিছুটা অবাক হলেন মিঃ আহাদ।

ইন্সপেক্টার হলেন মিঃ হাফিজ আরও বললেন—মিঃ নিজাম হোসেনই গ্রেফতারে সক্ষম হয়েছেন দস্যু বনহুরকে।

একটু বিস্মিত হলেন মিঃ আহাদ যে দস্যুকে গ্রেফতার নিয়ে পুলিশবাহিনী অবিরত হন্তদন্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে, যে দস্যুর নামে অতি বড় দুঃসাহসীরও হৃদকম্প হয়, যাকে আটকে রাখতে সক্ষম হয়নি হাঙ্গেরী কারাগার—সেই দস্যুকে গ্রেফতার করেছেন এই সত্তর বছরের প্রৌঢ় ভদ্রলোক। একটা হাসি গোপন করে হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করলেন জনাব নিজাম হোসেনের সঙ্গে।

নূরীর মনে তখন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে; কারণ সে জানে, তার হুর মিসেস শোহেলীর সঙ্গে ভালভাবে মিশতো। হয়তো জানতে পেরেছে তার আসল পরিচয় তাই তাকে কৌশলে বন্দী করেছে। রাগে ক্ষোভে নূরীর গা রি রি করে জ্বলে উঠলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে পুলিশ সুপার স্বয়ং এসে পড়লেন। মিঃ আহাদ এবং জনাব নিজাম হোসেরন করমর্দন করে ইন্সপেক্টারকে বললেন—কোথায় সেই অদ্ভুত দস্যু বনহুর?

স্যার, তাকে হাজতে বন্দী করে রাখা হয়েছে।

পুলিশ সুপার নিজাম হোসেন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন কিভাবে তিনি দস্যুকে গ্রেফতার করতে পেরেছেন?

মিঃ হোসেন বললেন—আমার স্ত্রী বুদ্ধি-কৌশলেই আজ আমি এ কৃতিত্বলাভে সক্ষম হয়েছি। কাজেই দস্যুকে গ্রেফতারের সুনাম প্রথম তারই প্রাপ্য।

পিছন থেকে পাঠান ড্রাইভার ভাঙ্গা ভাঙ্গা উর্দুতে বলে উঠলো—আর রূপিয়া কিছু কি পাওনা আপকো না উছবো?

সবাই তাকালো একবার পাঠান ড্রাইভারের মুখের দিকে, কারণ সে ঠিকই বলেছে, দস্যুকে গ্রেফতারের জন্য সুনাম পাবে মিসেস আর পুরস্কার পাবেন কি মিঃ নিজাম হোসেন? কিন্তু পাঠান ড্রাইভারের কথাটা তেমন করে কেউ কানে নিলো না।

মিঃ আহাদই প্রশ্ন করলেন—মিসেস হোসেন কি করে আপনি দস্যু বনহুরকে গ্রেফতার সক্ষম হলেন?

মিসেস শোহেলীর মুখে ঘটনাটা শোনার জন্য উপস্থিত সবাই উন্মুখ হয়ে উঠলো। দস্যু বনহুরকে গ্রেফতার করা কম কথা নয়। তবু নারী হয়ে মিসেস শোহেলী এ কৃতিত্বের অধিকারিণী হয়েছেন। পুলিশ অফিস প্রাঙ্গণে এবং রাস্তায় অগণিত জনতার ভিড় জমে গেছে। কি করে যে দস্যু বনহুর গ্রেফতার সংবাদটা ছড়িয়ে পড়েছে গোটা শহরময় বুঝা মুস্কিল। এখনও রেডিও বা পত্রিকায় এ সংবাদ ঘোষণা করা হয়নি।

সবার জানার আগ্রহে মিসেস শোহেলী বলতে শুরু করলো—শহরে দস্যু বনহুরের আবির্ভাবের খবর শোনা অবধি আমার মনে অত্যন্ত ভীতিভাব

জেগেছিলো। আমার স্বামী প্রচুর অর্থের মালিক, আমার যে অলঙ্কার আছে তা প্রায় লক্ষ টাকার বেশি হবে। এসবের জন্য আমি সব সময় সাবধান থাকতাম। প্রথমে আমরা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ছিলাম তারপর এখন তেজগাঁর অদূরে বাসা নিয়েছি।

মিঃ আহাদ বললেন—এখন আপনারা ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে থাকেন না বুঝি।

না, কারণ আমার ভয় হয় এখানে একা থাকতে।

আর তেজগাঁ বাসায় ভয় হয় না? প্রশ্ন করলেন মিঃ আহাদ।

মিসেস শোহেলী বললো—সেখানে আশে পাশে অনেক বাসা আছে। তাছাড়া বাড়িওয়ালাও থাকেন আমাদের নীচতলায়।

হুঁ! বললেন মিঃ আহাদ।

মিসেস শোহেলী বলছে—আমার স্বামী প্রায় রাতই বাইরে থাকেন।

মিথ্যে কথা। বলে উঠলেন জনাব নিজাম হোসেন।

মিসেস শোহেলী বললো—মিথ্যে নয়, সম্পূর্ণ সত্য—আমার স্বামী প্রায় রাতই বাইরে কাটান, জানি না কোথায় থাকেন। তবে একথা সত্য তিনি দুশ্চরিত্র নন।

হঠাৎ প্রশ্ন করে বসেন মিঃ আহাদ—কতদিন আগে জনাব নিজাম হোসেনের সঙ্গে আপনার বিয়ে হয়েছে?

শোহেলীর কথা শেষ হয় না, জনাব হোসেন বলে উঠেন—মিথ্যে কথা, ওর সঙ্গে আমার পাঁচ বছর বিয়ে হয়েছে।

পাঁচ বছর! মিসেস শোহেলীর বয়স তখন নিশ্চয়ই বিশ বছরের অনেক কম ছিলো।

তা হলে। বললেন জনাব হোসেন।

কিন্তু আপনি এতো কচি মেয়েকে বিয়ে করতে গেলেন কেন মিঃ নিজাম হোসেন? বললেন পুলিশ সুপার।

হঠাৎ পুলিশ সুপারের কথায় একটু হতভম্ভ হলেন মিঃ হোসেন, আমতা আমতা করে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, বললেন মিঃ আহাদ—আপনি এ প্রশ্নের জবাব সহজে দিতে পারবেন না বলে মনে হচ্ছে। পুলিশ সুপারের দিকে তাকিয়ে বললেন—আমরা আসল কথা ছেড়ে বেশ দূরে এসে পড়ছি।

হাঁ, পূর্ব কথায় যাওয়া যাক। বলুন মিসেস হোসেন, আপনি সচ্ছভাবে সব বলুন—আর জনাব হোসেন, আপনার নিকটে অনুরোধ রইলো, মিসেস হোসেনের কথার মাঝখানে আপনি কোনো কথা বলতে যাবেন না। কথাগুলো পুলিশ সুপার গম্ভীর কণ্ঠে বললেন।

মিসেস শোহেলী বেশ বিব্রত হয়ে পড়েছেন বলেই মনে হলো। সে চায় না তার স্বামীর কোনো বদনাম হয়, অথচ সত্য বলতে হলে তাকে কিছুটা খোলাসা বলতে হবে। সে বলতে লাগলো—আমার স্বামী রাতে বাসায় থাকলেও সজ্ঞানে থাকেন না, অত্যন্ত মদপানে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন।

আপনারা বুঝতেই পারছেন আমার অবস্থাটা। এসব কারণেই আমি বাসা নিয়েছি। একটু থামলো মিসেস শোহেলী, একবার স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলো সে।

জনাব হোসেনের মুখ গম্ভীর থমথমে দেখাচ্ছে। ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি যেন তীব্র আর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে এখন।

মিসেস শোহেলী বলে চলেছেন—নতুন বাসায় আসার পর হঠাৎ একদিন একটা চিঠি পেলাম। আমার কাছে প্রেমপত্র লিখেছেন তবে কোনো খারাপ উক্তি ছিলো না তার মধ্যে। চিঠি খানা পেয়ে আমি আমার স্বামীকে দেখালাম উনি বললেন ও কিছু না বুড়ো স্বামী দেখে কেউ তোমার মন পরীক্ষা করছে। প্রথম চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেললাম, ভাবলাম আর চিঠি দেবার সাহস হবে না। কিন্তু ক'দিন পর আবার একখানা চিঠি—রীতিমত প্রেমের চিঠি আমি এখানা লুকিয়ে রাখলাম। তারপর আবার অমি খুব রেগে গেলাম কিন্তু চিঠিগুলো স্বামীকে দেখালাম না কারণ তিনি এসব হেসেই উড়িয়ে দেবেন। ঠিক কয়েকদিন পর আমার টেবিলে ছোরা গাঁথা দেখলাম তাতে একটুকরা কাগজ আটকানো। আশ্চর্য হলাম, ছোরা কি করে এলো আমার ঘরে! তাড়াতাড়ি কাগজের টুকরাটা খুলে নিয়ে পড়ে দেখি সর্বনাশ! দস্যু বনহুরের চিঠি!

কক্ষমধ্য সবাই অবাক হয়ে শুনছেন। মিঃ আহাদের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে।

মিসেস শোহেলী বলছে—তার চোখেমুখে তখন এক ভয় বিহ্বল ভাব ফুটে উঠেছে, বলছে সে—চিঠিখানা আমি পড়লাম তাতে লিখা আছে—"আমার বন্ধুর চিঠির উত্তর দাওনি, কাজেই তোমাকে ক্ষমা করা আমার সম্ভব নয়। যদি আমার বন্ধুর সঙ্গে আজ রাত একটায় তোমাদের বাড়ির পাশের বাগানে দেখা করো তবেই ক্ষমা করবো না হলে মৃত্যু অনিবার্য জেনো।

বন্ধুর হয়ে
—দস্যু বনহুর

মিঃ আহাদ বললেন—চিঠিখানা সঙ্গে আছে আপনার?

হাঁ আছে। মিসেস শোহেলী ভ্যানিটি থেকে চিঠিখানা বের করতে গেলো।

মিঃ আহাদ বললেন—আগে কথা শেষ করুন, পরে চিঠি দেখবো।

মিসেস শোহেলী পুনরায় বলতে শুরু করলো—চিঠিখানা পড়ে আমার মনের অবস্থা কি হলো বুঝতেই পারছেন। আমি চিঠি খানা আমার স্বামীকে দেখালাম। আমার স্বামী চিঠি পড়ে ভয় না পেয়ে খুশি হলেন। তখন বুঝতে পারলাম না কিছু, কিন্তু রাতদুপুরে যখন বাগানটার আশে পাশে অগণিত পুলিশ-ফোর্স এসে লুকিয়ে পড়লো তখন বুঝলাম আমার স্বামীর বুদ্ধিমত্তার কাছে এবার দস্যু বনহুরের সব কারসাজি ফাঁস হয়ে যাবে। দস্যু বনহুর

বন্ধুবরের নাম করলেও সেই যে প্রথম থেকে শেষ চিঠির লেখক তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ প্রত্যেকটা চিঠি একই হস্তের লিখা। এবার আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কি করে আমি দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারে সক্ষম হলাম। রাত একটায় সাহসে বুক বেঁধে বাগানটার মধ্যে এসে দাঁড়ালাম। কি ভয়ঙ্কর তখন আমার মনের অবস্থা। সমস্ত দেহটা আমার হিমশীতল হয়ে উঠেছিলো ভয়ে। আমি রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রতীক্ষা করছিলাম দস্যু বনহুরের।

কক্ষমধ্যে সবাই নীরব, মিঃ আহাদের মুখোভাবে কোনো পরিবর্তন হয়নি তিনি স্বাভাবিকভাবে শুনে যাচ্ছিলেন।

পাঠান ড্রাইভার তখনও দাঁড়িয়ে আছে তার চোখেমুখে অদ্ভুত এক বিস্ময়ভাব। নূরী আড়ষ্ট হয়ে গেছে যেন, পাথরের মূর্তির মত নিস্তব্ধভাবে বসে আছে সে।

ইন্সপেক্টার মিঃ হাফিজের প্রচেষ্টাতেই আজ দস্যু বনহুরকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে, তাই তাঁর মুখোভাব গর্বস্ফীত।

পুলিশ সুপার—তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন, দস্যু বনহুরকে গ্রেফতার করা পুলিশমহলের এক পরম কৃতিত্ব।

শোহেলী বলছে—হঠাৎ দেখলাম একটা জমকালোমূর্তি অন্ধকারে এগিয়ে আসছে অতি ধীরে ধীরে—সেকি ভীষণ এক কালো মূর্তি!

নূরী এবার অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো—তারপর? তারপর?

তারপর আমি আর থাকতে পারলাম না চিৎকার করে উঠলাম বাঁচাও--বাঁচাও--দস্যু বনহুর এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারে কালো মূর্তিটা পালাতে গেলো কিন্তু বাগানমধ্যস্থ পুলিশবাহিনী ততক্ষণে তাকে গ্রেফতার করে ফেলেছে। থামলো শোহেলী।

মিঃ আহাদ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—আমার যেন বিশ্বাস হচ্ছে না, দস্যু বনহুর এতো বুদ্ধিহীন নয়।

পুলিশ সুপার বললেন—চলুন দেখা যাক।

সবাই মিলে হাজতকক্ষের দিকে অগ্রসর হলেন। যেখানে বন্দী করে রাখা হয়েছে দস্যু বনহুরকে।

হাজতের নিকটবর্তী হতেই দেখলেন হাজতকক্ষের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে একটা জমকালো পোশাক-পরা লোক—মাথা থেকে পা অবধি কালো আলখেল্লা পরা, পায়ে বুট, চোখ গগলস্ মুখে চাপদাড়ি ও গোঁফ। হাত দু'খানা শিকল দিয়ে পিছমোড়া করে বাঁধা।

মিঃ আহাদকে দেখে হাজতকক্ষের মধ্যে দস্যু বনহুর এগিয়ে এলো। লোকটা খুব লম্বা নয় মাঝারি এবং মোটা ধরনের।

সবাই তখন হাজতকক্ষের দরজার শিকের ধারে এসে দাঁড়িয়েছেন। নূরীর দৃষ্টি তখন দস্যু বনহুরের পা থেকে মাথা অবধি উঠানামা করছে। শুধু বিস্ময় নয়, ক্রমেই নূরীর মুখমন্ডল সচ্ছ হয়ে আসছে।

অন্যান্যের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে মিঃ আহাদ চৌধুরীর নতুন পাঠান ড্রাইভারটা তার দু'চোখেও রাজ্যের বিস্ময়। এতোকাল দস্যু বনহুরের নামই সে শুনে এসেছে এখন তাকে স্বচক্ষে দেখছে—কম কথা নয়। সে একজন সামান্য ড্রাইভার হয়ে দস্যু বনহুরকে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করলো, এটা তার সৌভাগ্য।

সবার আগে এগিয়ে এলেন মিঃ আহাদ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকাতেই আলখেল্লার মধ্যে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো দস্যু বনহুর। সবাই তাজ্জব হলো, একি ব্যাপার দস্যু বনহুর ধরা পড়ে রোদন করছে।

দস্যু বনহুর কেঁদে উঠতেই মিঃ আহাদ হো হো করে হেসে উঠে সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে পড়লেন, তারপর বললেন—এ অবস্থা কেন তোমার?

আমাকে মাফ করে দাও আহাদ, সব তোমাকে বলবো।

এ কি মিঃ সমীর কুমার আপনি? বলে উঠলেন মিঃ হাফিজ।

তাড়াতাড়ি হাজতকক্ষ থেকে বের করে আনা হলো মিঃ সমীরকে। তার দেহ থেকে কালো আলখেল্লা খুলে ফেলা হলো, হাত এবং পায়ের শিকল খুলে দিলেন মিঃ হাফিজ।

কক্ষমধ্যে সকলেই হতভম্ব বিস্মিত সবাই হাসছেনও বটে।

আহাদ চৌধুরী সমীরের মুখ থেকে নকল দাঁড়ি গোঁফ খুলে নিলেন একটানে তারপর ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন—দস্যু বনহুর সেজে মিসেস শোহলীর কাছে প্রেম করতে গিয়েছিলেন না?

আমাকে ক্ষমা করো আহাদ, আমি আলাপ করে মিসেস শোহেলীকে ভয় দেখাতে চেয়েছিলাম।

অফিস মধ্যে একটা হাসির হুল্লোড় বয়ে গেলো।

মিসেস শোহেলীর মুখেও হাসি ফুটে উঠেছে সে সমীরকে ভালভাবে চিনতো ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে থাকাকালে সমীরের সঙ্গে তার পরিচয় এবং অনেক আলাপ-সালাপ হয়েছে। যাক্ দস্যু বনহুরের পাল্লায় যে পড়েনি এজন্য সে অনেকটা সান্ত্বনা পেলো মনে।

কিন্তু নিজাম হোসেনের মুখ কালো বিবর্ণ দেখাচ্ছে দস্যু বনহুরকে। গ্রেফতার করে তিনি শুধু দশ হাজার অর্থই নয় বিরাট একটা সাফল্য আর কৃতিত্ব লাভ করতে চেয়েচিলেন, সব তাঁর ব্যর্থ হলো। মাথা নত করে গোমড়া মুখে বসে রইলেন তিনি।

❑

বোন, মিঃ আলম এসেছেন দেখা করবে না?

আসছি।

বসুন মিঃ আলম।

বসতেই তো এলাম।

আসন গ্রহণ করলো মিঃ আলম।

মিঃ আহাদ সিগারেট কেস বের করে একটা সিগারেট মিঃ আলমকে দিলেন আর একটা নিজে ধরালেন।

একটু পরেই নূরী প্রবেশ করলো—হাতে তার চায়ের ট্রে।

নূরী হেসে বললো—কেমন আছেন মিঃ আলম?

বললো মিঃ আলম—ভালো। আপনি?

না না, আপনি নয়—তুমি। আমার বোনকে বলবেন।

বললেন মিঃ আহাদ।

নূরীও হেসে বললো—হাঁ ভাইয়া ঠিক বলেছেন,'আপনি'নয়, 'তুমি'ই বলবেন।

একটু পরে সমীর এসে হাজির হলো সেখানে মিঃ আহাদ ঠাট্টা করে বললেন—দস্যু বনহুর এসেছে।

চমকে উঠলো মিঃ আলম, পরক্ষণেই নিজকে সামলিয়ে নিয়ে বললো তার মানে? কোথায় দস্যু বনহুর?

এই যে--সমীরের পিট চাপড়ে বললেন মিঃ আহাদ।

অবাক হয়ে তাকালো মিঃ আলম একবার মিঃ আহাদ ও সমীরের মুখে। কিছুই যেন সে বুঝতে পারছে না।

নূরী হেসে বললো—মিঃ আলম, আপনি জানেন না একটা ঘটনা ঘটে গেছে।

মিঃ আহাদ বললেন—অদ্ভুত ঘটনা শুনুন। তিনি সমস্ত গল্পটা মিঃ আলমকে বলে শোনালেন।

কক্ষমধ্যে একটা হাসির হুল্লোড় উঠলো।

মিঃ আলম হেসে বললেন—মিঃ সমীর কুমার বাবু যে দস্যু বনহুর নন তারই বা প্রমাণ কি? যদি বলি ইনিই দস্যু বনহুর।

মিঃ আহাদ কথাটা উড়িয়ে দিতে পারলেন না। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন—হা, সে কথা অবশ্য সত্য। দস্যু বনহুর যে আমাদের মধ্যেও একজন হতে পারে বা থাকতে পারে তাতে কোনো ভুল নেই।

মিঃ আলম ও নূরীর দৃষ্টি বিনিময় হলো।

মিঃ আহাদ লক্ষ্য করলেন এটা, বললেন—মিঃ আলম, আপনি বসুন, নূরীর সঙ্গে আলাপ করুন আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। সমীর তোমাকেও যেতে হচ্ছে আমার সঙ্গে।

বেশ চলো, আমাকেই যখন তোমরা দস্যু বনহুর বলে সাব্যস্ত করে নিয়েছো তখন দস্যুতা একটু শিখতে হবে বৈকি! চলো কোথায় যেতো হবে। উঠে দাঁড়ালো। সমীর।

মিঃ আহাদ হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে বললেন—আজ আবার ড্রাইভারের শরীর অসুখ বলে ছুটি নিয়ে গেছে, আমাকেই ড্রাইভারী করতেহবে। তারপর নূরীর দিকে তাকিয়ে বললেন—বোন, উনার সঙ্গে কথাবার্তা বলো কেমন?

নূরী মাথা কাত করে সম্মতি জানালো।

বেরিয়ে গেলেন মিঃ আহাদ ও সমীর অল্পক্ষণ পরেই মোটর ষ্টার্টের শব্দ শোনা গেলো।

এবার মিঃ আলম পাল্টে গেলো মুহূর্তে, খপ্ করে নূরীকে ধরে ফেললো সে। বাহুবন্ধনে আটকে ফেলে বললো—বলো কেন পালিয়ে এসেছিলে?

ভুল করে। তুমি আমাকে ক্ষমা করো হুর।

না, ক্ষমা আমি করবো না

তবে কি করবে?

প্রতিশোধ নেবো---বনহুর নূরীকে গভীরভাবে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে ফেললো তারপর---

নূরী বিব্রত হয়ে উঠলো, রাঙা হয়ে উঠলো তার গন্ডদ্বয়। চুলগুলো এলোমেলো হয়ে বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে পড়লো কাঁধের চারপাশে।

বনহুর ওর চুলগুলো সরিয়ে দিলো ললাট থেকে।

নূরী বললো—জানো হুর, মিঃ আহাদ সন্দেহ করেছেন তোমাকে?

তা আমি বুঝতে পেরেছি।

আমাকে তাই তিনি নিযুক্ত করেছেন তোমার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে তোমার আসল রূপ জেনে নিতে।

হাঃহাঃ করে হেসে উঠলো বনহুর—তাহলে ভাইকে খুশি করবার জন্য আমাকে গ্রেফতার করতে চাও না?

হাঁ চাই! কর্তব্যের খাতিরে। বলো আবার কখন আসবে?

সব সময় তো তোমাদের এখানেই আছি।

তার মানে?

মানে পরে জানবে।

কিন্তু তোমার চেহারাটা কেমন যেন রোগা রোগা লাগছে—বলোতো এমন হয়েছে কেন? নিশ্চয়ই আবার অনিয়ম শুরু করেছো? বনহুরের চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো নূরী।

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললো বনহুর—নূরী, আমার দেহটা রোগা হয়ে গেছে একটু তাই তুমি দুঃখ করছো—আর জানো, কালবৈশাখীর নির্মম দাপটে কত অসহায় মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। শত শত মানুষ মরেছে, আর যারা বেঁচে আছে তাদের অবস্থা দেখলে প্রাণ শিউরে উঠে। তারা জীবন্মৃত হয়ে আছে, কারো হাত-পা ভেঙ্গে গেছে, কারো মাথা ফেটে গেছে, চোখ অন্ধ হয়ে পড়েছে, কারো বুকের হাড়গুড়ো হয়ে থেতলে গেছে। এরা সবাই প্রায় হসপিটালে, আর কতক পড়ে আছে ভিটের মাটি আঁকড়ে ধরে। নূরী, সেকি নিদারুণ দৃশ্য!—তাই আমি পারিনি নিশ্চুপ থাকতে। সেদিন তুমি যখন মিঃ আহাদের সঙ্গে বাত্যাদুর্গত এলাকা দেখতে গিয়েছিলে, তখন আমিও ছিলাম তোমাদের পাশে।

অবাক হয়ে বললো নূরী—কই তোমাকে তো দেখিনি?

তিনটি মজুর কাজ করছিলো দেখেছো?

হাঁ, এবার মনে পড়ছে। মিঃ চৌধুরী একটু পরে ফিরে এসে একজনকে দেখতে পেয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, তোমাদের সঙ্গী আর একজন কোথায়? বুঝেছি, তুমিই সরে পড়েছিলে আমাদের অলক্ষ্যে।

নূরী, বাত্যাদুর্গতদের জন্যই আমি এসব টাকা লুটে নিয়েছিলাম, তাছাড়াও এসব শয়তানদের সায়েস্তা করার জন্যও আমাকে এসব করতে হয়েছে।

আর নয়, চলো ফিরে যাই আমরা?

আর কয়েকটা দিন আমাকে অপেক্ষা করতে হবে নূরী।

কেন বলোতো?

জানতে পারবে সব। নূরী, আজ চলি?

আবার কখন আসবে?

ড্রাইভারের অসুখ সারলেই.....

ওঃ দুষ্ট, এবার আমি বুঝতে পেরেছি।

বনহুর নূরীর চিবুকে মৃদু টোকা দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

নূরীও উঠে পড়লো ওর সঙ্গে সঙ্গে।

গাড়ি অবধি নূরী বনহুরকে এগিয়ে দিলো।

গাড়িতে বসে বললো বনহুর—আজ গ্রীন হাউস নাইট ক্লাবে মিঃ আমাদের দাওয়াত আছে, তুমিও সঙ্গে যাবে নূরী।

নূরী কিছু বলতে যাচ্ছিলো, বনহুর তখন তার গাড়িতে ষ্টার্ট দিয়েছে।

নূরী হাত নেড়ে বললো—খোদা হাফেজ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলেন মিঃ আহাদ—সমীর তার সঙ্গে। নূরী হাস্যোজ্জ্বল মুখে এসে দাঁড়ালো—ভাইয়া, চলুন খাবার হয়ে গেছে।

মিঃ আহাদ মিঃ আলম সম্বন্ধে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করলেন না। নূরী এ ব্যাপারে খুশিই হলো।

খাবার টেবিলে বসে নানা গল্পসল্পের মধ্য দিয়ে খাওয়া-পর্ব শেষ হলো। মিঃ আহাদ তার শয়নকক্ষে এলেন, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো।

মিঃ আহাদ সমীরকে বললেন ফোন ধরতে।

সমীর ফোন ধরেই আনন্দধ্বনি করে উঠলো—হ্যালো....... দাওয়াত.......কোথায়.......গ্রীন হাউস নাইট ক্লাবে.....থ্যাঙ্ক ইউ...... নিশ্চয়ই.....নিশ্চয়ই......আমিও যাবো তো....আচ্ছা, হাঁ এখুনি বলছি তাঁকে.....রিসিভারের মুখে হাতচাপা দিয়ে বললো সমীর—আহাদ, আজ আটটায় গ্রীন হাউস নাইট ক্লাবে আমন্ত্রণ আছে, যাবে তো নিশ্চয়ই?

সম্ভব হবে না।

বলো কি?

আমার অন্য জায়গায় জরুরি কাজ আছে।

এতোবড় একটা চান্স তুমি নষ্ট করে দেবে?

নষ্ট নয়, তুমি আর বোন নূরী যেও।

রিসিভার রেখে অভিমান-ভরা গলায় বললো সমীর—অগত্যা তাই যাবো। যাই, বোন নূরীকে বলে সব ঠিক করে রাখবে।

বেরিয়ে গেলো সমীর।

মিঃ আহাদ সিগারেট ধরালেন। একরাশ ধূম্রকুন্ডলির ফাঁকে গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন তিনি।

সমীর আর নূরী যখন গ্রীন হাউজ নাইট ক্লাবে এসে পৌঁছলো তখন অন্যান্য প্রায় সবাই এসে গেছেন। মিসেস শোহেলীর বিবাহ বার্ষিকী উপলক্ষে মিঃ নিজাম হোসেন সাহেব এই উৎসবের আয়োজন করেছেন। শহরের গণ্যমান্য প্রায় অনেকেই এসেছেন উৎসবে।

সমীর আর নূরী ক্লাবকক্ষে প্রবেশ করে আসন গ্রহণ করলো।

অদূরে ডায়াসে অর্কেষ্ট্রা বাজছে!

নানা বয়সী নারী-পুরুষে ক্লাবকক্ষ গমগম করেছে।

দুগ্ধধবল অত্যুজ্জ্বল টিউব আলোয় চারিদিক ঝলমল করছে। মিসেস শোহেলীর পরিধানে আজ ফিকে নীলাভ শাড়ি, গায়ে হাতাকাটা ব্লাউজ, গলায় নীলাভ ফিতায় বাঁধা একটা মূল্যবান লকেট ঠিক বুকের মাঝখানে দুলছে। ফিকে নীলাভ পাতলা শাড়িখানার মধ্য দিয়ে তার দেহের সুঠাম সৌন্দর্য যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। সত্যি আজ মিসেস শোহেলীকে অপূর্ব মানিয়েছে। সরু ওষ্ঠদ্বয়ে মিষ্টি হাসির রেখা লেগে আছে যেন, মিসেস শোহেলীর পাশে মিঃ নিজাম হোসেন দাঁড়িয়ে সবাইকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন।

গ্রীন হাউসে যখন আনন্দ উৎসব চলছে তখন মিঃ আহাদ তার নিজ বাসায় একখানা ছুরি নিয়ে হলঘরে প্রবেশ করলেন। চিরে ফেললেন হলঘরে তার নতুন তৈরি একখানা সোফার গদি। কোনো মায়া করলেন না তিনি। আশ্চর্য, গদিটার ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো একটি টেপ-রেকর্ড বাক্স। মিঃ আহাদ ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো একটি টেপ-রেকর্ড বাক্স। মিঃ আহাদ টেপ-রেকর্ড চালু করে দিলেন—সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেলো তার নিজের কণ্ঠ....বোন, মিঃ আলম এসেছেন, দেখা করবে না....নূরীর কণ্ঠ..... আসছি..... তার নিজের গলা এবার.....বসুন মিঃ আলম......

মিঃ আহাদ খানিকটা ফিতা বাদ দিয়ে পুনরায় চালু করলেন। এবার আবার তার নিজের কণ্ঠ.....আজ ড্রাইভারের শরীর অসুখ বলে ছুটি নিয়ে গেছে, আমাকেই ড্রাইভারী করতে হবে......বোন, উনার সঙ্গে কথাবার্তা বলো, কেমন? খানিকক্ষণ কোনো কথা নেই, জুতোর শব্দ শোনা গেলো— এ শব্দটা তার ও সমীরের জুতোর শব্দ। মিঃ আহাদ রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রতীক্ষা করছেন, না জানি এবার কি শুনবেন তিনি। ঝুকে আছেন মিঃ আহাদ তার ছোট্ট টেপ-রেকর্ড যন্ত্রখানার উপর, চোখেমুখে দারুণ উৎকণ্ঠার ছাপ ফুটে উঠেছে। নড়াচড়ার বেশ তীব্র শব্দ হচ্ছে, মিঃ আলমের নিশ্বাসের ভারী শব্দ এবার মিঃ আলমের কণ্ঠ—বলো কেন পালিয়ে এসেছিলে? একটু নিস্তব্ধ, তারপর নূরীর চাপা কণ্ঠ—ভুল করে.....তুমি আমাকে ক্ষমা করো হুর.....

মিঃ আহাদ অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলেন—হুর!

পরক্ষণেই শোনা গেলো মিঃ আলমের কণ্ঠ.....না, ক্ষমা আমি করবো না....নূরীর কণ্ঠ....তবে কি করবে.....প্রতিশোধ নেবো মিঃ আলমের আবেগ ভরা গলার আওয়াজ.....তারপর কোনো কথা শোনা গেলো না, মিঃ

আহাদের মুখমন্ডলে ফুটে উঠেছে এক অদ্ভুত ভাবধারা, তিনি টেপ-রেকর্ডখানার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকিয়ে আছেন, সব যেন তার চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন—নূরীর সঙ্গে তাহলে পূর্ব হতেই মধুর ঘনিষ্ঠতা ছিলো. মিঃ আহাদ বিপুল আগ্রহ নিয়ে প্রতীক্ষা করেন এর পরের কথা শোনার জন্য!

আবার শোনা যায়.....জানো হুর, মিঃ আহাদ সন্দেহ করেছেন তোমাকে....মিঃ আলমের গলা....তা আমি বুঝতে পেরেছি.....আমাকে তাই তিনি নিযুক্ত করেছেন তোমার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে তোমার আসল রূপ জেনে নিতে.....পৌরুষ কণ্ঠের হাসির শব্দ হাঃ হাঃ হাঃ.....হাঃ হাঃ...হাঃ—হাঃ হাঃ হাঃ—

মিঃ আহাদ টেপ রেকর্ডখানা বন্ধ করে উঠে পড়লেন, ড্রয়ার খুলে বের করে নিলেন রিভলভারটা, ফিরে দাঁড়াতেই পাঠান ড্রাইভার দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পেলেন।

পরবর্তী বই

গুপ্ত রহস্য

ঐই সিরিজের পরবর্তী বই